বৈদ্যনাথ ঘোষ

অগ্রণী বুক ক্লাব

প্রকাশক
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী প্রেস
১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট
বিশ্বনাথ দাস

ব্লক ও কভার
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
২ অক্টোবর, ১৯৪৯
পাঁচ টাকা

প্রথম সর্গ
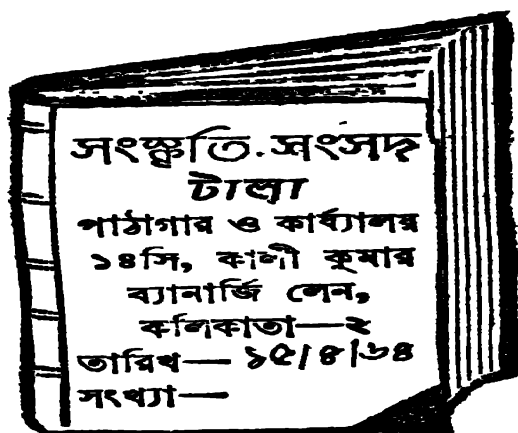
॥ ১ ॥

আদি ক'লকাতার আদি গলির মোড়ে ক্লাইভের আমলের দ্বিতল বাড়ি কালের ধাক্কায় সরু সরু নগ্ন ইটগুলো নির্লজ্জভাবে নিরপরাধী পথিক-দেব দাঁত খিঁচোচ্ছে। তাদের অপরাধ, তাদের চোখে প্রশংসার প্রকাশ নেই, যেমন থাকতো বিগতদিনে নবীন মিস্ত্রিরের আমলে। এ বাড়ির সেই মোহিনী রূপও নেই—সেদিনের সেই পথিকশ্রেণীও দুর্লভ। রয়েছে একটা নিষ্ফল আক্রোশ, নবাগতের ওপর একটা প্রচ্ছন্ন হিংসা, আর জোড়াতালি দিয়ে অস্তিত্বরক্ষার অক্ষম চেষ্টা।

সদা দরজার সামনে ছাইপাঁশের স্তূপ, তারি চারিপাশে শাল পাতা, কলপাতা, আঁশ, মাছেবকাঁটা, ছেঁড়ানেকড়া ইত্যাদি সাংসারিক অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রদর্শনী। একটু তফাতে একটা নিঃস্ব ডাষ্টবিন হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে।

সদর দরজার পেছনে অন্ধকার গলি—বাড়ির ভেতরে যাবার রাস্তা; দু পাশে ভাঙা রোয়াক, আর একটি অদ্ভুত প্রাগৈতিহাসিক গন্ধ।

গলি পেরিয়ে চকমেলানো সাবেকী বাড়ির উঠোন: পূর্বে হয়তো যাত্রাগানে কিংবা বাইজীর নুপুরধ্বনিতে মুখরিত হতো। এখন কলতলার কাঁথা-কাপড় কাচার শব্দে প্রকম্পিত। সামনে ঠাকুর দালান: অর্থনৈতিক তাগিদে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ছোট ছোট

কুঠরীতে পরিবর্তিত। দ্বিতলের বারান্দার রেলিংগুলো বিবর্ণ জীর্ণ, নূতন জোড়াতালির অসঙ্গতিতে পূর্ণ।

পূর্বদিকে বাড়ির মালিকদের বাসস্থান, বাকী তিন দিকে উপরে ও নিচে নানা পরিবারের বাস, অর্থের পরিবর্তে সাময়িক অধিকার। অধিকাংশই নিম্ন মধ্যবিত্ত, কেউ কেউ মধ্যবিত্ত ঘেঁষা।

মালিকরা চার সরিক। উপরে নিচে মিলে খানদশেক ঘর• রান্নাঘর নিয়ে একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা। অবশ্য বাসিন্দাদের সগোত্র হতে এখনো এদের আপত্তি প্রকাশ পায় দরজা জানালায় পর্দার বহরে।

পর্দার অন্তরালে হয়তো মুমূর্ষু আভিজাত্যের মরণ কাতবানি ঢাকা পড়ে।

চার সরিকের মধ্যে দু সরিক, মেজ এবং সেজ বিদেশে থাকেন। মেজ শিবকালী মিত্র মেদিনীপুরে জামাতা হিসাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করেন; অবস্থা বর্তমান কষ্টিপাথরে ধনী না হলেও উচ্চমধ্যবিত্ত বলা চলে। সেজ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, পুরুষানুক্রমিক ছন্দ ভেঙে বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করার চেষ্টায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান,—কখনো বোম্বাই, কখনো দিল্লী, কখনো ক'লকাতা। পুরাতন ছন্দের প্রতি অনুরাগ না থাকলেও যুগছন্দের মর্ম তিনি ভালই বোঝেন।

এ বাড়িতে বাস করেন বড় 'ও ছোট। বড়কর্তা রামকালী মিত্র: সাবেকী মানসিকতার ছিটেফোঁটা তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। এখনো তাঁর চরিত্রে একটু অহংকার মিশ্রিত উদারতা, একটু খোসামোদ-প্রিয়তা, একটু ভোজন-বিলাস এবং সংগীত, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ লক্ষণীয়। ছোটকর্তা ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র: মানসিক গঠনে শুধু সাবেকী অহংকারের অধিকারী,—তবে সে অহংকারের বহি-প্রকাশ অতিবিনয়ের আবরণে নব রূপে রূপায়িত। তিনি অসাধারণ

কৃপণ; পাছে অহংকারের তাগিদে খরচার দায়ে পড়েন সেই চেতনা তাঁকে বিনয়ীর নামাবলীধারণে বাধ্য করেছে।

দোতলায় কর্তাদের পশ্চিম দিকে, উপর-নিচে চারখানি ঘর নিয়ে থাকেন হারাধন রায়, তাঁর স্ত্রী ও দুটি সন্তান। বয়েস বছর চল্লিশ হবে, কোনো সওদাগরী অফিসে কাজ করেন।

• তার পাশে নিচে দুখানি ঘর নিয়ে থাকেন নিবারণ জানা ও তাঁর স্ত্রী। তাঁরা নিঃসন্তান। পেশা শেয়ার মার্কেটের দালালী। কাজ সেরে বাড়ি ফেরেন রঙীন চোখে, যেদিন দু' পয়সা হাতে থাকে স্ত্রীকে আদর করেন, যেদিন থাকে না করেন প্রহার।

কলতলাঘেঁষে চারখানি ঘর নিয়ে থাকেন আরেকটি পরিবার: বিধবা মাতা, তাঁর তিনটি পুত্র, একটি বধূ। ছোটটি পড়ে কলেজে, নাম মনোহর দত্ত। বাকী দুজন চাকরী করে, একজন বেংগল কেমিকেল, একজন কাগজের অফিসে। এ সংসারে স্বচ্ছলতার চেয়ে শান্তিই বেশি চোখে পড়ে।

সদর দরজার পুর্বদিকে তিনখানি ঘর নিয়ে থাকেন ব্রজহরি চট্টোপাধ্যায়, তাঁর রুগ্না স্ত্রী, একটি পুত্র, একটি কন্যা। পেশা পাটের দালালী।

সদর দরজার পশ্চিম দিকে এক একটি ঘর নিয়ে থাকেন এক একটি লোক। একজনের নাম সুরেন সিংহ, কারখানার ফিটার। একজন নিমাইচন্দ্র চন্দ, ঘড়ি সারায়। একজন সুজিত ঘোষ, পেশা অজানা। এরই ওপরতলায় থাকেন সুজাতা সেন, কোনো ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

এ ছাড়া বাড়ির পেছন দিকে সাবেককালের গোয়ালঘরগুলো ভাড়া করে থাকে একদল বিহারী গাড়োয়ান। ওদিকটা পড়ে যাচ্ছিল দেখে কর্তারা ওদের সামান্য ভাড়ায় বিলি করে দিয়েছেন।

কল্যান্ত

॥ ২ ॥

কুরু-উর্-র্-র্-র্। ব্যারিকেডের আকারে সাজানো ইটের আড়ালে ঘন ঘন বাঁশী বেজে চলেছে! চীৎকার করে কে যেন বললে, আমাদের শক্তি পরীক্ষা! ওরা আমাদের জায়গা দখল করতে আসছে। কিছুতেই যেন সীমানার মধ্যে আসতে না পারে। দ্বিপ্রহর মুখরিত করে আবার বেজে উঠলো বাঁশী। একটা হাত প্রসারিত করে একটি বার-তের বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে প্রাচীরের অন্তরালে। রোদের ঝাঁজে মুখ চোখ লাল, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো উত্তেজনায় নেচে উঠছে। গুটি ছয়েক ছেলে অক্লান্তভাবে ছুঁড়ে চলেছে রাশি রাশি ভাঙা ইটের টুকরো, আর চারজন ইট ভেঙে তাদের দিচ্ছে জোগান।

সংখ্যাধিক আক্রমণকারীর দল ইষ্টকবৃষ্টির ক্ষিপ্রতায় ভীত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে দূরে। কেউ কেউ দু-একটা ইটপাটকেল বিপক্ষদলকে ছুঁড়ে মারছে; কিন্তু তাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ইট সাজানো ব্যারিকেডের দৌলতে। প্রতিরোধীদল দ্বিগুণ উৎসাহে ছুঁড়ে চলেছে—সাঁই—সাঁই—সাঁই।

হঠাৎ একটা ইট এসে লাগলো প্রতিরোধী দলের নেতার কপালে। ঝাঁকড়া চুলগুলো চেপে ধরে সে বসে পড়লো। হতভম্ভ হয়ে সঙ্গীরা তাদের ইষ্টকবৃষ্টি বন্ধ করলে। আহত নেতা ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে দৃঢ়কণ্ঠে পাকা সেনাপতির ভঙ্গিতে আদেশ দিলে, চালিয়ে যাও, ওরা যেন এক পাও এগোতে না পারে।

আবার ইট চললো সাঁই-সাঁই-সাঁই। প্রতিপক্ষ ভীত ত্রস্ত হয়ে পেছু হটতে আরম্ভ করলে; একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে চেঁচিয়ে বলে গেল, আচ্ছা শুয়োররা দেখে নেব,—যাবি আমাদের পাড়ায়।

প্রচণ্ড জয়োল্লাস করে উঠলো বিজয়ী দল।

নেতার দিকে চোখ পড়তেই ক্লান্ত মুখগুলো ভয়ে শুকিয়ে গেল। ইতিমধ্যে তাদের চেঁচামেচিতে আরো গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে এসে জুটলো ব্যারিকেডের ধারে। তাদের মুখেও আশংকার ঘন কালিমা ফুটে উঠেছে। একটি ছোট্ট মেয়ে তার ফ্রকের ফিতেটা খুলে নেতার হাতে দিয়ে বললে, মিনটুদা এটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেঁধে নাও। রক্ত যে বড্ড পড়ে গেল!

নেতা তথা মিনটুর তখন সেদিকে খেয়াল নেই। সে ভাবছে বাড়িতে কি কৈফিয়ত দেবে, সেই কথাই। তাকে ফিতেটা না নিতে দেখে মেয়েটি নিজেই ক্ষতস্থানটা বেঁধে দেবার জন্য এগিয়ে গেল। একটি ছেলে তার হাত থেকে ফিতেটা নিয়ে বললে, দে, দে, তুই বাঁধতে পারবি না, আমায় দে?

ফিতেটা কপালে জড়াতে জড়াতে ছেলেটি বললে, কি করে বাড়ি যাবি মিনটু? কাকা কিন্তু ভয়ানক মারবে।

কথাটা শুনে মিনটু একবার অসহায় দৃষ্টিতে চারদিক তাকালো। তারপর মিনতিভরা গলায় মেয়েটিকে বললে, রুনু, লুকিয়ে দেখে আসবি, বাবা কোথায়?

তার কথায় মেয়েটি ঝাঁজিয়ে বললে, এখন রুনু দেখে আসবি! কেন? বীর পুরুষ মারামারি করার সময় মনে থাকে না? যাও আমি পারবো না।—একটা মুখভঙ্গী করে রুনু চলে গেল।

তার গতির দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হল মিনটু। সে অন্য একটি ছেলেকে লক্ষ্য করে বললে, আমার ত এখন বাড়ি যেতে হবেভাই. মাথাটা বড় ব্যথা করছে। কিন্তু.........

তার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে অমি বললে, সে আমি রইলুম। তোর ভয় নেই। ওরা আর আসছে না এদিকে।

দেখে নেব শুয়োরদের। ওরা আসুক না এবার।—কতকগুলো

ছেলে একসংগে চেঁচিয়ে উঠলো। এতক্ষণ তাদের মনের মধ্যে যে দারুণ অস্বস্তি হচ্ছিলো সেটা যেন কতকটা কমলো এই চেঁচানিতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে রুনু এসে চোখমুখ ঘুরিয়ে বললে, মিনটুদা, তুমি আমার সংগে এস। কাকীমার কাছে পৌঁছে দি! নয়তো না জেনে একেবারে কাকাবাবুর সামনে গিয়ে পড়বে।

যাবার জন্য পা বাড়িয়ে মিনটু একবার অমির দিকে চাইলো। অমি ডান হাতটা একবার উপরদিকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, তুই যা না, কুচ পরোয়া নেই।

অমির কথায় রুনু রেগে বললে, ওঃ, তোমরা বুঝি আবার মারামারি করবে? দাঁড়াও দাদা, জ্যেঠুমাকে গিয়ে বলে দিচ্ছি!

যা, যা। বললি ত বড বয়েই গেল, ভাগ।

রুনু অমিকে একটা ভেংচি কেটে এগিয়ে গেল, পেছনে চললো মিনটু। কিছুদুর যাবার পর রুনু পেছন ফিরে বললে, খুব লাগছে, না? কেন অমন দুষ্টুমি করতে যাওযা।

রুনুর মমতামেশানো তিরস্কারে মিনটুর ব্যথাটা গেল বেড়ে। সে বললে নরম গলায়, খুব লাগছে রুনু! আচ্ছা, মাকে গিয়ে কি বলবো?

রুনু বললে মিনটুর একটা হাত ধরে, দেখ মিনটুদা, তুমি কিছু বলো না। যা বলার আমি বলবো।

কি বলবি?

রুনু একটু চিন্তা করে মাথাটা এদিকওদিক হেলিয়ে বললে, বলবো ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেছলে।

মুহূর্তের জন্য মিনটুর চোখ দুটো আনন্দে নেচে উঠলো। কিন্তু তারপরেই ম্লানভাবে রুনুর হাতে একটা চাপ দিয়ে বললে, না, না, ওরকম বলিসনি মার কাছে। যা হয় হবে চল।

॥ ৩ ॥

একটি খাটে শায়িত মিনটু। পটি-বাঁধা মাথার চুলগুলো এলো মেলোভাবে উড়ছে। লাল মুখখানা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখের কোল বসে চোয়ালের হাড়গুলো বড় বড় দেখাচ্ছে। দাঁতে দাঁত দিয়ে সে ঠোঁট দুটো চেপে রেখেছে।

পাশে বসে বাতাস করছেন মৃণ্ময়ী দেবী, পরনে খদ্দরের কাল পেড়ে শাড়ী, দোহারা গড়ন, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখের চেহারা সাধারণ কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়।

মা, একটু জল খাবো। চেয়ে বললে মিনটু।

এই যে, দি বাবা।

তিনি টেবিলে ঢাকা দেওয়া জলের গেলাসটা তুলে ধরলেন তার মুখে। গালে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,—কোন কষ্ট হচ্ছে না ত মিনটু ?

মায়ের কোলে একটা হাত চাপিয়ে দিলে সে।

না, মা। আজ তো কোনো ব্যথা নেই।

ঘরে পা টিপে টিপে এসে ঢুকলো রুনু, অমি, ললিত, ভূতো। তাদের দেখে মিনটুর চোখ দুটো নেচে উঠলো। হেসে বললেন মৃণ্ময়ীদেবী, তোরা এসে গেছিস্! বেশি গোলমাল করিস্ নে যেন।

রুনু বললে পাকা গৃহিণীর ভংগীতে, না কাকীমা গোলমাল কি এখন করতে আছে। আমরা শুধু চুপ করে বসে থাকবো।

তাই বোস্ তোরা। আমি একটু কাজ সেরে আসি।

মৃণ্ময়ী দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন; রুনু, অমি, ভূতো, ললিত এসে বসলো মিনটুর বিছানায়। সে একটু উঠে বন্ধুদের

খাতির করতে যাচ্ছিল। তাকে দু হাতে চেপে অমি বললে, এই, এখন নড়া-চড়া করিস্ নি, মাথায় লাগবে।

ঐ জন্যেই তো কাকীমা বকে। বলে উঠলো রুনু।

ললিত বললে, জানিস মিনটু, ওরা আমাদের মারবার জন্যে খুব তাকেতাকে বেড়াচ্ছে। ওদের নাকি পাঁচজনের মাথা ফেটেছে।

কি কবি বল? বড জব্দ হযে গেছি, নয়তো...থেমে গেল মিনটু একটু নিঃশ্বাস ফেলে।

হ্যাঁ মগের মুল্লুক কিনা? মারবে। মারলেই হল। রেগে বললে অমি।

আঃ ঝগড়া ছাড়া এদের কোন কথাই নেই। প্রতিবাদ করলে রুনু।

ঝগড়া কে কবতে যাচ্ছে। আমরা বলে কত কষ্ট কবে খেলার জায়গাটা ঠিক করলুম, ওরা এল গাযেব জোবে সেটা দখল করতে! মামার বাড়ি কিনা! বললে ললিত।

যা বলেছিস, মামার বাড়ি। আবাব বাবাকে গিয়ে নালিশ করেছে আমরা নাকি ওদেব মাথা কাটিয়ে দিয়েছি! মিথ্যুকগুলো, শুধু শুধু বাবার কাছে মার খাওয়ালো।—ভূতো চেঁচিয়ে উঠলো।

দেখ মিনটু, আমরা সবাইকে একা একা বেরোতে বারণ করে দিয়েছি। একা পেলে তো মারবে। মিনটুব দিকে চেয়ে বললে অমি।

একটুখানি চিন্তা করে মিনটু বললে, দেখ্, তোরা এক কাজ কর। সবাই একটা করে হুইসিল কিনে নে।

কথাটা বুঝতে না পেরে সবাই তার মুখের দিকে চাইলে।

বুঝতে পারলি না? প্রথমে সবাইকে বলে রাখবি, হুইসিল বাজলেই যেন সেই দিকে ছুটে যায়।

যাকে মারতে আসবে সে-ই হুইসিল বাজিয়ে দেবে, এই তো? জিজ্ঞেস করলে অমি।

মিনটু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে ; ললিত হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, ঠিক বলেছিস, ভীতুগুলো ভয়েই পালিয়ে যাবে। আজই সবাইকে হুইসিল কিনতে বলে দেব। কি মজাটাই হবে।

ঘরে এসে ঢুকলেন মৃণ্ময়ী দেবী, তাঁকে দেখে ছেলেরদল আবার জড়সড় হয়ে বসলো। ছদ্মগাম্ভীর্যে বললেন তিনি, এই বুঝি চুপ করে বসে থাকা তোদের ?

অপরাধীর মত মাথা নিচু করে রইলো সবাই। ঘরে এসে ঢুকলেন হারাধনবাবু: বলিষ্ঠ শরীর, পরনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী, রং এককালে ফর্সা ছিল, এখন তামাটে হয়ে এসেছে; পরিশ্রমের ক্লান্তিতে দেহটা একটু নুয়ে পড়েছে; নাক-চোখ ধারালো, মুখের দিকে চাইলেই মনে হয় যোদ্ধা। হাতের ফাইলটা টেবিলে রেখে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, মিনটু আছে কেমন ?

ভালই।

ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন। এই যে, বর্গীর দলও যে হাজির।

তোরা এবার বাড়ি যা, আবার কাল আসবি। বললেন মৃণ্ময়ীদেবী। তারা মিনটুর দিকে একবার চেয়ে উঠে বেরিয়ে গেল।

মিনটুর গায়ে একটা চাদর চাপা দিয়ে বললেন মৃণ্ময়ীদেবী, শুয়ে থাক্ চুপ করে, আমি আসছি।

মিনটু অনিচ্ছায় চোখ বুজলো।

॥ ৪ ॥

মিত্তিরবাড়ির বৈঠকখানা : গ্রীষ্মের দিনে দিবানিদ্রার পক্ষে যে ঘরটা বড়কর্তা রামকালী মিত্রের অতি প্রিয় এবং তাঁর পুত্র অমিয়কান্তি ওরফে অমি, ও ভ্রাতুষ্পুত্রী সুমিত্রা ওরফে রুনুর অতি অপ্রিয় ; দুই পাশে দুইজন দিবানিদ্রাবিরোধীকে নিয়ে সেখানে রামকালীবাবু শায়িত ; বয়স পশ্চিমে হেলেছে ; চেহারার মধ্যে রাগ কেদারার গাম্ভীর্য ; পোক্তা বাঁধনে লম্বা চেহারা, সুকান্তি বললে আপত্তি হবে না। কণ্ঠস্বরে তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য,—খাদপঞ্চমে বাঁধা গুরুগম্ভীর নাদ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে ; কথা বলার সময় শেষের দিকটা গভীর গমকে অর্দ্ধ-সমাপ্ত বলে মনে হয়। ছেলেরা তাঁর চেয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরকে ভয় করে বেশি।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে দুধারে দুজনের গায়ে হাত চাপিয়ে তিনি বললেন, কি রে তোরা ঘুমোলি ?

এতক্ষণ যদিও দুজনেরই চোখ কড়িকাঠ গণনায় ব্যস্ত ছিলো, রামকালীবাবুর প্রশ্নের পরেই তা নিদ্রায় মুদিত আছে বলে মনে না হওয়ার কোন কারণ রইল না। তিনি কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষায় কাটিয়ে দুজনের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন।

বন্ধ দরজার গোড়ায় টিক্‌টিকির আওয়াজের অনুকরণে টাকুরার শব্দ হতেই অমি চঞ্চল হয়ে পড়লো ; সে চারিদিক ভাল করে দেখে বিড়ালের মত নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো। জানা না থাকলে ভেবে নেওয়া খুবই সোজা যে মেজেতে রবারের ম্যাটিং করা ! অমির পর রুনুও এই একই দক্ষতার পরিচয় দিলে।

অমি চাপা গলায় রুনুকে বল্‌লে, তুইও বেরিয়ে এলি কেন ?

অভিমানের সুরে রুনু উত্তর দিলে, বারে, নিজে এলে, আমার বুঝি ইচ্ছে করে না।

মিনটু রুনুর কাঁধে একটা হাত চাপিয়ে বললে নরম গলায়, আজ আমাদের সঙ্গে যেতে চেয়ো না রুনু, তোমায় আজকে নিয়ে যেতে পারবো না।

কাঁদ কাঁদ সুরে বল্‌লে রুনু, বোয়ে গেছে! বোয়ে গেছে, যাও না! তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে দুজনেরই একটু ভয় হলো, তারা ভাবতে লাগলো কি করে রুনুকে ভোলানো যায়। শেষে তার গোঁজ করা মুখটার দিকে চেয়ে অমি মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লে, রুনু, আল্‌সেতে কাকীমার আচার শুকোচ্ছে, তুই আমাদের সঙ্গে যেতে না চাইলে অনেকটা কুলের আচার এনে দিতে পারি!

আচারের কথায় রুনুর মুখটা সরস হয়ে উঠলো, সে ঠোঁটটাকে একটু চেটে নিয়ে বললে উদাসভাবে, চাই না! ভারি তো!

কথাটার মানে বুঝে অদৃশ্য হলো অমি। রুনু মিনটুর কাছে গিয়ে বললে বিজ্ঞতার ভঙ্গীতে, এই সেদিন অতবড় কাণ্ডটা হয়ে গেল আবার আজ কোথায় যাবে বল তো? এবারে কিন্তু পারবো না আমি বাপু সামলাতে।

মিনটু তার গালে একটা মৃদু চড় কষিয়ে বললে, যা যা পাকামি করতে হবে না।

চুপচাপ দুজনে দাঁড়িয়ে রইল।

অমি নেবে এলো সিঁড়ি দিয়ে তার দুহাতে দুমুঠো কুলের আচার; সে একটা মুঠো রুনুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, যাও চিলে কোঠায় বসে খাওগে আমরা এখুনি ফিরে আসছি।

বাড়ির খিড়কী দরজা দিয়ে বেরোবার সময় দুজনে খানিকটা কুলের আচার মুখে পুরে ফিরে তাকালে বাড়িটার দিকে,—দেখলে রুনু চলে গেছে, নিদ্রিত নিঝুমপুরী, ভয়ের কারণ নেই।

মিত্তির বাড়ির কিছু দূরেই মারাঠা খালের মুখ গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। অসংখ্য ছোট বড় নৌকো বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে নানা পণ্য নিয়ে এখানে এসে জমা হয়। বৈশাখের দ্বিপ্রহরে নেহাৎ দায়গ্রস্ত না হলে বড় একটা কেউ এখানে আসে না। নৌকার মাঝিদেরও এ সময় কদাচিৎ দেখা যায়। দুপুর বেলা শ্রীমান মিনটু শ্রীমান অমির এই স্থানটায় আসা অপরিহার্য কর্ম হয়ে উঠেছিল। নির্জন খালের ধারে এসে কোনদিন তারা দুজনে গাছের ছায়ায় গঙ্গার দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে, কোনদিন বড় নৌকাগুলোয় বাঁধা ছোট ডিঙ্গি একটা গোপনে খুলে নিয়ে লগি ঠেলে খালের মধ্যেই খানিকটা ঘোরাঘুরি করে তাদের জল ভ্রমণের সখ মেটায়।

মিনটুর বড় ভাল লাগে এই জায়গাটা : সে ভাবে গঙ্গার দিকে চেয়ে, যদি সে ভাল সাঁতার জানতো তা হলে ঠিক গিয়ে বসে থাকতো ঐ বয়াটার ওপরে। ষ্টিমারের গতিবেগে ওটা কেমন ঢেউয়ের ওপর দুলে দুলে ওঠে! তার ইচ্ছে করে ওই ঢেউয়ের ওপর সাঁতার কেটে নৌকোগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে। ভাল সাঁতার জানলে ভয় কি এক ওই শুশুকগুলো ছাড়া। সে বড়দের কাছে গল্প শুনেছে সাঁতার কাটলে হাঙ্গর কুমীর কিছুই করতে পারে না, কিন্তু ওই কাল কাল মোষের মত ঘুরপাক খাওয়া শুশুকগুলোকে জলের ওপর ভেসে উঠতে দেখলেই মিনটুর কেমন যেন ভয় করে ; যদি তার পেটের নিচেই ঘুরপাক খেয়ে উঠে পড়ে!

যেদিন তারা মাঝিদের সঙ্গে আলাপ করে নৌকার চালে গিয়ে বসতে পায় কিংবা গোপনে কোন ছোট ডিঙ্গি খুলে নিয়ে খানিকটা ঘুরে আসতে পায় সেদিন তো তাদের স্মরণীয় দিন। নৌকোয় চাপলেই তাদের দুজনের মনে হয় তারা যেন সাত সমুদ্র তেরনদী পার হয়ে গল্পের সুন্দর সুন্দর দেশগুলোর দিকে যাচ্ছে!

খালের ধারে এসে মিনটু চারিদিকে চেয়ে দেখলো তারপর আনন্দে

বলে উঠলো, অমি, আজ কুলের যাত্রা ভাল রে! মাঝিগুলো সব ঘুমোচ্ছে।

অমি বললে দুহাতে তালি বাজিয়ে, জয় মা কালী, চল্ ওই পাটের নৌকোটায় বাঁধা ছোট ডিঙ্গিটা নিয়ে স'রে পড়ি। কথার শেষের তারা দুজনে খালের পাড় বেয়ে নামতে শুরু করে দিলে। ধারের পাটাতনের ওপর দিয়ে বড় পাটের নৌকোটায় উঠে তারা উঁকি মেরে দেখে নিলে ভেতরটা, তারপর বাঁদরের মত ঝুলে পড়লো ছোট ডিঙ্গিটার ওপর। অতি সন্তর্পণে দড়ি খুলে, বাঁশের লগিটায় একটা ঠেলা দিয়ে মিনটু বললে, মাঝিগুলো খুব ঘুমোচ্ছে, আজ অনেকটা ঘুরে আসা যাবে!

অমি বললে উৎসাহিত কণ্ঠে, আজ গঙ্গার দিকে চল্, পোলের গোড়া থেকেই ফিরে আসবো। পকেট থেকে আমের আচার বার করে দু-টুকরো নিজের মুখে পুরে দু-টুকরো মিনটুর মুখে ঢুকিয়ে দিলে। মুখের মধ্যে আমের আচার পেয়ে মিনটু ফুর্তিতে জোর জোর লগির ঠেলা দিতে লাগলো। তর তর করে তাদের ছোট ডিঙ্গিটা ভেসে চললো খালের মুখের দিকে।

অমি বললে, জানিস মিনটু বিজয় সিংহের গল্প? বাবা বলেন, তিনি নাকি সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে লঙ্কায় রাবণের দেশে চলে গেছলেন! তখন তো ষ্টিমার ছিলো না নৌকায় করে তাঁকে যেতে হয়েছিলো!

আমের টকে মুখটা বিকৃত করে বললে মিনটু, তা আবার জানি না! বিজয়সিংহ বাঙালী ছিলেন, লঙ্কা জয় করে নাম রেখেছিলেন সিংহল।

অমি মাথা নেড়ে জানালে সেও একথা জানে।

আর একজন কে ছিলেন বল তো পৃথিবী ঘুরেছিলো? প্রশ্ন করলো অমি মিনটুকে ঠকাবার জন্য।

মিনটু চিন্তিত হয়ে পড়লো ; বললে অস্পষ্ট গলায়, ম্যাগ্ ম্যাগ্ ম্যাগেলন। অমি হেরে গিয়ে চুপ করলো। ম্যাগেল্যানের গল্প ভাবতে ভাবতে মিনটুর খেয়াল নেই, হাতের লগিটা গেল গভীর জলে তলিয়ে, মাটিতে ঠেকলো না ; পরমুহূর্তেই ছোট ডিঙিটা একটা প্রচণ্ড ঘুরপাক খেয়ে গিয়ে পড়লো গঙ্গার স্রোতে। মিনটু প্রাণপণে হাতের থেকে ভেসে-যাওয়া লগিটা ধরবার চেষ্টা করলে। লগিটা তার নাগালের মধ্যে আসার বদলে, ডিঙিটা হুড়মুড় করে এগিয়ে যেতে লাগলো গঙ্গার ভেতর দিকে।

চারিদিকে অথই জলস্রোত! মিনটুর মাথাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠলো ; সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপছে! নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অমির দিকে চাইলে ; অমি ভয়ে কাঠ হয়ে বসে।

সে বললে, ভয় কি অমি! 'ওই দেখ সামনের 'ওই জেটিটায় ডিঙিটা ঠিক গিয়ে ধাক্কা খাবে সেই সময় আমি লোহার শেকলটা ধরে ফেলবো, তুই আমাকে ছাড়িস্ নি, জড়িয়ে ধরে থাক।

তার কথায় অমি যেন একটু সাহস পেলো। সে জড়িয়ে ধরলে তাকে। ডিঙিটা তখন হুহু করে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। জেটির পাশে ডিঙিটা পৌঁছুতেই, মিনটু অমিকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, আমায় ধরে থাকিস্ জোরে। সে লাফিয়ে একটা শেকল আঁকড়ে ধরলে, সঙ্গে সঙ্গে অমিও ঝাঁপিয়ে পড়লো শেকলটার ওপর। দুজনের চললো স্রোতের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি। কাত হয়ে যাওয়া ডিঙিটা একটা হেঁচকা টানে ভেসে চলে গেলো। দুটি বালকের স্রোতের সঙ্গে লড়াইয়ে পাগুলো টান হয়ে ভেসে উঠেছে, চোখে মুখে লাগছে ঢেউয়ের ঝাপটা,—মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে জেটির তলার দিকে। দাঁতে দাঁত টিপে মিনটু বললে চেঁচিয়ে, শেকলটা কিছুতেই ছাড়িসনি অমি, ছাড়লেই জেটির তলায় টেনে নিয়ে যাবে।

অমির গা ঘেঁসে, তার মাথাটায় মাথা ঠেকিয়ে বললে মিনটু, ভয় পাসনি। জোর করে ধরে থাক!

স্রোতের সঙ্গে সংগ্রামে দুটি বালকের ঘুমের মত এলো ঘোর।

চোখ খুলে চাইতেই মিনটু দেখলে সে জেটিতে শুয়ে আছে, চারিদিকে লোকের ভিড়। ক্লান্তিতে হাতখানা উঠতে চাইছিলো না, তবু জোর করে কোন রকমে হাতটা পাশের দিকে চালিয়ে বলে উঠল, অমি! অমি! ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন কি বললে, সে কিছু বুঝতে না পেরে কেঁদে ফেললে। তার দিকে লোকে ঝুঁকে পড়তেই সে কাঁদতে কাঁদতে চেঁচিয়ে উঠলো, অমি! অমি! অমি ডুবে গেছে! পাশের লোকরা আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, না না ওই যে অমি।

ভিড় ফাঁক হয়ে যাওয়াতে মিনটু দেখতে পেলে, অমি পাশেই শুযে আছে। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার এলিয়ে পড়লো। তার গা হাত পা যেন ওই শেকলটার মতই ভারী হয়ে গেছে।

জনতার মধ্যে থেকে কে একজন তখন বলে উঠলো, বাহাদুর ছেলে বটে, অজ্ঞান হয়েও শেকল ছাড়েনি, যেন বুলডগ!

 ক্রমশঃ

॥ ৫ ॥

দিবানিদ্রা শেষে রামকালীবাবু অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গড়গড়ায় টান দিচ্ছেন। মিত্তির বাড়ির বনেদি বৈঠকখানা; চার কোণে চারটি ছোট পাথরের টেবিলের ওপর প্রমাণ সাইজের আরশি,—দেওয়ালের গায়ে নানা বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ এবং দু-তিন পুরুষের তৈলচিত্র। লম্বা তক্তপোশের ওপর ফরাশ পাতা, ছোট ছোট টেবিলগুলির ওপর এক একটি গ্রীকদেশীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন;—বলিষ্ঠ নগ্ন প্রতিকৃতি। একটি বড় ব্রাকেটের ওপর স্থাপিত ভারতীয় আদর্শের বুদ্ধমূর্তি। ঘরের প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যেই কাল-এর চিহ্ন বিদ্যমান! তাদের দৈন্যের মধ্যেই তাদের সাবেকি মর্যাদা! পুর্বে আরো অনেক কিছুই ছিলো,—ঝাড়-লণ্ঠন থেকে আতরদান পর্যন্ত বহু বনেদি সভ্যতার বাহক, এখন বেশির ভাগই অপসারিত কিম্বা লুপ্ত। যুগ পরিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনস্রোত আজ ক্রমে সংজ্ঞাহীন হতে চলেছে। বাহিরের দৈন্য অন্তরকে কোথাও মলিন, কোথাও বা উদাসীন, কোথাও বা অতিলোভী, কোথাও বা অতীতের নিষ্ফল আবর্তে ঘোলাটে করে তুলেছে। তাই এ পরিবারের চরিত্রগত মিল খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। মাত্র একটি বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে সূক্ষ্ম মিলনসূত্র এখনও আছে—যদিও নিজেদের বসতবাড়ি ভাড়া দিয়ে সেই অর্থে এঁদের কারুর কারুর সাংসারিক প্রয়োজন মেটে তবু অতীতের সেই জমিদারী অহঙ্কারের ছিটেফোঁটা এদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এখনও দেখা যায়।

নবাবী গড়গড়ার লম্বা নল, দৈর্ঘ্য কমে দেড় হাত হয়েছে। তবু, চাকরের অভাবে নিজেই কলকে সেজে, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চোখ

বুজে ধূমপান করা রামকালীবাবুর কাছে আজও আদর্শ বিলাসিতা ; ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে বাস্তব দুনিয়াটা বুঝি আড়াল পড়ে।

ঘরে প্রবেশ করলেন ছোট কর্তা ব্রজেন্দ্রনাথ : দুজনের মধ্যে চেহারার পার্থক্য প্রচুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীর্ণ, পারাবত বক্ষ, শুষ্ক পেশীর প্রাচুর্যে হতশ্রী ; কোটরাগত চক্ষুর মধ্যস্থলে দোদুল্যমান তিলক শোভিত নাসিকা, ক্ষীণ ওষ্ঠে অদ্ভুত একটি বিনয়ী হাসি,—মাথায় টিকি, গলায় কণ্ঠি, পরনে আধময়লা আট হাতি।

তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে রামকালীবাবু জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন। গলা খাক্‌রানি দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, দাদা একটা কথা—

বলো।

বলছিলুম রুনুর বিয়ের কথা......একটু ইতঃস্তত করে বললেন তিনি।

রামকালীবাবু সোজা হয়ে বসে চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, মানে !

ব্রজেন্দ্রনাথের ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল—তিনি বিনয়ী গলায় বললেন, মানে—রুনুর বয়স তো কম হলো না, বার তের প্রায় হতে চলেছে। খুব বেশি বয়সে বিয়ে আমার পছন্দ নয় ! রামকালীবাবুর কাছে ব্রজেন্দ্রনাথের চরিত্র অজ্ঞাত নয় ; তিনি ভাল করেই জানেন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বৃথা, তবু তিনি বললেন বিস্মিত কণ্ঠে, তুমি কি দিনে দিনে পাগল হতে চলেছ ব্রজেন ? এতটুকু কচি মেয়েব বিয়ে দেবে !

কোন রকম চাঞ্চল্য না দেখিয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ—কেন রীতি হিসাবে এটা কি মন্দ ? তা ছাড়া বার তের বছরের মেয়ে, এমন কিছু আর কচি নয়, বাল্যবিবাহ একে বলা চলে না !

মন্দ নয় ! কি বল্‌ছো তুমি ব্রজেন ! তাঁর গলার স্বর নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

শাস্ত্রের বিধান যা এতদিন চলে আসছে তা মন্দ হলে কি চলতো?

শাস্ত্রের দোহাই শুনে রামকালীবাবুর হাসি পেলো; শাস্ত্র সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞান রামকালীবাবুর অজানা নয়: মুখে যাই বলুক শাস্ত্রের চেয়ে তার নিজের তাগিদ বেশি। কাজেই কথা না বাড়িয়ে বললেন তিনি, তোমার মেয়ে তুমি বিয়ে দেবে তাতে আমাদের কিছু আপত্তি থাকতে পারে না অবশ্য, পাত্র স্থির করেছ?

হ্যাঁ প্রায় একরকম ঠিক করে এনেছি, ওই যে হরেকেষ্ট বোসের নাতি, নিতাইয়ের ছেলে ননী। এবারে ফাষ্ট কেলাসে উঠলো—ওরা এই মাসের মধ্যে ছেলের বিয়ে দিতে চায়।

চমকে উঠে ক্রুদ্ধভাবে বললেন রামকালীবাবু, ওই বিশ্ববকাটে নিতার ছেলেটার সঙ্গে তুমি রুনুর বিয়ে দিতে চাও!

কি করবো বলো, অন্য পাত্র যোগাড় করতে গেলে এখুনি অনেক টাকা লাগবে!

এখানে টাকা লাগবে না?

হরেকেষ্টবাবু বলেছেন আমাদের বাড়ির মেয়ে হলে, কোন কিছু দাবী নেই।

এতক্ষণে শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেলো রামকালীবাবুর কাছে। তিনি ক্ষুব্ধভাবে বললেন, পয়সা বাঁচাতে গিয়ে তুমি তোমার একমাত্র সন্তানকে বলি দেবে এ আমার ধারণার বাইরে—ভাল না হোক মাঝামাঝি পাত্র দেখে দেওয়ার সঙ্গতি তোমার আছে।

এতে মানুষের হাত কতটুকু? ভাল দেখে দিলেও মন্দ হয়ে যায়, আবার মন্দ পাত্রও ভাল হয়।

এরপর কোন কিছু বলার ভাষা খুঁজে পেলেন না রামকালীবাবু, তাঁর চোখে ভেসে উঠলো কনিষ্ঠের গোটা চরিত্র: ধন সঞ্চয়ের মোহে নিজের পরিবারকে পর্যন্ত অর্ধভুক্ত রাখা; দারিদ্র্যের অভিনয়। এ স্বভাব ব্রজেন্দ্রনাথ কোথা থেকে পেলো? তাঁর মনে হলো এ

যেন মিত্তির বাড়ির ব্যাধিগ্রস্থ একটা বিকলাঙ্গ। হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বললেন তিনি, ঠিকই যখন করে ফেলেছ, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ কি? শিবু, জ্ঞান, এদের আসতে লেখো বা মত নাও, তারা মত দিলেই আমার মত দেওয়া হবে।

কথা শেষ করেই রামকালীবাবু উঠে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ব্রজেন্দ্রনাথ ভুরু কুঞ্চিত করে ভাবতে লাগলেন: তাঁর ধারণা দাদার সাংসারিক জ্ঞান কম। বড় বেহিসাবীর মত কথা বলেন। ননী পাত্র হিসাবে কি এমন খারাপ! এত কম খরচে, এমন একটা পাত্র হাতছাড়া করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছাতের ওপর চলেছে দারুন গোলমাল; মিনটু, অমি, ললিত, রুনু, ভুতো, ইত্যাদি ছেলে মেয়েদের মধ্যে আজ কি খেলা হবে সেই নিয়ে বচসা। অমি বললে চোর চোর খেল্‌লে, মা বড় রাগ করে, এত গোলমাল হয়!

যা বলেছিস্, আর ওই ছুটোছুটি ভালও লাগে না! সায় দিলে ললিত। মিনটু খিঁচিয়ে উঠলো, ভাল লাগবে কেন কুঁড়ের ঢিপি, খালি বরবউ খেলতেই ওস্তাদ!

ললিত কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিলো তাকে ইসারায় থামিয়ে বল্‌লে অমি, দেখ ভাই যে খেলায় বেশি ছেলে রাজি হবে সেই খেলা সবাইকে খেলতে হবে।

ভাল কথা! কে কে বরবউ খেলতে রাজি আছ হাত তোল, হাকলে মিনটু। সবাই হাত তুলেছে দেখে মিনটু গুম্ হয়ে চুপ করে গেলো।

অমি বললে উৎসাহ ভরে, বরেরা বউ বেছে নাও।

ললিত বললে, বাছাবাছি কি ? বউয়েরা বরের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। রুনু গিয়ে মিনটুর কাছে দাঁড়ালো, সকলের মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ আঁখি বিনিময় হয়ে গেলো ; রেবা গিয়ে দাঁডালো অমির কাছে, আর লীলা ললিতের কাছে ; ভুতো একা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ; খেলতে পাবেনা ভেবে তার কান্না পেয়ে যাচ্ছে !

অমি বললে তার দিকে চেয়ে, এই ভুতো, তুই আমাদের চাকর হবি ভাবনা কি ?

আশ্বস্ত হয়ে ভুতো নিশ্বাস ছাড়লো, সেও তাহলে খেলতে পাবে।

খেলা শুরু হলো : কিশোর মনের নানা বিচিত্র খেয়াল ; কেউ নকল সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ; কেউ নকল আপিসে যাওয়া নিয়ে ; কারুর স্ত্রীর ওপর কর্তালি, কারুর স্বামীকে সন্তুষ্ট করার অদ্ভুত চেষ্টা ! ইটের পার্টিশন দেওয়া প্রত্যেক পরিবারের এক একটি পৃথক ঘর, তারই মধ্যে তাদের নকল সংসারযাত্রা ! কতক্ষণ খেলা চলেছে খেয়াল নেই। রামকালীবাবুর কণ্ঠস্বরে তাদের চৈতন্য হতে খেলা ছেড়ে সবাই উঠে দাঁড়ালো।

রুনু মা ! রামকালীবাবু এসে দাঁডালেন সিড়ির দরজায়। একলাফে রুনু গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বললে, কি জ্যেঠুবাবু ?

কিছু না ! বলে জড়িয়ে ধরলেন তাকে রামকালীবাবু।

রুনু তাঁর গায়ে মাথাটা চেপে ধরে বললে, তুমি কাঁপছ কেন জ্যেঠুবাবু, তোমার শরীর খারাপ নাকি ?

হ্যাঁ মা, শরীরটা আজ ভাল নেই। একটা উদ্‌গত নিঃশ্বাস চেপে নিলেন তিনি। রুনু বললে তাঁর হাত ধরে, চলো জ্যেঠুবাবু শোবে চলো, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিগে। মাতৃভক্ত সন্তানের মত রামকালীবাবু রুনুর পেছনে পেছনে নিচে নেমে গেলেন। ছেলেদের খেলাও আর জম্‌লো না, তারা বাড়ি ফিরলো।

আকাশে রংএর খেলাও শেষ হয়ে আসছে।

॥ ৬ ॥

রাত্রির কাল যবনিকা সরে যাচ্ছে; মিত্তির বাড়ির ঘুলঘুলি, ফাটলের মধ্যে চড়ুই কেলেংগোলার কাকলি সবে শুরু হয়েছে; সেই আলো-আঁধারের মধ্যে নিঃশব্দ সাবধানী পদক্ষেপে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িটার চারিপাশে।

বাড়ির সম্মুখদিকে ঘন ঘন বাঁশী বেজে উঠলো; বিছানা থেকে একলাফে বেরিয়ে গেলো মিনটু। শব্দ পেয়ে মৃণ্ময়ী দেবী বললেন উচ্চকণ্ঠে, কি রে মিনটু এতো সকালে কোথায় যাচ্ছিস্!

মিনটু ততক্ষণে নিচের তলায় নেমে গেছে।

বাঁশীর শব্দ লক্ষ্য করে মিনটু ঊর্ধ্বশ্বাসে সদর দরজা দিয়ে বেরোতেই একজন দারোগা তাকে চেপে ধরলেন। ভ্যাবাচেকা খেয়ে মিনটু তার মুখের দিকে চেয়ে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললে, ছেড়ে দাও আমাকে! দেখে নেবো শুয়োরদের!

দারোগার মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো, তার মানেটা,—আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে কোথায় বাছাধন, আমি বলে এই কবে পেকে গেলুম! তিনি মিনটুকে একটা ঝাকুনি দিয়ে বললেন, কি নাম তোমার, এই খোকা!

জানি না, আমায় ছেড়ে দিন নয়তো আমি চেঁচাবো! বললে সে।

দারোগা বিরক্ত হয়ে একটু জোরে চেপে ধরে বললেন, পাজি ছেলে বলো কি নাম?

অমিতাভ রায়! ছেড়ে দিন এইবার! মিনটু বললে অগ্নি দৃষ্টিতে দারোগার দিকে তাকিয়ে।

তার কথার উত্তর না দিয়ে দারোগা ডাকলেন, হাবিলদার।

সেলাম করে এসে দাঁড়ালো হাবিলদার।

তার বড় বড় গোঁফ গালপাট্টা দেখে, দুর্গাঠাকুরের অসুরটার মত মনে হলো মিনটুর ; সে ভয় পেয়ে মিট্ মিট্ করে চাইতে লাগলো।

দারোগা বললেন, সাক্ষী মিলা ?

হ্যাঁ সাব, ওহি ঘড়িওয়ালা বাবু।

ইতিমধ্যে নিতাইচন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছে।

তাকে জিজ্ঞেস করলেন দারোগা, আপনার নাম ?

আজ্ঞে নিতাইচন্দ্র চন্দ ! ভয়ে ভয়ে বললে সে।

আপনাকে আমাদের এই খানাতল্লাসীর সাক্ষী থাকতে হবে ! নিতাই একটু ইতঃস্তর্ত করছে দেখে দারোগা তার দিকে কটমটিযে চাইতেই সে ঢোঁক গিলে বললে, কি করতে হবে হুজুর ?

খুশি হযে বললেন তিনি, সে পরে বলে দেবো।

নিতাইকে দেখে মিনটুর সাহস বেড়ে গেলো, সে বললে চেঁচিযে, দেখো তো নিতাই'দা এই লোকটা আমাকে শুধু শুধু ধরে রেখেছে !

নিতাই হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললে দারোগাকে, আজ্ঞে একে কেন ?

তুমি চেন নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, ওই ওপরতলার হারাধনবাবুর ছেলে।

এর সঙ্গে সুজিৎ ঘোষের কোন সম্বন্ধ নেই তুমি জানো ?

না হুজুর, কোনদিন একে সুজিৎ ঘোষের কাছে দেখিনি।

হুম্, দারোগা গম্ভীরভাবে ভাবতে লাগলেন নিতাইকে সন্দেহ করার কোন কারণ আছে কি না।

এদিকে দারুণ দুঃশ্চিন্তায় মিনটুর মুখখানা কালো হয়ে গেছে, এতক্ষণ আটকা পড়ে গেলো সে, হয়তো ললিতকে কিম্বা ভুতোকে, ওপাড়ার কেউ মারতে এসেছে, কিম্বা এতক্ষণ মারই খেয়ে গেলো ! জাম্বুবানের মত লোকটা তাকে যে কিছুতেই ছাড়ছে না।

দারোগা পকেট থেকে বাঁশী বার করে দ্বিতীয়বার বাজালেন। মিনটু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, একটু আগে কি তুমি বাঁশী বাজিয়েছিলে ?

হুঁ। কেন ?

ওঃ, কিছু না। বলে মিনটু একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে সামনে চাইল।

খোকা প্যাণ্টটা খোল তো।

অন্যমনস্ক হয়ে সে বললে, কেন ?

খোলই না, লজ্জা কি ? প্যাণ্টের বোতামে হাত দিয়ে বললেন দারোগা।

একটা ঝট্‌কা টান মেরে সে দারোগার হাত ছাড়িয়ে নিতাইয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

নিতাই পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, দারোগাবাবু দেখতে চান তোমার প্যাণ্টের তলায় কিছু আছে কি না !

অভিমান ভরে বললে, ও, আমি চোর ?

না না অমনি দেখতে চাইছেন ! নিতাই তাকে ভুলিয়ে প্যাণ্টটা খুলে ঝাড়া দিয়ে দেখিয়ে দিলে দারোগাকে। ওর চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে !

দারোগা তাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লেন, কি হয়েছে খোকা কাঁদছো কেন, যাও বাড়ি যাও ছুটি !

সে দারোগার হাতটা তাড়াতাড়ি কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওরা এগিয়ে গেল সুজিৎ ঘোষের ঘরের দিকে। তারপর কড়া নেড়ে ডাকলে, সুজিৎবাবু ! সুজিৎবাবু !

চোর দেখার লোভে সেও পেছন পেছন দিয়ে দাঁড়ালো।

সুজিৎবাবুর দরজা খুলে গেলো ; পুলিশ দেখে চোখ দুটো ধবক্

করে জলে উঠলো, সামলে নিয়ে বললেন স্বাভাবিক কণ্ঠে, এই যে আপনারা, সুপ্রভাত!

এই লোকটা চোর! বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে লক্ষ্য করতে লাগলো মিনটু।

দারোগা ঘরে ঢুকে একটা কাগজ দেখিয়ে বললেন, আপনার নামে একটা ওয়ারেণ্ট আছে। সেই সঙ্গে আপনার ঘরটাও একবার দেখতে হবে!

সুজিৎবাবু বললেন নির্লিপ্তভাবে, দেখুন! তারপর একটা কাঠের চেয়ারে জানালার দিকে মুখ করে বসে পড়লেন।

মিনটু লক্ষ্য করতে লাগলো, শান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যেও তার কপালের শিরাগুলো এক একবার ফুলে ফুলে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সারা ঘর ওলটপালট করে খানাতল্লাসী চললো; মেজের ওপর রাশিকৃত বই জমা হলো, বিছানা বালিশের তুলো ছিঁড়ে জমলো তুলোর পাহাড় খাটের ওপর। ছবির ফ্রেম খুলে ছবি গিয়ে পড়লো মেজেতে, জলের কুঁজোর পেছন দেখতে গিয়ে জলের কুঁজোটা গেল উলটে!

ঘণ্টাখানেক ধরে নানারকম সন্ধানকার্য চললো; মিত্তির বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারা সবাই প্রায় নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে, তাদের মুখে বিচিত্র ভয়মিশ্রিত কৌতূহল!

খানাতল্লাসী শেষ করে হতাশভাবে বললেন দারোগা, না, আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেলো না! চলুন সুজিতবাবু এইবারে আপনাকে যেতে হবে!

স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত সুজিৎবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে একটুকরো ক্ষীণ হাসি।

নিতাই ভয়ে ভয়ে বললে, আমায় কি করতে হবে হুজুর?

দারোগা একটা লম্বা হলদে কাগজ তার হাতে দিয়ে বললেন, সই করুন? ঠিক সেই সময় একজন পুলিশ একখানা ছেঁড়া বই

এনে দারোগার হাতে দিলে। বইটার নামটা পড়তে দারোগার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি বললেন উৎসাহিত কণ্ঠে, আনন্দমঠ!

মিনটু ভাবলে, এ আবার কি? একটা বই চুরি তাও আবার ছেঁড়া! তার কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে!

দারোগা নিতাইয়ের সই করা কাগজটা নিয়ে একটা হাতকড়া সুজিৎবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না! চাকরার খাতিরে......

তার লজ্জিত ভাব দেখে সুজিৎবাবু একটু হেসে বললেন হাতছুটো বাড়িয়ে দিয়ে, ওটা না হলেও চলতো!

হাঁঃ—নাঃ—তা—তা করতে করতে দারোগা হাতে হাতকড়া টিপে চাবি লাগিয়ে দিলেন।

হাতকড়ার শেকলগুলো মৃছু আওয়াজ করে উঠলো। কপালের শিরাগুলো মিলিয়ে গিয়ে সুজিৎবাবুর মুখে ফুটে উঠলো প্রশান্ত হাসি।

ছুদিকে ছুই সেপাইয়ের মাঝে হেঁটে সুজিৎবাবু এসে দাঁড়ালেন রাস্তায়।

দোতলার একটা জানালা খুলে গেলো; মিনটু দেখলে, জানালার গরাদে ধরে মাষ্টারনী দাঁড়িয়ে; সুজিৎবাবু চাইলেন সেদিকে, কি যেন বলা-কওয়া হয়ে গেলো ছুজনের চোখের ভাষায়। আবার কপালের শিরাগুলো একবার ফুলে উঠে মিলিয়ে গেলো; তিনি এগিয়ে চললেন। মিনটু দেখলে, লোকটা নিজের ঘরটা খুলে রেখেই চলে গেলো! অবাক কাণ্ড একবার ফিরেও চাইলে না সেদিকে! তার মনে হলো লোকটা যেন একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছে, বুকটা ফুলে উঠেছে, মুখে সেই হাসি, যেন বনভোজনে চলেছে, কিম্বা ফুটবল খেলতে! তার কিন্তু কেমন যেন কষ্ট হলো, কান্না পেয়ে যাচ্ছে! হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখছুটো মুছে নিয়ে সে চাইলে। ভারী বুটের শব্দ করে পুলিশগুলো তখন গলির মোড়ে পৌঁছে গেছে।

ঘরটা যে খোলা পড়ে রইল! কাকেই বা সে খবর দেবে? কেই বা আছে! মনে পড়ে গেলো দোতলায় দেখা মাষ্টারনীর কথা। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে চাবিতালা কুলুঙ্গির থেকে খুঁজে নিয়ে দরজায় লাগিয়ে ছুট দিলে ভেতর দিকে।

মাষ্টারনীর দরজার গোড়ায় এসে একটু দম নিলে, তারপর সাহস করে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। দেখলে, মাষ্টারনী চুপ করে বসে আছেন! তাঁর মুখের চেহারা দেখে মিনটুর ভয় হলো, চাবিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে জড়িত কণ্ঠে, ওই চোরটার ঘরের চাবি!

সুজাতাদেবী ত্বরিতপদে এসে তার হাতটা ধরে বললেন, ছিঃ খোকা কাকে চোর বলছো?

এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো মিনটুর; সে ভাল করে চাইল সুজাতাদেবীর দিকে, তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তবে? কে ও?

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন তিনি, উনি আমাদের আপনার লোক! তোমার আমার সকলের জন্যেই জেলে গেলেন, তোমাকে আমাকে ভালবাসেন বলেই ওর স্থান আমাদের মধ্যে নেই! বুঝেচো? আর কখনও বলো না ও কথা।

বোকার মতন চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে মিনটু।

সুজাতাদেবী নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ঘরটায় চাবি দিয়ে দিয়েছ তো?

হ্যাঁ, মাথা নিচু করে উত্তর দিলে ও। তুটো হাত দিয়ে তার মুখটা তুলে ধরে বললেন সুজাতাদেবী, সোনা ছেলে! কিন্তু কাউকে বলোনা ভাই চাবিটা আমাকে দিয়েছ।

আচ্ছা! বলে সে তাঁর দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

সামনে একটা ইতিহাসের বই খোলা ; মিনটু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। মৃণ্ময়ীদেবী ছোট খুকীর জন্যে ফ্রক্ সেলাই করছেন বসে ; হঠাৎ তাঁর চোখ মিনটুর ওপর পড়তেই বললেন, এই বুঝি তোর পড়া হচ্ছে ?

মিনটু চম্‌কে খোলা পাতার দিকে চেয়ে পড়তে আরম্ভ করলো, সিপাই বিদ্রোহের পর মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে ভারত শাসনের ভার লইলেন, তাঁহার সুশাসনে লোকে সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল...সেই সময় হই...তে...ই।

মিনটুর পড়া বন্ধ হয়ে গেলো সে ছটফট করে উঠে পড়লো।

কিরে উঠে পড়লি যে ? বললেন মৃণ্ময়ীদেবী ।

এই যে আসছি ! বলে মিনটু বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালো।

সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে—কোন লোকজন নেই ! সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেলো,—মাষ্টারনী বললেন আমাদের জন্যে উনি জেলে গেলেন ! কিন্তু কই ? সকলেই অন্য দিনের মত যে যার কাজে ব্যস্ত ! ওই তো রামকালীবাবু গড়গড়া টানছেন ; ফিটফাট মনোহরবাবু টেরি বাগাচ্ছেন ; নিবারণ জানা কি নিয়ে যেন বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছেন ; সুজিৎবাবুকে যে ধরে নিয়ে গেলো সে সম্বন্ধে তো কারুরি খেয়াল নেই ! তবে কি মাষ্টারনী মিথ্যে বললেন ?...সে চাইল সুজিৎবাবুর ঘরের দিকে। দেখলে অনির কাকা ব্রজেন্দ্রবাবু, আর ললিতের বাবা ব্রজবিহারী কি যেন বলাবলি করছে দাঁড়িয়ে। সে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলে। ব্রজেন্দ্রনাথের গলা ক্রমেই সপ্তমে উঠেছে—তার কানে এলো—কোথাকার বাউণ্ডুলে ছোকরা এসে জুটলো আমাদের বাড়িতে, তাও যাবি যা ঘরের চাবিটা খুলে রেখে গেলেই তো হতো, এখন দেখোত গেরো ! তালা বন্ধ পড়ে থাকবে ভাড়াও পাওয়া যাবে না। ওর মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল

তা ঘুরে গেলো ; বাউণ্ডুলে ছোকরা। মাষ্টারনী তাকে মিথ্যে বলেছে। সে চিন্তিত ভাবে ঘরে ঢুকলো।

মৃণ্ময়ী দেবী তার মুখের চেহারা দেখে কোলের কাছে টেনে বসালেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সে বললে মায়ের দিকে চেয়ে,— তুমি জানো মা, ওই যে সামনের ঘরে একটা লোক ছিলো, ওঁকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে ? মৃণ্ময়ী দেবী সেলাই থেকে চোখ না তুলেই বললেন, জানি বৈকি !

সে আগ্রহভরে প্রশ্ন করলে, ও কে মা ?

ভাল লোক, বললেন মৃণ্ময়ী দেবী।

ভাল লোক তো ওরা ধরে নিয়ে গেলো কেন, বললে জেল হবে ?

তোর বাবারও তো জেল হয়েছিলো, তোর বাবা কি খারাপ লোক ? মুচকি হেসে তিনি বললেন ছেলের দিকে চেয়ে।

বাবাকে কেন জেল যেতে হয়েছিলো মা ?

দেশের জন্যে। তুমি এখন বুঝবে না, বড় হও বুঝতে পারবে। ছেলের বুদ্ধি সম্বন্ধে মায়ের এত কম ধারণা দেখে সে মায়ের ওপর রেগে মুখ গোঁজ করে বসে রইল। মৃণ্ময়ী দেবী তার মুখের চেহারা দেখে হেসে ফেলে বললেন, সেলাইটা শেষ করি, তারপর তোমাকে গল্প বলবো সব বুঝতে পারবে।

॥ ৭ ॥

নিস্তিরদের নিজেদের বসত অংশটা লোকে গমগম করছে। মেজকর্তা শিবকালীবাবু ও সেজকর্তা জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, তাঁদের স্ত্রী পুত্র পরিবার, মায়, চাকর চাকরানী সমেত হাজির হয়েছেন; কাজেই নিজেদের অংশ ছাড়া ভাড়াটে অংশেরও খালি পড়ে থাকা খানিকটা অংশ এখন দখল করতে হয়েছে। এই সঙ্গে এসেছেন এঁদের একটি মাত্র বোন সাবিত্রী দেবী: খ্যাতনামা বসু পরিবারে বিবাহ হওয়ার পর ভ্রাতাদের সঙ্গে সম্পর্কসূত্র ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

ভ্রাতারা একসঙ্গে বাড়ি এলে, বৈঠকখানার আড্ডা জমে ভাল। প্রাতঃকৃত্য সেরে, বড়কর্তা, মেজকর্তা, ছোটকর্তা, ঢালা ফরাসে বসে গল্প-গুজব শুরু করেছেন।

ভ্রাতাদের বয়সের পার্থক্য কম থাকায়, আড্ডার খাতিরে, পরস্পরের মধ্যে ধুমপান ও রসিকতা প্রচলিত করে নেওয়া হয়েছে।

গড়গড়ার নলটা দু একটান দিয়ে রামকালীবাবু বললেন, শিবকালী বাবুর হাতে দিয়ে, নাও ধরাওতো এটা সুবিধে মতন!

শিবকালীবাবুর ভারী, গৌরবর্ণ চেহারা, বিদেশে বাস করার জন্যে রংএর মধ্যে কলকাতিয়া জৌলুস নেই; নিরীহ দার্শনিক প্রকৃতির ছাপ তাঁর কথায় বার্তায় চালচলনে।

ব্রজেন্দ্রনাথের পোশাকের কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে; পরিষ্কার পাট করা আটহাতি ধুতি, গায়ে সাদা ফতুয়া, তিলকহীন নাসিকা!

শিবকালীবাবু কল্‌কেতে আগুন জ্বালিয়ে নলটা দাদার হাতে দিয়ে বললেন, ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে কটাক্ষে চেয়ে, ওহে ব্রজ! তোমার ওই বোষ্টুমি আখড়া ছাড়ো।

কেন ভক্তিমার্গের ওপর এত অশ্রদ্ধা কেন তোমার? বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক হাসি হেসে।

অশ্রদ্ধা নয় হে! আমি দেখছি, যতই তুমি কৃষ্ণপ্রেমে মজছো ততই তোমার সাংসারিক প্রেম কর্পূর হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া কাপড় কোপনীতে দাঁড়াচ্ছে আর কামিনী না হক, কাঞ্চনপ্রীতিতে প্রসিদ্ধ হচ্ছো!

গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কি করবো দাদা, সামান্য আয়, তাতেই সংসার চালাতে হয়, তোমার কি বল? অভাব তো নেই!

হেসে শিবকালীবাবু বললেন, আহা বিনয়ের অবতার! এই একটা গুণ অবশ্য পেয়েছ বৈষ্ণবী আখড়ায়।

দেখ মেজদা, ভগবত প্রেম নিয়ে ঠাট্টা করা ভাল নয়!

তোমরা যে কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের কথা ভুলে যাও তাতেই তো গোল বাধে!

ভুল্‌বো কেন? তবে গোপালই আমাদের আরাধ্য!

যাই বলো ওই নেড়ানেড়ী কিন্তু দেশকে ডোবালে।

ভুল কথা, যদি আমাদের কেউ রক্ষা করে থাকে তবে সে ওই বৈষ্ণব-ধর্ম, নইতো বর্ণাশ্রমের জুলুমে কোনদিন সবাই মোছলমান হয়ে যেত! নিতাইয়ের প্রেমেই তবে গেলো বাংলাদেশ!

শিবকালীবাবু রামকালীবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, দেখছো দাদা শাক্তকুলের প্রহ্লাদ।

আলোচনাটা ঘুরিয়ে দেবার মানসে বললেন রামকালীবাবু, রুনুর বিয়ের কি হবে তাই বল!

এ বিয়ে হতেই পারে না। গম্ভীরভাবে বললেন শিবকালীবাবু। থতমত খেয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কেন কেন?

যদিও ভ্রাতাদের মধ্যে কোন আর্থিক অধীনতা নেই তবু, বড়লোক

মেজকর্তাকে অসন্তুষ্ট করা ব্রজেন্দ্রনাথের পক্ষে শক্ত। মেজকর্তার সোজা আপত্তি শুনে তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন।

আবার আরম্ভ করলেন শিবকালীবাবু, ব্রজ! দিনে দিনে সত্যিই তুমি অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছ! এইটুকু মেয়ে, তাতে আবার ভাল বর, ঘর নয়। একটা তো মেয়ে, দেখে শুনে পরে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দি'ও।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন ব্রজেন্দ্রনাথ, একবার বড়কর্তা একবার মেজকর্তার দিকে; কথাটা যেন তাঁরও মেনে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু ভাল পাত্রের জন্যে ভাল টাকারও প্রয়োজন, মনে পড়তে তিনি চঞ্চল হয়ে বলে উঠলেন, সবই প্রভুর ইচ্ছা মেজদা, এতে মানুষের হাত কতটুকু! রুনুমার কপালে যদি দুঃখ থাকে, কে খণ্ডাবে বলো?

এমনসময় ঘরে এসে ঢুকলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ: বড় ভাইদের তুলনায় চেহারায় লালিত্যের অভাব থাকলেও সেটা খুব চোখে পড়ে না; জার্মেনী কায়দায় চুল ছাঁটা, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কারভাবে কামানো, চক্‌চকে দর্শনধারী: সাদা ট্রাউজারের ওপর ড্রেসিং গাউন চাপানো, মুখে আধহাতখানেক চুরুট।

তিনি এসে তক্তপোশের এককোণে পা ঝুলিয়ে বসে বললেন রামকালীবাবুকে লক্ষ্য করে, দেখ দাদা চেয়ার দু-চারখানা এনে রাখো, নয়তো বড় অসুবিধা হয়।

একটু লজ্জিত হয়ে বললেন রামকালীবাবু, হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় ভুল হয়ে গেছে, আজই আনিয়ে নিচ্ছি!

হেসে বললেন শিবকালীবাবু, তুমি যে দিনে দিনে সায়েব বনে যাচ্ছ তা দাদা জানবে কি করে; তোমার অগ্রগতিটা খেয়াল রেখো!

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন চুরুটে একটা টান দিয়ে, তার চেয়ে বলো তোমরা যে পেছিয়ে যাচ্ছ সেই খেয়ালটাই আমার নেই। তোমাদের

এই সাবেকি মায়া, আর মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা, এ যে একেবারে অচল হয়ে পড়েছে মেজদা!—আমার মত লোহা আঁকড়ে ধরো, রক্ষা পাবে—মাটি শুধু মাটিই করে দেবে! তক্তপোশ নয়, চেয়ার এই পোশাকের উপযোগী;—বৈষ্ণবদের যেমন নামাবলী এও তেমনি এ-যুগের নামাবলী,—তোমাকে সব সময় মনে করিয়ে দেবে, মাটি নয় লোহা! বুঝেছো?

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর ভ্রাতাদের একটু করুণামিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন; যেমন শ্রদ্ধার নিদর্শন মেলে—ইংরাজী ফ্যাসানে সাজানো অতিআধুনিক ড্রইং রুমে ওরিয়েণ্টাল কায়দায় আঁকা ছবি বা দেওয়াল সজ্জার মধ্যে। নিজেকে বর্তমানের সঙ্গে মানিয়ে নেবার সাধনা তাঁর আছে তাই কিছুটা সিদ্ধিলাভও হয়েছে ব্যাঙ্কের অঙ্কে।

অন্য ভ্রাতারা তাঁকে বিস্ময়ের চোখেই দেখেন, মনে মনে গর্ববোধও করেন; তাই তাঁর যুক্তির সবটা মেনে নিতে না পারলেও প্রশ্রয় দেন। এই কর্মকুশলী, কালজয়ী ভ্রাতাটি তাঁদের ক্ষয়শীল পরিবারের একটা সুখপ্রদ ব্যতিক্রম।

রামকালীবাবু বললেন হেসে—যা বলেছ জ্ঞান, আমরা পিছিয়ে আছি তাই তোমার এগিয়ে যাওয়াকে কটাক্ষ করছি!

তর্ক করার লোভে বললেন শিবকালীবাবু, তা বলা যায় না দাদা, কে আগে, আর কে পিছিয়ে, এর বিচার আজও হয়নি।

কেন? বললেন রামকালীবাবু।

যেখানে লোহার কদর বেশি, সেখানের লোক, শেকলের ভারে নুয়ে পড়েছে, লোহার সাধনায় শেকল জুটেছে কপালে!

যাই বলো শিবু! শেকলই হোক আর যাই হোক, তোমার আমার মত কেউ থম্‌কে দাঁড়িয়ে নেই, সবাই চলার মুখে, শেকল ছিঁড়তে কতক্ষণ!

ছেঁড়া শক্ত দাদা!

তা হোক। থেমে থাকলে, শেকল না জুটুক, বুকটা পাথর চাপা যেতে পারে!

বড়কর্তার কথায় জোর পেয়ে বললেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, দেখ মেজদা, বড়দা সত্যি স্বীকার করতে ভয় পায় না আর তুমি জড়ভরতের ওপর যুক্তি খাড়া করে মনকে আঁখি ঠারো!

দার্শনিক গাম্ভীর্যে বললেন শিবকালীবাবু, বুঝবে না তুমি! এই বস্তুতান্ত্রিক, তথা বৈজ্ঞানিক সভ্যতা, মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে উন্নতির পথে নয়! তোমার ওই লোহার মায়া মানব সমাজের ধ্বংসের কারণ হবে!

ও আর নতুন কথা কি? ওটা শুধু তোমাদের মগজেই বয়ে যাবে! কেইবা পারছে কালের মুখ ফেরাতে? কি জানো, হয়তো পারতো, যদি লোহা কাটা ইস্পাত হাতে থাকতো।

শিবকালীবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ নিজের সমস্যায় সচেতন হয়ে বলে উঠলেন,, দেখ মেজদা, আমি প্রায় ঠিকই করে ফেলেছি এখন আর রুনুর বিয়ে বন্ধ করা যায় না।

রেগে বললেন শিবকালীবাবু, খুব যায়! এ বিয়ে বন্ধ করতেই হবে ব্রজ!

এই দেখো তোমরা সাবেকি লোকরা ব্যক্তিস্বাধীনতা একেবারেই আমল দাও না! ব্রসব ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে দিয়ে কোনো কিছু করানো আমি পছন্দ করিনা, ওর ইচ্ছে হয় রুনুর বিয়ে দিক, ওর সে স্বাধীনতা আছে, তবে এ-বিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি বর্বরোচিত মনে করি, বললেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, নিস্পৃহভাবে।

রামকালীবাবু বললেন, তাই ভাল শিবু ব্রজকে ওর ইচ্ছামত কাজ করতে দাও, আমাদের কোনো কথা না বলাই ভাল।

খুশি মনে উঠে যেতে যেতে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, আমাদের আর কতটুকু শক্তি! সবই তাঁর ইচ্ছে দাদা!

ব্রজেন্দ্রনাথ চলে যাবার পর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে ইঙ্গিত করে, হাতের চেটোটা উল্‌টে দিলেন শূন্যে, তারপর বললেন, তুমি আমি কি করতে পারি, যে পোকা আগুনে পড়বে তাকে পড়তে দাও!

আবার নানা বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁদের তর্ক জমে উঠলো। শুধু রামকালীবাবু তর্কের সূত্র হারিয়ে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন।

॥ ৮ ॥

মিত্তিরবাড়ির সদর দরজার ডানদিকে তিনখানি ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করছেন ব্রজবিহারী চট্টোপাধ্যায়। মিনটুর দলের সবচেয়ে নিরীহ বলে যার দুর্নাম আছে সেই ললিতের পিতা।

বাইরের দিকের ঘরটায় তক্তপোশের ওপর বসে ব্রজবিহারীবাবু বিড়ি ধরাচ্ছেন চিন্তিত ভাবে। বৈচিত্র্যহীন চেহারা; মুখে ক্ষয়িষ্ণু জীবনযাত্রার বিষণ্ণতা; চোখে অসহায় দৃষ্টি। মানসিক বিশৃঙ্খলা যেন ছড়ানো রয়েছে সারা ঘরে।

পাশের ঘর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল, ওগো শুনছো?

ভুরু কুঞ্চিত করে তাকালেন ব্রজবিহারীবাবু।

খুকীর জ্বরটা আবার আজ বেড়েছে,—আমার অষুধটাও ফুরিয়ে গেছে।

কথাগুলো যেন এক একটা হাতুড়ির ঘা বসিয়ে গেলো; গভীরভাবে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন ব্রজবিহারীবাবু, দেখি যাই একবার ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারের কথা ভেবে নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন—বার বার ভিজিট দেবার সামর্থ নেই অথচ ডাক্তার চাই। ডাকলেই সুরেশ ডাক্তার আসে, কিন্তু কেন আসে তা তাঁর অজানা নয়। মালতী, তাঁর মেয়ে, আঠারো পেরিয়ে উনিশে পা দিয়েছে—বিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, সেকথা ভাবতেই ব্রজবিহারীবাবুর ভয় হয়। তার সঙ্গে ডাক্তারের মেলামেশা হাজার খারাপ লাগলেও মেনে নিতে হয়েছে;—যেমন মেনে নিতে হয়েছে এই জীবনযাত্রা। তাঁর মনে পড়ে স্বপ্নরঙ্গীন যৌবনের স্মৃতি। বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্ব, কলেজ থেকে এসে সারা সন্ধ্যা দুটি মনের কত মধুর জীবনচিত্রের কল্পনা! আজ তা কত তুচ্ছ কত

অবাস্তব হয়ে গেছে, যা একদিন জীবনের মতই সত্য মনে হতো। মনে পড়ে যায় সুষমার স্বাস্থ্যপ্রাচুর্যের কথা, সেটা শুধুমাত্র কুৎসিৎ অস্থি-সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এ-রকম হলো? জীবনকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছা তো তাঁর কোনদিনই ছিলো না? পড়া শেষ করে বাবার মৃত্যুর পর কত রকম ভাবেই না একটা ভাল চাকরীর সন্ধান করেছেন, শেষে না পেয়ে করছেন দালালী, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও সাংসারিক প্রয়োজন মেটানো ক্রমে অসম্ভব হয়ে উঠছে, তার ওপর মেয়ের বিয়ের খরচ। আর ভাবতে পারলেন না তিনি, ছট্‌ফট্‌ করে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো, সুষমাই বুঝি সব কিছুর মূলে! ব্যর্থ জীবনের যত অভিমান যত আক্রোশ গিয়ে পড়লো তাঁর ওপর। অর্থহীন কাঠিন্যে তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন সুষমার বিছানার কাছে। কি একটা রূঢ় কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে চোখে পড়ে গেল সুষমার রোগপাণ্ডুর মুখখানা, আর সদ্যজাত শিশুর মত অসহায় দৃষ্টি! একটা ঢোক গিলে বললেন, অষুধ ফুরিয়ে গেছে আগে বলোনি কেন? শুধু শুধু রোগটা বাড়িয়ে লাভ কি!

একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো সুষমার মুখে, মনে হলো স্বামীর অন্তরের গোপনতম স্তর পর্যন্ত দেখে নিয়েছেন। বললেন, আমার জন্যে ভাবনা নেই তাড়াতাড়ি মরলেই ভাল, খুকীটার জন্যেই ভাবনা ওর জ্বরটা যে আবার বেড়ে উঠলো!

ব্রজবিহারীবাবু স্ত্রীর রুক্ষ চুলগুলোয় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, সুরেশ ডাক্তারকে খবর দি, অষুধটা দিলেই জ্বরটা নেবে যাবে।

বাবা ভাত দেওয়া হয়েছে, ঘরে এসে ঢুকলো মালতী: দোহারা গড়ন, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নিপুণ শিল্পীর হাতে খোদাই করা মুখশ্রী, সরু তুলিতে আঁকা ভুরুর তলায় টানা টানা ঘন কালো চোখ।

ব্রজবিহারীবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

মালতী আবার বললে কাছে এসে, চলো বাবা ভাতগুলো কড়কড়িয়ে যাবে যে।

এই যে যাই, একটা নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলেন তিনি।

তাদের যাওয়া লক্ষ্য করে ভাবলেন সুষমা : মেয়েটা সত্যিই বড় হয়ে উঠেছে। এ বয়সে তাঁদের একটা ছেলে হয়ে গেছ্‌লো ; কবে যে বিয়ের ফুল ফুটবে! সুরেশ ডাক্তারকে বেশ লাগে, ওই রকম একটি জামাই যদি তাঁর কপালে জুটতো ; বড ভাল মানায় মালতীর সঙ্গে। শরীরের কথা মনে পড়তেই তাঁর চোখ জলে ভরে এলো : একে সংসারের অনটন, তার ওপর এই ছ-মাস নিজে শয্যাশায়ি! শরীর ভাল থাকলে অন্তত গতর খাটিয়ে-ও সংসারের কতকটা সুবিধা করতে পারতেন, তাতেও ভগবান বাদ সাধলেন ; কবে যে সুস্থ হবেন? মরণও হয় না, তা হলেও তো কতকগুলো পয়সা বাঁচে! একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজলো সুষমা।

খাওয়া সেরে বাইরের ঘরে এলেন ব্রজবিহারীবাবু। জামাটা মাথায় গলিয়ে ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা বগলে নিয়ে বেরোতে যাবেন এমন সময় ব্রজেন্দ্রনাথের গলা শোনা গেলো।

ব্রজবিহারী বাড়ি আছ নাকি হে?

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে বললেন ব্রজবিহারীবাবু, হ্যাঁ! এই যে আসুন।

তাঁকে দেখে স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, যাক্ দেখা হয়ে গেল, গতমাসের ভাড়াটা এখনও পাইনি তাই এলুম।

ভাড়াটা আপনার এই হপ্তার মধ্যেই দিতে চেষ্টা করবো। ব্রজবিহারীবাবু বল্‌লেন একটু ইতঃস্তত করে।

অনেকদিন হয়ে গেল, আমাদেরই বা চলে কি করে বাপু? আমাদের ওই ভাড়াই তো সম্বল।

সে তো ঠিক কথা, বাড়িতে অসুখের জন্যে বড় টানাটানিতে পড়েছি, আপনাকে এই হপ্তার মধ্যেই একমাসের ভাড়া শোধ দিয়ে দেবো।

বেশ এই হপ্তার মধ্যেই দিও। ব্রজেন্দ্রনাথ পাশের ঘরে ভাড়া আদায় করতে গেলেন ; ব্রজবিহারীবাবু কাজে বেরোলেন।

হাতে ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে সুশ্রী, ফিট্‌ফাট্ একটি স্যুট্‌পরা যুবক এসে কড়া নাড়লো। ভেতরে সুষমার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, মালতী দেখতো মা, কে যেন কড়া নাড়ছে!

মালতী খাওয়া সেরে হাত ধুচ্ছিলো ; সে কাপড়ে হাত মুছে, গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে।

ভেতরে এসে সুরেশ বললে, মাসীমা আছেন কি রকম মালতী? তারপর তার মুখের দিকে চেয়ে বললে একটু হেসে, মুখ-ময় হলুদ যে? খুব রান্না করা যাহোক!

মালতী লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলে ; তুজনে গিয়ে ঢুকলো সুষমার ঘরে।

বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে হাতটা তুলে নাড়ী দেখতে দেখতে সুরেশ বললে, এদিকে এসেছিলুম তাই একবার আপনাকে দেখতে ঢুকে পড়লুম, কেমন আছেন?

সুষমা শুয়ে শুয়েই মাথার কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে বললেন নিম্নস্বরে, আমার জন্যে ভেব না বাবা, খুকীটার জ্বর আবার বেড়েছে, ওকে একটু দেখ।

তা নয় দেখছি—কিন্তু আপনার শরীর তো তেমন ভাল নেই মনে হচ্ছে ; অষুধটা খাচ্ছেন তো?

অষুধ আজ তিন দিন ফুরিয়ে গেছে আর আনা হয়নি একথা বলতে বাধলো সুষমার, শুধু মাথা নাড়লেন।

সুরেশ ছোট খুকীর বুকে স্টেথিস্‌কোপ বসিয়ে পরীক্ষা করলে।

তারপর আঙ্গুল দিয়ে তার পেটটা বাজিয়ে বললে, মালতীর দিকে চেয়ে—কাগজ নিয়ে এসো, অষুধ লিখে দিচ্ছি।

সুষমা তারদিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলেন, কোটের কলারটা ঠিক করে নিতে নিতে বললে সুরেশ—'ও কিছু নয়, অষুধটা খেলেই জ্বর নেবে যাবে। মালতীর আনা কাগজে সুরেশ খচ্‌খচিয়ে লিখে যায়; সুষমার মনে হয়, আহা কেমন ছেলে! না বল্‌তেই কে এত যত্ন নিয়ে দেখে? ছেলেমানুষ হলে কি হবে, এরি মধ্যে কেমন পাকা ডাক্তার হয়ে উঠেছে! হীরের টুক্‌রো; মালতী কি আর ওর যোগ্য! এ যে আকাশকুসুম। কত মেয়ে ওর জন্যে তপস্যা করছে,—তা ছাড়া মেয়ের বাপেরা তো বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা বেঁধে রেখেছে! যত সব অসম্ভব ভাবনা কি তাঁরই?—বার বার নিজের কাছে নিরাশ হতে চান তবু যখনই সুরেশ মালতীর চোখ চোখে পড়ে তখনই তাঁর মনে নতুন করে ক্ষীণ আশা উঁকি মারে।

মালতী, সুরেশকে এককাপ চা করে দাও!

ও এই যেন চাইছিলো, ওর মনটা খুশিতে ভরে ওঠে, হাল্‌কা চোখে চায় মালতীর দিকে।

সুষমা বুঝতে চেষ্টা করেন সে চোখের ভাষা; অনেকদিন আগেকার দুটো চোখ তাঁর মনে ভেসে 'ওঠে; তবে কেন হতাশ হবেন? সুরেশকে একবার বলে দেখলে কি হয়? না আজ থাক অন্যদিন।

যাও বাবা, এখানে রুগীর ঘরে কেন? বাইরের ঘরে বসোগে। তাঁর কথায় ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সুরেশ।

এককাপ চা হাতে করে ঘরে এসে ঢুকলো মালতী, সুরেশ তখন একটা বইয়ের পাতা উল্‌টোচ্ছে।

এরি মধ্যে মালতী তার চুলগুলো গুছিয়ে মুখখানি ধুয়ে নিয়েছে।

সুরেশ চায়ের কাপ নিয়ে, একটা চুমুক দিয়ে বললে, বাঃ সুন্দর হয়েছে আর রংটাও ঠিক তোমার গালের মতন।

না শুনতে পাবে, আপনি ভারী অসভ্য।

মালতীর মনের মধ্যে সুখের বান এলো ; বুঝি বা দুকুল ভাসিয়ে দেয়। সুরেশের দিকে চেয়ে ভাবে, এর'ওপর নির্ভর করা চলে, তবে কেন সে দ্বিধাভরে সরে যাবে।

সুরেশ চায়ে চুমুক দিতে দিতে চেয়ে থাকে মালতীর দিকে : পাথরের গড়া একটা নিখুঁৎ মূর্তি, শিল্পীর সামনে বুঝি প্রাণপ্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

হাতের মধ্যে কতকগুলো টুকরো ডালপালা, বইখাতা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো ললিত। দেখতে দিদির মতন ; শাড়ী পরিয়ে দিলে বেছে নেওয়া শক্ত কে ললিত।

সুরেশকে দেখে বললে সে, এই যে ডাক্তারবাবু কখন এলেন ?

এই খানিকক্ষণ হলো। তারপর ললিতের হাতের দিকে লক্ষ্য করে বললে, ওগুলো কি হে ? ডালপালা দিয়ে কবরেজি অষুধ বানাবে নাকি ?

একটু হেসে চাইল ললিত ; তারপর একটা ফ্যাকড়াওয়ালা ডাল তার মুখের সামনে ঝুলিয়ে বললে, ম্যাজিক ডাক্তারবাবু। দেখবেন ?

কই দেখি।

মালতী বললে, এই যে ললিতের পাল্লায় পড়েছেন ? ডালের ম্যাজিক দেখতে শুরু করলে আপনার বাড়ি ফেরা মুশকিল হবে।

সুরেশ মুচকি হেসে চাইল মালতীর দিকে।

দিদির কথায় কান না দিয়ে ভাঙ্গা একটা ডাল তুলে ধরে বললে ললিত, এই দেখুন! কি দেখছেন ?

কিছু না ভাঙ্গা ডাল। সুরেশ বললে ছদ্ম গাম্ভীর্যে।

ভাল করে দেখুন। একটা হরিণ ছুটে যাচ্ছে।

এবারে দেখতে পেলো সুরেশ একটা শিংওয়ালা হরিণ ছুটে চলেছে। সে বললে অবাক হয়ে, ঠিক তো! সেই রকমই দেখাচ্ছে।

আবার একটা ডাল বেছে ললিত তুলে ধরে বললে, দেখুন তো একটা বাদুড় গাছে ঝুলছে কি না?

বিস্মিত হয়ে বললে সুরেশ, হ্যাঁ বাদুড়ই বটে, কিন্তু এগুলো কোথায় পাও?

কেন রাস্তায় যেতে যেতে প্রায়ই তো চোখে পড়ে।

চোখ বটে তোমার ললিত; রাস্তায় এই সবই চোখে পড়ে। হেসে হেসে বললে সুরেশ।

ঘরে এসে ঢুকলেন ব্রজবিহারীবাবু, তাঁর হাতে একটা অষুধের শিশি। সুরেশকে দেখে তাঁর মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠলো; নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এই যে সুরেশ, আমি তোমার দেখা না পেয়ে পুরোন অষুধটাই কিনে নিয়ে এলাম। সুষমার শরীরটা আজ বেশ ভাল নেই, তুমি কি দেখলে ওদের?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অষুধও একটা লিখে দিয়েছি, সুরেশ বললে বিনীত ভাবে।

ব্রজবিহারীবাবুর ললিতের ওপর চোখ পড়তেই রেগে উঠলেন, ফের তুই যত জঞ্জাল জড় করে এনেছিস ঘরে।

অপরাধীর মত ললিত তার সংগ্রহগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ত্বরিত পদে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ব্রজবিহারীবাবু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন: অযাচিত ভাবে সুরেশ কেন আসে? তাঁর ইচ্ছে হয় সুরেশকে বলে দিতে যে তিনি চাননা সুরেশের এই ঘনিষ্ঠতা। পরমুহূর্তেই অসহায় ভাবে বলেন তিনি, খুকীকে কেমন দেখলে সুরেশ?

ভয়ের কিছুই নয়, বুকে একটু সর্দি রয়েছে তাই জ্বরটা বেড়েছে,

অষুধটা খাওয়ালেই জ্বর নেবে যাবে ; আমি তা হলে এখন আসি, কালকে আর একবার দেখে যাবো।

তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন ব্রজবিহারীবাবু, এসো, আমি অষুধটা এখুনি নিয়ে আসছি। সুষমার ঘরে ফিরে গিয়ে, কোন কথা না বলে, ব্রজবিহারীবাবু একটা শিশি নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় মালতীকে হেঁকে বলে গেলেন, মালতী দরজাটা বন্ধ করো।

॥ ৯ ॥
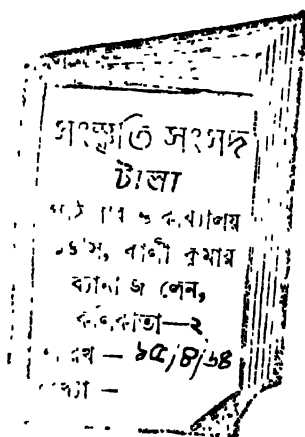
মিত্তিরবাড়ির দোতালার দালান কর্মকোলাহলে মুখরিত। গিন্নিরা প্রায় সবাই ব্যস্ত : কেউ বঁটির সামনে রাশিকৃত আলু কপি ইত্যাদি নিয়ে, কেউ পান সাজা নিয়ে, কেউ তদারক কার্যে। কারুরি নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ নেই ; স্বয়ং যমরাজকেও এ সময়ে এলে, খানিকটা অপেক্ষা করতে হবে এই রকমই তাঁদের ধারণা। হাতের তালে মুখও চলছে, কাজগুলো হয়ে চলেছে নিখুঁৎ ভাবে, পাকা ওস্তাদের গানের মত।

রুনুর মা ছোটগিন্নি কথার মধ্যে ডাক দিলেন, রুনু, ও রুনু, কোথায় গেলি!

ছোট গিন্নির চেহারা হালকা ; আলগা ধবনের মুখশ্রী ; ঠিক কি যে সুন্দর তাঁর চেহারায় সেটা ধরা যায় না। রুনুরই মতন চোখটি ভাল, না নাকটি, না চিবুকটি, ঠিক বলা শক্ত। কোন কিছুর প্রাধান্য নেই বলেই তাঁর মুখে একটা অপূর্ব লাবণ্যশ্রী মাখান ; একবার চাইলেই আর একবার চাইতে ইচ্ছে করে। হাতের কাজ বন্ধ করে তিনি বললেন সাবিত্রী দেবীর দিকে চেয়ে, দেখতো দিদি, মেয়েটার কাল বিয়ে, আর আজও গেলো খেলতে! একটা কথাও কি শোনে?

সাবিত্রী দেবী একটু মুচকি হাসলেন : তিনি রীতিমত স্থূলাঙ্গী ; গৌরবর্ণ, চুলে পাক ধরলেও প্রসাধনের প্রতি নজর আছে। সর্বসময়ে গালের মধ্যে কাশীর জর্দা আর পান ঠাসা থাকার জন্যে কথা বলেন কম। নিন্দুকেরা বলে, তিনি দেমাকে বেশি কথা বলেন না—তবে দেমাক হলে নাই বা কেন? অতবড় ঘরের বৌ ; তার ওপর স্বামীটিকে বেশ বশ করেছেন পোষা বেড়ালটির মত ; এমন হলে সকলেরই ও রকম হয় একটু আধটু।

বড়গিন্নি সুপুরি কাটা থামিয়ে বললেন, তা দোষ কি দিদি! ওই তো একরত্তি মেয়ে, বিয়ে হচ্ছে বলেই তো আর কিছু মনটা বদলায়নি!

ছোটগিন্নি যেন অপরাধীর মত মাথা নিচু করলেন, তাঁর মুখে বিষাদের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সেজকর্তার বড় মেয়ে ললিতা হাতের উলটা আঙ্গুলে পাকিয়ে নিয়ে বললে, তা যাই বলো, আজকালের দিনে এরকম বিয়ে দেখা যায় না, নতুনত্ব আছে ছোটকাকার!

তার রং ফরসা, দেহ যৌবন সুলভ লক্ষণে পরিপূর্ণ। চেহারায় দোষ ধরবার বয়স এ নয়, কাজেই সুন্দরীর পর্যায় ফেলা চলে। জামা কাপড় পরার ব্যাপারে, যথেষ্ট অতিআধুনিক রুচির পরিচয় মেলে। গোল গলার ব্লাউজের নিচে অনাবৃত দেহের অংশ পিসিমার চোখে খারাপ ঠেকলো, তিনি কটাক্ষ করে বললেন, তা তোরা হচ্ছিস অপটুডেট মেয়ে, তোদের চোখে এটা নতুন ঠেকবে বৈকি! আমাদের কিন্তু বাপু এই বয়সেই বিয়ে হয়েছিলো, আমাদের মন্দই বা কি হয়েছে?

মন্দর কথা কি বলছি!—বললে ললিতা।

মুখের পিচটা ফেলে সাবিত্রী দেবী বললেন, এই যে তোর বাবা! তোর জন্যে রাজপুত্তুর খুঁজতে গিয়ে তুই বুড়িয়ে গেলি, তোর বয়সে আমাদের দুতিনটে ছেলে হয়ে গেছলো—আর তোর কপালে এখনও বর জুটলো না।

লজ্জায় লালচে হয়ে বললে ললিতা, যাও কি যে বলো পিসিমা!

হেসে আড়চোখে চেয়ে বললেন সাবিত্রী দেবী, এখন কি যে বলি! হ্যা লা! বালিস বুকে দিয়ে আর কতদিন কাটাবি? বলনা বাপকে যাহোক একটা জুটিয়ে দিতে!

রাগের ভান করে ললিতা বলে উঠলো, কি অসভ্য তুমি পিসিমা—আমার সঙ্গেও ঠাট্টা! সাবিত্রী দেবী আরো কি বলতে

যাচ্ছিলেন তাড়াতাড়ি ললিতা সেখান থেকে উঠে চলে গেলো। বড়গিন্নি বললেন ননদের দিকে চেয়ে, সত্যি মেয়েটা বেশ বড় হয়ে গেছে। সেজকর্তা বিয়ে দিচ্ছে না কেন—পয়সার তো আর অভাব নেই, দিলেই তো পারে দেখে শুনে।

সেজগিন্নি আলু কুটতে কুটতে এঁদের দিকে আড়চোখে চাইলেন। তারপর বললেন, ভাল পাত্র না হলে কি করে দি বলো দিদি?

পাত্রর কি আর অভাব। তবে তোমাদের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট না হলে যে মন উঠবে না! বললেন বড়গিন্নি।

সাবিত্রী দেবী তাঁর কথায় সায় দিলেন, যা বলেছো—যাদেরই টাকা আছে তারাই খোঁজে আই, সি, এস্। এত আই, সি, এস্ জোটে কোথা থেকে বলো।

হাতে কতকগুলো রঙীন শাড়ী ব্লাউজ নিয়ে গিন্নিদের আসরে এলেন ব্রজেন্দ্রনাথ; ছোটগিন্নির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঝুনু কোথায় গেলো? জামাগুলো একবার গায়ে দিয়ে দেখে নিতে হবে।

ছোটগিন্নি উত্তর দিলেন ঘোমটা টেনে, এই যে কোথায় গেলো এখনও আসেনি।

কোথায় গেছে? নিশ্চয় খেলতে! তুমি দেখছি মেয়েটার মাথা খেলে! বিরক্ত হয়ে বললেন তিনি।

রেগে বললেন ছোটগিন্নি, আমি কি করবো, আমার কথা শোনে নাকি? নিজে সামলালেই তো পারো।

ব্রজেন্দ্রনাথ চুপ করে গেলেন;—তাঁর হাতের জামা কাপড়গুলো দেখতে লাগলো গিন্নির দল। মেজগিন্নি মুচকি হেসে বললেন, ঠাকুরপো, এইগুলো তুমি বিয়েতে দেবে নাকি?

কেন কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

না কিছু না, আমি ভাবছি এতো পয়সা কোথায় রাখবে ?

কথার আসল মানে বুঝে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন ব্যস্ত হয়ে, পয়সাই দেখছো বৌদি। পয়সা থাকলে কি আর—। কথাটা শেষ না করেই যেন একটু খুশি হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। গিন্নিদের মধ্যে নিম্নস্বরে কাপড়ের খেলো জমি নিয়ে আলোচনা চলতে লাগলো।

সাবিত্রী দেবী বললেন নাকি সুরে, এ রকম সাতজন্মে দেখিনি বাবা, একটি মেয়ে। বরপক্ষই বা বলবে কি ? দেখ, এই নিয়ে না ফ্যাসাদ বাঁধে।

ছোটগিন্নির দিকে চেয়ে বললেন বড়গিন্নি, তুমি একবার বলে দেখো না, মেয়েটাকে যে অনেক গঞ্জনা সইতে হবে শ্বশুরবাড়িতে।

আমি বলবো না দিদি। আমার হাড় ভাজাভাজা হয়ে গেছে। যা বলার তোমরাই বলো। ভাঙ্গা গলায় বললেন ছোটগিন্নি।

তেতলার সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে এলো রুনু : চোখমুখ লাল, ঘামে জামা ভেজা, কপাল দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। তাকে দেখে ঝাঁজিয়ে উঠলেন ছোটগিন্নি, হতভাগী মেয়ে তোর জন্যে কি মাথা খুঁড়ে মরবো।

অবাক হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে বললে রুনু, কেন আমি কি করলুম ?

তোকে যে একশোবার বারণ করেছি আর খেলতে যাবি না। আজ বাদে কাল বিয়ে, এখনও ধিঙ্গিপনা।

রুনু বললে মাথাটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, বিয়েতো ভারী বোয়ে গেছে। খেলতে যাবো না।

ছোটগিন্নি অসহায়ভাবে বললেন সবায়ের দিকে চেয়ে, শুনলে মেয়ের কথা। উনি এসে যতদোষ আমায় দেবেন, এই মর্দা মেয়েকে সামলালেই তো পারেন।

রুনু মায়ের কথায় কান না দিয়ে বসলো গিয়ে সাবিত্রী দেবীর কোল ঘেঁষে। তিনি তার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ছি মা, তোমার বিয়ে হবে কাল, আজ কি বাইরে বেরোতে আছে?

বারে, বিয়ে হবে বলে ঘরের মধ্যে বসে থাকবো নাকি?—ভারি তো বিয়ে! ক্ষুব্ধ ভাবে বললে রুনু।

তার কথায় সবাই হেসে উঠলো।

ও, বিয়ের কি বোঝে বাপু! বলে গেলেন বড়গিন্নি—চল রুনু ব্যসন দিয়ে তোর হাত-পায়ের ময়লাগুলো তুলে দিগে, রুনুকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ললিতা পিসিমার ঠাট্টায় গিন্নিদের আসর থেকে উঠে এসে ঢুকলো নিজের ঘরে। সৌখীন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের আধুনিক রুচি অনুযায়ী খরিদ করা কতকগুলো আস্‌বাবে সাজানো ঘরটি। একটা সোফায় বসে পড়ে ললিতা সেল্‌ফ থেকে বই টেনে পড়তে চেষ্টা করলো। মনটা তার কেমন যেন হয়ে গেছে পিসিমার কথায়! পিসিমা যেন কি? এত বয়স হয়েছে তবু মুখে কিছু আটকায় না! তাকে না হয় বালিস বুকে করে শুয়ে থাকতেই দেখেছে তাই বলে সবায়ের সামনে ওইভাবে বলা কি তাঁর উচিত হয়েছে? সে ছটফট করে বই বন্ধ করে উঠে পড়লো।

আরশির কাছে দাঁড়িয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। ছাতের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে তার মনে হলো ক'লকাতায় সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে! ভাল লাগে না। ছাতে উঠে আল্‌সেতে ভর দিয়ে চারিদিকে চাইল, দেখলে বাড়ির পেছন দিকে হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানগুলো কাজের থেকে ফিরে যে যার রুটি পাকাচ্ছে; সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে। সূর্য অস্তমিত, শুধু সোনালি

রশ্মিরাশি তখনও চল্‌তি মেঘের কোলে দোল খাচ্ছে; সেইদিকে চেয়ে বিমনা হয়ে পড়লো।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হলো তারদিকে কে যেন চেয়ে রয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে নিচের দিকে চাইতেই দেখতে পেলে, তাদেরই ভাড়াটে মনোহর ছেলেটা চেয়ে। অসহ্য লাগলো ললিতার; আচ্ছা অসভ্য তো ছেলেটা, ওরকম করে চেয়ে থাকার মানে কি?

ফিরে চাইতেই ললিতা দেখতে পেলে ছাতের অপরপ্রান্তে কে যেন গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। পেছন থেকে তার চেনা মনে হলো: মিনটু না? হ্যাঁ তাইতো। সে পায়চারি করতে করতে এগিয়ে গেলো সেই দিকে। প্রায় দেড় বছর হলো সে মিনটুকে দেখেনি, মিনটু অনেক বড় হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে ললিতা মিনটুর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলে। চম্‌কে চাইলো মিনটু, তারপর তাকে দেখে হেসে বললে, ললিতাদি, আমি ভাবছিলুম কে না কে!

কি করছো মিনটু চলো দুজনে বেড়াই। —তার কাঁধে আর একটা হাত চাপিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো ললিতা তার মুখের দিকে। মিনটুও চাইল: অনেকদিন পরে সে দেখছে ললিতাকে, তার মনে হলো কি যেন বদ্‌লে গেছে,—ঠোঁটটা যেন বেশি লাল রং, আগের চেয়ে অনেক ফরসা দেখাচ্ছে, আর ভুরুগুলো তো এতো সুন্দর ছিলো না। গড়েরমাঠে দেখা মেমেদের মত ঠেক্‌লো মিনটুর।

তাকে আল্‌তো আকর্ষণ করে বললে ললিতা, চলো আমরা ছাতে পায়চারি করি। মিনটুর একটা হাত চেপে ধরে ছাতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত বেড়াতে শুরু করলে ললিতা।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আবার ফ্যাকাশে হচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের

দ্বিতীয়ার চাঁদ ক'লকাতার অট্টালিকার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিতেই, আলো এসে পড়লো ছাতে। ললিতা দেখলে, ঝাঁকড়া চুলের তলায় চঞ্চল চোখ দুটো তার মুখের ওপব দিয়ে ফিরে ফিরে যাচ্ছে। মদিরাক্ষী ললিতা দুহাতং দিয়ে তাকে আকর্ষণ করে চেপে ধরলো বুকের ওপর। বিহ্বলতা কাটিয়ে মিনটু চেষ্টা করলো নিজেকে মুক্ত করতে: যৌবনের যাদুস্পর্শে রেখায়িত অল্পপরিসর খাঁজের মধ্যে তার মাথাটা বুঝি গুঁড়িয়ে যাবে! ললিতার বুকের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে; হঠাৎ ললিতা নিচু হয়ে তাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিলে, তার কানে এলো ললিতাদির অপরিচিত কণ্ঠস্বর, মিনটু, মিনটু। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে তপ্ত দেহটার থেকে তফাৎ করে নিয়ে সে ছুটে পালাল। ললিতা তার বেপমান শরীরটা আলসেব ওপর চেপে ধরে চাইল গঙ্গার চকচকে স্রোতের দিকে।

॥ ১০ ॥
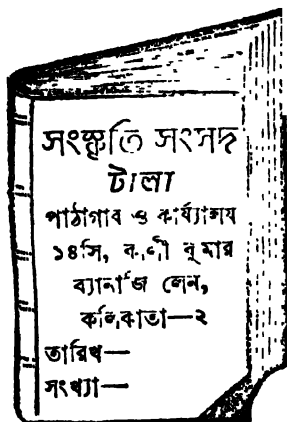
সানাই বেজে চলেছে। শুধ্-সারেঙ্গএর করুণ মিড়ে, বিষাদিত মধ্যাহ্ন হয়ে উঠেছে বেদনাতুর। গত রাত্রের বিবাহবাড়ির উত্তেজনা ঝিমিয়ে এসেছে। সদর দরজার সামনে ডাস্টবিনে এঁটো গেলাস খুরি পাতার স্থানসংকুলান না হওয়ায় জমা হয়েছে রাস্তার এদিকে ওদিকে। একটি ভিক্ষুক তার আহার্য যোগাড়ের চেষ্টায় সেগুলো হাতড়াচ্ছে; ভিক্ষুকের ভাগীদারও জুটেছে রাস্তার হ্যাংলা কুকুর গোটা দুই, আর ছাতের ওপর বসা বায়সগোষ্ঠী। তাদের চিৎকারে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো সে,—শালার এত কাকও আছে ক'লকাতায়! নিশ্চিন্দি মনে খেতে দেবে না দেখছি।

মিত্তিরবাড়ির বৈঠকখানায় তখন চলেছে নতুন বৈবাহিকের সঙ্গে বচসা, বিবাহের দেনা-পাওনা নিয়ে।

ওপরের দালানে চলেছে কনে সাজানোর পালা, আর চাপা কান্নার ফোঁস্ ফোঁসানি।

অবশ্য বিয়ের পুর্বে এ বাড়ির বাসীন্দাদের মনে যতটা দুশ্চিন্তা ছিলো, তার সবটাই প্রায় কেটে গেছে বর দেখে; সুন্দর ছিপ্ ছিপে তরুণ বরের মুখের দিকে চেয়ে তাঁরা প্রায় সবাই তারিফ করেছেন,—কেউ কেউ মন্তব্যও করেছেন, আহা কেমন সুন্দর মানিয়েছে দেখ বরকনে, বিয়ে দিলে এই বয়সেই দেওয়া ভাল বাপু।

তবে বড়কর্তার কণ্ঠস্বর যেন খাদে নেবে গেছে আর শিবকালী-বাবুর মুখে ফুটে উঠেছে দার্শনিক নির্লিপ্ততা।

ছাতে চলেছে ছেলেদের জটলা। মিনটু, অমি, ললিত, চিত্ত, ভুতো, সকলেই বেশ মনমরা। বর, বরযাত্রী, বিয়ে সম্বন্ধে নানা রকম গুরুগম্ভীর মন্তব্য তারা সবাই মিলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করছে।

হঠাৎ সিঁড়ির গোড়ায় নিঃশব্দে উঠে এসে দাঁড়ালো রুনু তাদের সামনে: লাল শাড়ী পরা, সিঁদুরে মাথার চুলগুলো সব লালচে, মুখখানি থমথমে লাল, চোখ দুটোও লাল। অপরিচিতার মত লাগলো রুনুকে। ছেলেরা তারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

ভাঙ্গাগলায় রুনু বললে, • আমি চলে যাচ্ছি তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা•করতে এলুম, তার চোখ দুটো জলে ভরে এলো।

মিনটু তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে, অন্য ছেলেরা তখন নিজেদের চোখের জল গোপন করার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। মিনটুর মনে হলো, রুনু একরাত্রে কত সুন্দর হয়ে গেছে, এত ভাল তো সে দেখতে ছিলো না!

মুখে একটু ক্ষীণ-হাসি ফুটিয়ে বললে রুনু তার দিকে চেয়ে, বাবা বলেছেন আমি আটদিন পরেই ফিরে আসবো, তোমরা ভেব না।

রনুর সান্ত্বনায় মিনটুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো, সে তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নিলে। কেউ কোন কথা বললে না সব চুপ চাপ।

রুনু চোখদুটো কাপড়ে মুছে, সকলের দিকে একবার চেয়ে, আস্তে আস্তে নেমে গেলো নিচে।

সানাইয়ের সুরে তখন পটদীপ শুরু হয়েছে।

ঘন ঘন শঙ্খধ্বনিতে ছেলেদের হুঁস হলো, বরবউ যাত্রা করে বেরোচ্ছে।

মিনটুর মনে পড়ে গেলো, রুনুকে দেবার জন্যে আচার, বাদাম-ভাজার পুটলী করা আছে, সেটাতো দেওয়া হলো না। সে আসছি বলে, ছুটে নেবে গেলো নিচে। সাজানো মোটরে বরবউ উঠে বসেছে, —আর উঠেছেন বরের একজন মামা, রুনুদের বাড়ির পুরোন ঝি।

গাড়ীর পা-দানির একটু তফাতে দাঁড়িয়ে মিত্তিরবাড়ির সমগ্র পরিবার। পুরুষদের মুখগুলো বেশি গম্ভীর, স্ত্রীলোকদের মুখ, অর্ধেক অঞ্চলাবৃত ও শব্দমুখর। বাড়ির ভাড়াটেরাও দুরে দাঁড়িয়ে।

মিনটু ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলো সামনে, তাকে দেখে রুনুর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

পা-দানিতে উঠে টপ করে আচারের পুঁটলিটা ফেলে দিলে রুনুর কোলে। চারটে চোখে ভাষা ফুটলো ; তাড়াতাড়ি সে পুঁটলিটা তুলে নিলে হাতে। রুনু লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো যখন দেখতে পেলে গাড়ির মধ্যে সবাই আচারের পুঁটলিটার দিকে চেয়ে আছে। মিনটু যেমন ভাবে ছুটে এসেছিল সেইরকম ভাবেই ফিরে যাচ্ছিলো, তাকে আটক করে মেজগিন্নি জিজ্ঞেস করলেন, কি দিলি রে মিনটু রুনুকে ? তাঁকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বললে মিনটু, কিছু না আচার।

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। মিত্তিরবাড়িও নিস্তব্ধ নিঝুম। ছাদের পশ্চিমকোণে দাঁড়িয়ে মিনটু, আল্‌সেতে ভর দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে।

আজ তার একলা থাকতে ভাল লাগছে, তাই অন্য ছেলেরা চলে যাবার পর সে একাই রয়ে গেল। ক্ষীণ জ্যোৎস্নার আলোতে আকাশে কালমেঘের টুক্‌রোগুলো হাতির মত দুলে দুলে চলেছে। গঙ্গার ওপারে, আলোর মালা ; একটা নৌকো পাল তুলে চলেছে, তার ছোটো ছাউনির মধ্যে আলো মিট মিট করছে। গঙ্গার ধারে ঝাপালো গাছগুলোর ফাঁকে একটা লাল আলো দপ্‌ দপ্‌ করছে।

মিনটুর মনে পড়ে রুনুর সিঁদুর ভর্তি চুল, থমথমে মুখ, আর চক্‌চকে দুফোঁটা জল। কোথায় চলে গেল, একটা অপরিচিত বাড়িতে। বাপ মা, ভাইবোন ছেড়ে। মেয়েরা সব পারে।

কখন ললিতা এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে খেয়াল ছিল না। ললিতা তার কাঁধে একটা হাত দিয়ে, ডাকলে, মিনটু। ফিরে তাকালো মিনটু তার দিকে।

তোমার মন কেমন করছে না মিনটু ? নিজের মুখটা দু-হাতের

মধ্যে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো সে, তাকে কাছে টেনে সান্ত্বনার সুরে বললে ললিতা, ছিঃ কাঁদতে নেই। নিজেকে সংযত করার নিস্ফল চেষ্টায় ফুলে ফুলে উঠলো মিনটু। তাকে জড়িয়ে ধরে গায়ে হাত বোলাতে লাগলো ললিতা। মিনটু তার মুখটা ললিতার বুকে চেপে ধরে যেন কতকটা শান্ত হলো। আকাশের টুকরো মেঘগুলো থেকে তখন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে শুরু করেছে। ললিতা তার মুখটা দু-হাতে তুলে ধরে বললে, নেবে চলো মিনটু বৃষ্টি এলো।

দ্বিতীয় সর্গ

॥ ১ ॥
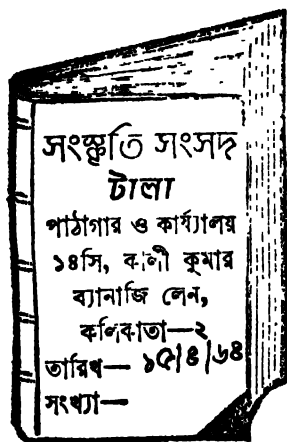
কৈশরের সীমান্তে এসে অমিতাভ, মানে মিনটু, হয়ে উঠেছে স্বল্পভাষী, কল্পনাপ্রবণ ও আদর্শবাদী।

বয়সের তুলনায় তার এই পরিবর্তন অনেকেরই চোখে অস্বাভাবিক ঠেকছে। এমন কি মৃণ্ময়ী দেবীও স্বামীকে এ সম্বন্ধে সজাগ করার চেষ্টা করেছিলেন এই বলে, মিনটু যেন আজকাল কি রকম হয়ে যাচ্ছে, প্রায়ই কোন কথা বলে না গুম হয়ে বসে থাকে, তা ছাড়া খেলাধুলা তো একেবারে ছেড়ে দিয়েছে! ছেলেটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখো।

উত্তরে তিনি বলেন, ওটা কিছু নয়, বয়স বাড়ার মুখে তাই।

অমিয়কান্তি মানে, অমি, সেদিন প্রায় রাগ করেই বললে, দেখ মিনটু তুই আর আমাদের ভালবাসিস না আগের মত। তুই যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছিস!

কোন উত্তর না দিয়ে মিনটু চুপ করে ছিল। তার মনে হয়েছিলো অমির কি ছেলে মানুষের মত খেলা, খেলা! তার চেয়ে অনেক বড় কাজ, আনন্দের কাজ, করার সুযোগ সে পেয়েছে। বলা নিষেধ নয়তো সে অমিকে বুঝিয়ে বলে দিতো।

দিনে দিনে সুজাতা দেবীর খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে অমিতাভ —আজকাল প্রায়ই সে সুজাতাদির ফরমাস মাফিক নানা কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ক'লকাতার অলিতে গলিতে। কাজেই খেলাধুলার সময় কই? সুজাতাদি তাকে বিশ্বাস করেন এই গর্বে তার মন ভরে ওঠে। ডকের থেকে গোপনে যে সব জিনিস আজকাল নিয়ে এসে দেয় সুজাতাদিকে সে সব জানলে, তার বয়সের ছেলেরা তো ভয়েই মরে যাবে, ভাবে অমিতাভ।

গভীর রাত্রে এক একদিন সে আর সুজাতাদি যখন বাড়ি থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে যায় কোন কাজে, পায়জামা, কোট আর পাগড়ী বাঁধা সুজাতাদির পাশে পাশে সে যখন হেঁটে চলে, জনমানবহীন নিদ্রিত ক'লকাতার রাস্তায় রাস্তায়, তখন তার কি যে ভাল লাগে, সে কথা সে কি করে বুঝাবে অমিকে। তার ইচ্ছে হয় অমিকেও এই কাজে সঙ্গে নিতে, কিন্তু সুজাতাদির নিষেধ; তিনি বল্লেন এখনও সময় হয়নি। দিনের পর দিন এ কাজ তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে; ভবিষ্যতের কত ছবিই না সে কল্পনায় দেখতে পায়।

নিজের ঘরটার মধ্যে টেবিলের সামনে বই নিয়ে বসে অমিতাভ, বার বার তাকাচ্ছে সুজাতা দেবীর দরজার দিকে একটা অতিপরিচিত ইঙ্গিতের আশায়। আজ কদিন হলো সে সুজাতাদির ডাক পায়নি! তার মনে হচ্ছে হয় সে অজান্তে কোন অপরাধ করে ফেলেছে, নয় সুজাতাদির কোন বিপদ ঘটেছে!

হারাধনবাবু বাজার করতে বেরিয়ে যেতেই, সে উঠে পড়লো পড়া ছেড়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে সুজাতাদির দরজার গোড়ায় গেল। দরজাটায় তালা লাগানো দেখে তার মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো—তবে কি এ-কদিন সুজাতাদি ফেরেন নি? আর তো সে বসে থাকতে পারে না! সুজাতাদির খবর আজ তাকে যোগাড় করতেই হবে। তার জানা যতগুলো আড্ডা আছে সবগুলো খোঁজ করে আসবে। সম্ভব অসম্ভব নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে সদর দরজা ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

প্রথম স্থানটিতে যেতেই তার সঙ্গে দেখা হলো অমলদার। তিনি ইসারায় তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন গলির মোড়ে। চারদিক চেয়ে চুপিচুপি বললেন, এখানে আর এসো না, পুলিশে নজর রেখেছে—আর কোথাও না গিয়ে বাড়ি যাও। ব্যাকুল ভাবে বললে

অমিতাভ, সুজাতাদি ? তাঁর সঙ্গে আমার যে একবার দেখা করতেই হবে !

তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হওয়া অসম্ভব, তাঁকে গোপনে থাকতে হবে !

কতদিন পরে দেখা হবে অমলদা ?

কি করে বলবো ! তুমি এখন যাও অমিতাভ, সাবধানে থাকবে ! তাকে ঠেলা দিয়ে বললেন তিনি ।

টলতে টলতে অমিতাভ এগিয়ে গেলো বড় রাস্তা দিয়ে । সামনে পার্কের মধ্যে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লো সে ।

ছায়াচিত্রের মত কতকগুলো ছবি তাব চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো । সুজাতাদি যদি ধরা পড়েন, যদি সুজিতবাবুব মত দ্বীপান্তর হয় । যদি ফাঁসি হয় ! আব ভাবতে পারলো না সে, ছটফট করে উঠে বেরিয়ে গেল পার্ক থেকে । সব যেন তার কাছে নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে, কে তাকে দেশসেবার সুযোগ করে দেবে ? কে তাকে উপদেশ দেবে ? কে তাকে বলে দেবে কোন পথে যাবে ।

হঠাৎ সুন্দর ব্যাণ্ডের শব্দ কানে এলো । জনতার ভেতরে ভেতরে গলে এসে দাঁড়ালো বড় রাস্তাব মোড়ে । নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না । বাঙ্গালীপল্টনের মত তারই বয়সের কত ছেলে পা মিলিয়ে চলেছে । কংগ্রেস-পতাকা নিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলেছে, সাইকেলে চলেছে, মাঝে মাঝে চিৎকার উঠছে, বন্দেমাতরম, স্বাধীন ভারত কী জয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকি জয় !

মনে পড়ে গেল, কাগজে পড়েছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আজ কলকাতায় শুরু হবে । উত্তেজনায় সে তুরু তুরু কাঁপতে লাগলো । এতো লোক দেশকে ভালবাসে ! শুধু সুজাতাদি নয় ।

সে দেখলে, মোটরের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন সেনাপতির পোশাকপরা একজন বলিষ্ঠ সুপুরুষ ; মুখে মৃদু হাসি, চোখে নির্ভিক দৃষ্টি। বাঙ্গালীপল্টনের অধিনায়ক ; নাই বা রইলো অস্ত্র, মানুষতো আছে। তারপর এল ঘোড়ার সার—গাড়ী টানছে। তাই তো—গাড়ীর ওপর বসে বৃদ্ধ নেতা, খবরের কাগজের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিলে মিনটু, মতিলাল নেহরু !

রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেতে অমিতাভ বাড়ির দিকে পা বাড়ালে।

হারাধনবাবু কাগজ পড়ছেন, মৃণ্ময়ী দেবী পাশে বসে শুনছেন, অমিতাভ এসে ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখে বললেন হারাধনবাবু, তুই কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াস ?

এ কথার উত্তর না দিয়েই বললে অমিতাভ, বাবা আজ আমাকে কংগ্রেস দেখাতে নিয়ে চলো : এই মাত্র দেখে এলুম কি সুন্দর শোভাযাত্রা গেল মতিলাল নেহরুকে নিয়ে !

তুই সেখানে গিয়ে কি করবি ?

না আমি যাব ! আবদারের সুরে বললে।

আচ্ছা সে দেখা যাবে !

হারাধনবাবু আবার কাগজ পড়ায় মন দিলেন, অমিতাভ খুশি মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

দেশবন্ধু নগরের সামনে ট্রাম থেকে নামলো অমিতাভ হারাধন-বাবুর সঙ্গে। তার গায়ে খাকি খদ্দরের সার্ট আর হাপ্‌প্যাণ্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল। এ জায়গাটায় পুর্বেও একবার এসেছিলো কিন্তু তখন ছিল শুধু জঙ্গল। আজকে তার আলাউদ্দিনের প্রদীপের গল্প 'মনে প'ড়ে যাচ্ছে। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল আলোক স্তম্ভটার দিকে।

প্রদর্শনী দেখতে দেখতে যেন তৃপ্তি হচ্ছে না, সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলে, এখানে অনেকেই বাবাকে চেনে! কথায় কথায় তাঁরা বাবাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। একজন খুব রোগা লোক এসে বললেন, ওহে হারাধন, এবারে তুমুল কাণ্ড হবে! নেহরুর কোন আশা নেই, তাঁর রিপোর্ট পাশ হলে হয়!

তাই নাকি? বললেন হারাধনবাবু।

মনে তো হচ্ছে বাপ-বেটায় লড়াই চলবে, দেখা যাক, সুভাষও খুব গোঁ ধরেছে। কিন্তু এই নিয়ে একটা দলাদলি না হয়ে যায়! চিন্তিতভাবে বললেন হারাধনবাবু।

হাতের চেটো উল্‌টিয়ে বললেন ভদ্রলোকটি, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাশের রিপোর্ট পাশ হলে আমরা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবো, তারচেয়ে দলাদলি ভাল।

গাঢ়স্বরে হারাধনবাবু বললেন, না না ওটা ভুল, এখন দলাদলি করলে কোন লক্ষ্যতেই পৌঁছতে পারবো না!

সুভাষ কিন্তু মেনে নিতে রাজী নয়। দেখা যাক, চলো। গান্ধীবুড়ো আছেন, যদি কিছু ব্যবস্থা হয়ে যায়!

চিন্তিতভাবে এগিয়ে গেলেন হারাধনবাবু পেছনে পেছনে চললো অমিতাভ।

॥ ২ ॥
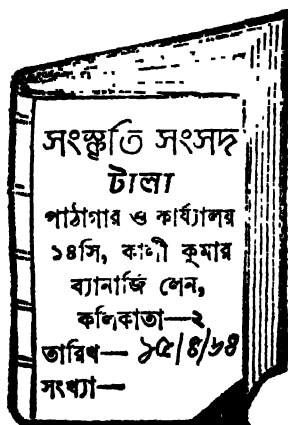
অমি ও অমি। অমিয়কান্তির দরজার গোড়ায় নিচু গলায় ডাকলো অমিতাভ।

অমিয়কান্তি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। চল নিচে চল। তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো অমিতাভ। উঠানের মাঝখানে এসে উৎসাহভরে বললে সে, চল একটা জিনিস দেখাবো!

কি?

এবারের কংগ্রেস।

বাবা যদি জানতে পারেন? ভয়ে ভয়ে বললে অমিয়কান্তি।

জানতে পারলে না হয় একটু বকুনি খাবি! কংগ্রেস তো আর রোজ হবে না।

মনে আগ্রহ পুরোদস্তুর থাকা সত্বেও ইতস্তত করছিলো অমিয়কান্তি। তার হাতটা জোর করে চেপে ধরে বললে অমিতাভ, বকুনি কি তুই একা খাবি আমাকে খেতে হবে না?

চল! আমার কিন্তু পয়সা নেই পকেটে।

কাল কিছু পয়সা মার কাছে বাগিয়েছি এতেই হয়ে যাবে, শুধুতো ট্রাম ভাড়া আর গেট ফি।

চল, কিন্তু আমার ভয় করছে!

তুই তো এত ভীতু ছিলিনা অমি! ভুরু কুঁচকিয়ে চাইল অমিতাভ তার দিকে। অমিয়কান্তি হেসে ফেললে।

খানিকটা হেঁটে তারা উঠলো ট্রামে। দুপুরবেলা ভিড় মোটেই নেই, আরামে বসে গল্প জুড়ে দিলে। অমিতাভ বলে চললো গতদিনের কংগ্রেস দেখার কথা, কতলোক, কত কাণ্ড, কত মেলা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

একটা জায়গায় দুটি লোক চড়া গলায় গল্প করতে করতে তাদের পাশের বেঞ্চিতে এসে বসলো। তাদের কথাগুলো কানে গেল অমিতাভর। একজন বললেন, বিশ্বাসঘাতক মশায় বিশ্বাসঘাতক! দুদুও খাবে তামাকও খাবে!

জহরলালও যে এরকম করবে কে জানত?

যা বলেছ! দেখলে না বুড়ো নিজের রিপোর্টটা পাশ করবার মতলবে কত ভয়ই না দেখালে।

প্রথম ভদ্রলোক বললেন একটু জোরের সঙ্গে, পুর্ণ স্বাধীনতার জন্যে একমাত্র বাংলাই লড়তে পারে আর সব বাজে।

তাদের কথাবার্তা শুনে ভাবতে লাগলো অমিতাভ, দেশ স্বাধীন করার মধ্যে এত দলাদলির কি থাকতে পারে? মিটিং প্রস্তাব পাশ নিয়ে কি-বা এসে যায়? সুজাতাদি ঠিকই বলতেন, আমরা কাজের চেয়ে কথাকেই ভালবাসি। তত্ত্ব নিয়েই ব্যতিব্যস্ত!

হ্যারিসন্ রোডের মোড়ে ট্রাম বদল করবার সময় অমিতাভ দেখলে ভদ্রলোকেরা তাদের পেছনেই আসছেন। সে বললে অমিয়কান্তিকে, চল সেকেণ্ড ক্লাশে উঠি লোকগুলো জ্বালিয়েছে।

প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অমিয়কান্তি বললে বিস্মিত কণ্ঠে, সত্যি মিনটু একটা ব্যাপার হয়েছে বটে!

একটু গর্বিতভাবে বললে অমিতাভ, তবে যে বড় আসতে চাস্নি? জানিস্ এতবড় মেলা কখনও হয়নি।

মনের আনন্দে তারা পাকের পর পাক দিতে লাগলো মেলাটায়।

বিশ্রাম নেবার জন্যে একজায়গায় দাঁড়াতে তাদের কানে এলো ইনক্লাব জিন্দাবাদ মজদুর কিসান জিন্দাবাদ। তারপর দারুণ গোলমাল।

শব্দ লক্ষ্য করে তারা এগিয়ে চললো। কংগ্রেস প্যাণ্ডেলের

কাছাকাছি দেখলে অসংখ্য মজদুর কি নিয়ে যেন হৈচৈ করছে আর স্বেচ্ছাসেবকেরা করছে লাঠি নিয়ে আস্ফালন। তারা আরো এগোতে গেল এমন সময় একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে তাদের বাধা দিয়ে বললে, ওদিকে যেওনা মারামারি হতে পারে, কুলীরা গোলমাল করছে। কাজেই দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো তারা। গোলমাল বাড়তে বাড়তে কমে এলো, প্যাণ্ডেলের ভেতর থেকে কারা যেন বেরিয়ে এসে শান্ত করলেন কুলীর দলকে। তারা সবাই আবার জয়ধ্বনি দিয়ে ফিরতে আরম্ভ করলো অমিতাভদেরই পাশ দিয়ে।

অমিতাভ আগ্রহে অধীর হয়ে সবায়ের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইতে লাগলো। মনে হলো ছোট বলে তাদের যেন সবাই অবজ্ঞা করছে।

ভিড়ের মধ্যে আঙুল দেখিয়ে অমিয়কান্তি চিৎকার করে উঠলো, মিনটু, আমাদের ভাড়াটে সুরেন সিংহ ওই যে!

তাকে দেখে প্রাণপণ চিৎকারে হাঁকলে অমিতাভ, সুরেনদা ও সুরেনদা!

ভিড়ের মধ্যেদিয়ে সুরেনের চোখ পড়লো তাদের ওপর, সে এগিয়ে এলো সেই দিকে।

সুরেন সিংহের কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে, পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারাটা উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে, ঠোঁটে লেগে আছে একটা ক্ষীণ অদ্ভুত হাসি। তার হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলে অমিতাভ, কি হলো সুরেনদা এত গোলমাল?

উত্তেজিতকণ্ঠেই বললে সুরেন, আর বলো কেন ভাই! এরা দেশ স্বাধীন করবেন, আমাদের বাদ দিয়ে! আমাদের ভয় দেখায়! হাজার হাজার কুলী এক মিনিটে লোপাট করে দিতো সব! পোশাক পরে সেপাইগিরি ফলাচ্ছেন, ভাগ্যে আমরা ছিলুম নয়তো দেখিয়ে দিতো।

সুরেন সিংহের মুখের দিকে চেয়ে ভয় হতে লাগলো অমিতাভর, তার মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

আমরা তোমার সঙ্গে বাড়ি যাবো সুরেনদা, অমিয়কান্তি বললে তার দিকে চেয়ে।

চলো না আমিও বাড়ি যাচ্ছি। দুজনকে দু-ধারে ধরে সুরেন ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললো।

ফেরার পথে একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে থেমে বললে সুরেন, এসো ভেতরে আমি একটু কাজ সেরে যাই। তার পেছনে পেছনে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো দুজনে।

অল্পপরিসর একটা ঘর। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার আর কতগুলো ছবি টাঙ্গানো, লাল শালুতে কাস্তে হাতুড়ি আঁকা একটা পতাকা ঝুলছে সামনে। চাটাইয়ের ওপর বসে আছেন তিনটি লোক: একজন মজুর গোছের, দোহারা চেহারা, নাক চেপটা মুখে বসন্তের দাগ।

একজন রোগা, চোখগুলো বসা, লম্বা নাক, চোখে আল্‌গা চশমা, চিবুকটা যেন একটু বেশি এগিয়ে এসেছে।

আর একজন পাতলা বেঁটে খাটো লোক তারও চোখে চশমা, মুখে কোন জোলুস নেই আছে সরল প্রশান্ত গাম্ভীর্য। ময়লা প্যাণ্ট কোর্ট পরা আর লাল টাই বাঁধা। তাঁকে একটা সেলাম করে বললে সুরেন, কমরেড শুনেছেন ব্যাপারটা?

শুনেছি। তুমি একবার ওঘরে যাও মুখার্জি খুঁজছিল, সংযত কণ্ঠে বললেন তিনি।

অমিতাভ ঘরের চারিদিক দেখতে লাগলো। তাদের দিকে সবাই একবার আপাদমস্তক চেয়ে নিয়ে যে যার কাজে মন দিলে।

সে ভাবতে লাগলো,—এরা কারা, এদের আবার কি কাজ!

সুরেনের মোটে বেশি দেরী হয়নি ফিরতে, কিন্তু এইটুকু সময়েই অমিয়কান্তি যেন হাঁপিয়ে উঠছিলো। সুরেন আসতেই তাকে বললে, চলো সুরেনদা বাড়ি চলো?

চলো, বললে সুরেন।

॥ ৩ ॥

ছাতের এককোণে বসে অমিতাভ পড়ছে, ইন্‌ডিয়া ইন্‌ বণ্ডেজ।

মৃণ্ময়ী দেবী ডাকলেন,—মিনটু।

নিচে, বইটা যথাস্থানে রেখে গিয়ে দাঁড়ালো মায়ের সামনে।

মৃণ্ময়ী দেবী বললেন, ললিতের মার অসুখটা নাকি বাড়াবাড়ি, যা দিকি একবার ছুটে খবরটা নিয়ে আয়।

একতলায় নেমে উঠান পেরিয়ে সোজা ললিতদের ঘরে ঢুকে পড়লো অমিতাভ। তাকে দেখে বললেন ব্রজবিহারীবাবু, কি খবর মিনটু ?

মাসিমা কেমন আছেন, মা জানতে চাইলেন।

বেশ ভাল মনে হচ্ছে না! আজ ঘোরে পড়ে আছে, মাকে বলো গে। অমিতাভ ফিরতে যাচ্ছিল, ললিত এসে পড়াতে একটু অপেক্ষা করলে।

ললিত কাছে এসে বললে—তোর ইংরেজী নোটটা একবার দিবি পড়ে নেবো ?

চল এখুনি নিয়ে আসবি। দুজনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যেতে যেতে ললিত বললে, জানিস মিনটু, মা বোধহয় আর বাঁচবে না।

তার গলার স্বরে চমকে বললে অমিতাভ সান্ত্বনার সুরে, ওকথা বলিসনি, নিশ্চয় সেরে উঠবেন।

সেরে হয়তো উঠতেন ভাই, কিন্তু বাবা যে ওষুধ কিনে দিতে পারছেন না। জানিস তো এ রাজার রোগ, আমাদের মত গরীবের ঘরে কি করে সামলাবে!

অমিতাভ ললিতের কাঁধে হাত রেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, তার চোখের সামনে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো, এইমাত্র পড়া বইটার একটা পরিচ্ছেদ।

ললিতকে পড়ার ঘরে বসিয়ে, মাকে গিয়ে সব কথা সে বললে। মৃণ্ময়ী দেবী একটা দশটাকার নোট তার হাতে দিয়ে বললেন, এটা ললিতকে দাও তার বাবাকে দেবার জন্যে।

ইংরেজী নোটবই আর টাকাটা দেবার সময় অমিতাভ বললে ললিতকে, টাকাটা তোর বাবাকে দিস মা দিয়েছেন।

ভীত ত্রস্ত কণ্ঠে, নোটটা ফেরৎ দিয়ে বললে ললিত, আমি পারবো না ভাই! তুই জানিস্ না বাবা এতে ভীষণ রেগে যাবেন, পারিস তো তুই নিজে গিয়ে দিয়ে আয়। কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমিতাভ ভাবছিলো কি করবে,—মৃণ্ময়ী দেবী ভেতর থেকে বললেন, মিনটু দিয়ে কাজ নেই ফেরৎ দে। মাকে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে অমিতাভ বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। সে হেঁটে চললো অনির্দিষ্টভাবে।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর একটা মোড়ের মাথায় অমিতাভ দম নেবার জন্যে দাঁড়ালো, ক্লান্তিতে পা দুটো ভারী হয়ে উঠেছে।

কি হে মিনটু এখানে দাঁড়িয়ে?

সুরেন সিংহের স্বর কানে এলো, ফিরে তাকিয়ে দেখলে তিনি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এই এমনি, হাঁটতে হাঁটতে একটু দাঁড়ালুম, বললে অমিতাভ।

কোন কাজে নাকি?

না এমনি বেড়াচ্ছি।

তবে চলো না আমার সঙ্গে এক জায়গায় বেড়িয়ে আসবে।

বেশ চলুন। যেন একটু খুশি হয়েই বললে অমিতাভ।

কলিকাতার প্রাসাদোপম অট্টালিকার অন্তরালে যে সব নোংরা কদর্য খোলার বস্তিগুলো শহরের বুকে কালশিরার মত ছড়িয়ে তারই একটা সংকীর্ণ গলির মুখে সুরেন ঢুকে পড়লো। অন্ধকার

গলিটার মধ্যে নোংরা নেংটো ছেলেরদল দুর্গন্ধপূর্ণ নালার ধারে পরমানন্দে খেলছে। রাস্তার ওপরেই ছড়ানো আবর্জনা স্তূপের পাশ কাটিয়ে তাদের এগোতে হলো। খানিকটা দূরে, রাস্তায় খাটিয়া পেতে একজন লোক শুয়ে ধুঁকছে; তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে একটি মেয়ে: শতছিন্ন কাপড়খানায় নিকষ কাল পাথরের মত দেহটার খানিকটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ভীরু দৃষ্টিতে তাকালো দুজনের দিকে; অমিতাভ জিজ্ঞেস করলে, লোকটির কি হয়েছে সুরেনদা?

যক্ষা! বড় শক্ত অসুখ, শুধু সেবার জোরে টিকে আছে, ওরা বড় কষ্টে পড়েছে ভাই।

কিন্তু রাস্তায় শুয়ে আছে কেন? বিস্মিত কণ্ঠে বললে অমিতাভ।

ওদের ঘরে তো জানালা নেই, অথচ ডাক্তার বলেছে আলো বাতাসে রোগীকে রাখতে হবে, কাজেই......থেমে গেল সুরেন।

একটা জায়গায় একটি পুরুষ, মেয়ে সেজে অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান গাইছে, তাকে ঘিরে কতকগুলি লোক হল্লা করছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় ধেনো মদের উৎকট গন্ধ অমিতাভর নাকে এলো, সে বললে বিরক্তভাবে, এরা এতো গরীব কিন্তু মদ খেতে তো ছাড়ে না সুরেনদা।

জীবনে ওদের কোন স্থায়ী আনন্দ নেই বলেই তো এই অস্থায়ী আনন্দ-লাভের চেষ্টা। একটু মুচকি হেসে বললে সুরেন।

অমিতাভ তার কথাটা ভাল বুঝতে না পেরে চুপ করলো।

ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজে পড়া এইতো প্রফিট-এর নগ্ন রূপ! এর জন্যে সে শুধু বিদেশী-শাসন ছাড়া আর কোন কিছুকেই দায়ী করতে পারলে না, উন্মত্তের মত একটা নিঃশ্বাস ছাড়লে অমিতাভ।

সুরেনের সঙ্গে সে একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। সেখানে দেখলে, ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর অতিমলিন ট্রাউজার, ও সার্টপরা একজন ইংরেজ বসে। মুখের রং ঝল্‌সানো তামাটে, একটা ময়লা

কলাইয়ের বাটির চায়ে ডুবিয়ে রুটি খাচ্ছেন, আর কথা বলছেন পাশে বসা দু তিনটি লোকের সঙ্গে।

এখানেও ইংরেজ! শোবার ঘরে সাপ দেখার মতই চম্‌কে উঠলো অমিতাভ। নিশ্চয় স্প্যাই, কিংবা দালাল!

সুরেন তার কানে কানে বললে, ইনি আমাদের সংগঠনের কাজে সাহায্য করবার জন্যে বিলেত থেকে এসেছেন,—খাঁটি ইংরেজ! সারাদিন বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে এসে এখন ওঁর ডিনার সারছেন!

একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠলো অমিতাভর ঠোঁটে। সকাল থেকে ইংরেজের ওপর যত বিদ্বেষ আর ক্রোধ জমা হয়ে উঠেছে সব বুঝি ফেটে বেরোতে চায়। চাপা গলায় সে বললে, সংগঠন না ছাই! ও নিশ্চয় অন্য মতলবে এসেছে, সাহায্য করার নামে সর্বনাশ করে যাবে!

তার একটা হাত চেপে ধরে বললে সুরেন, বেরিয়ে চলো মিনটু এখান থেকে। তার গলার আওয়াজটা অপরিচিত ঠেকলো অমিতাভর, সে ত্বরিতপদে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় এসে বললে সুরেন দৃঢ়কণ্ঠে, যা জানো না সে সম্বন্ধে কথা বলো কেন? কতবড় শ্রমিক-দরদীর অবজ্ঞা তুমি করলে তা কি বোঝ?

তার কথায় ফেটে পড়লো অমিতাভ,—দরদী না ছাই! কেবল ভণ্ডামি, ভারতবর্ষের মুখোস পরা শত্রু।

বাঘের মত চোখ দুটো জ্বলে উঠলো সুরেনের, বুকের পেশীগুলো ফুলে উঠলো ঘন নিঃশ্বাসের চাপে। সে অমিতাভর দুটো হাত ধরে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে বললে, চুপ করো মিনটু!

এক ঝটকায় হাতদুটো ছাড়িয়ে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে অমিতাভ, কোনদিন চুপ করবো না! আমাদের যারা সর্বনাশ করেছে তাদের ঘৃণা করতে কোনদিন ভয় পাবো না। সে সুরেনের দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে চেয়ে হন্ হন্ করে ফিরে গেল, যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা দিয়ে।

॥ ৪ ॥

ধূসর কুয়াশাচ্ছন্ন পৌষের প্রভাত। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মত মিত্তির-বাড়িটা শীতের জড়তায় নিঃশব্দ হয়ে আছে। শুধু চড়ুই, কেলেগোলা মহলের সাড়াতে তার প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দন মেলে।

হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে বাড়ির সমস্ত বাসিন্দা সজাগ হয়ে উঠলো। বুড়ো বাড়িটার ফাটলে ফাটলে যেন বিবর্ধিত হলো সেই করুণ ক্রন্দন। রুদ্ধনিঃশ্বাসে সকলে ক্রন্দনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করলে।

অমিতাভ পায়চারি বন্ধ করে কান পাতলো: একি অমিদের বাড়িতে সবাই যেন কেঁদে উঠলো? ছুটে নেমে গেলো সে অমিদের দালানের দিকে। সেখানে যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো, বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগলো তার মানে বুঝতে।

মরণ ক্রন্দনে কেউ মাথা ঠুকছেন মাটিতে, কেউ আছাড় খাচ্ছেন; রুনুর নাম তাঁদের মুখে শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলো বুকটা, তবে কি রুনুরই কিছু হলো?

ছোটগিন্নি তাকে দেখে জোরে জোরে বুক চাপড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, মুখে তাঁর শুধু, রুনুর আমার কি হলো!

বড়গিন্নির ক্রন্দনের ভাষায় সে বুঝতে পারলে, রুনু-বিধবা হয়েছে! সে দালানের একটা রেলিং চেপে ধরলে, তারপর কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ইতিমধ্যে নিচে জমায়েৎ বাড়ির অন্য বাসিন্দারা তাকে দেখে সমস্বরে জিজ্ঞেস করলে, কি হলো?

উত্তর দেবার সামর্থ্য কই তার? জবাব না দিয়েই সে টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে।

তার পরিচিত খালের নির্জন স্থানটায় হাতের ওপর মুখ গুঁজে সে

যখন শুয়ে পড়লো তখন সামনের রাস্তা দিয়ে একদল লোক একটি মৃত দেহ নিয়ে চলেছে—বলহরি হরিবোল।

বড় আদরের রুনু। তার জীবন এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে? সমস্ত শক্তি দিয়েও সে নিজেকে সামলাতে পারছে না।

• •

অপরাহ্ণ পর্যন্ত অমিতাভকে ফিরতে না দেখে মৃণ্ময়ী দেবী রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন: সকাল থেকে কোথায় যে গেল। একজন লোকও তেমন পাচ্ছেন না যাকে দিয়ে খোঁজ করবেন। মিত্তিরবাড়ির দালান থেকে তখনও মাঝে মাঝে গোঙানির শব্দ আসছে। তিনি ভাবলেন: আহা এতটুকু কচি মেয়ে পাঁচটা বছরও পেরোল না। হতভাগীর এরি মধ্যে সারাজীবনের সাধআহ্লাদ শেষ হয়ে গেলো।

অমিতাভ যখন বাড়ি ফিরলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। তাকে দেখে প্রচণ্ড ধমকের সুরে বললেন, হতভাগা ছেলে কোথায়... তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই মৃণ্ময়ী দেবীর কথায় ছেদ পড়ে গেল। রক্তজবার মত চোখদুটোর কোলে কে যেন এক পোঁচ কালি লেপে দিয়েছে। বালি ভর্তি চুলগুলো জটার মত কপালময় ছড়িয়ে।

মাকে দুহাতে জড়িয়ে-ধরে অবোধ্য কণ্ঠে কি যেন বলে উঠলো অমিতাভ। তার কথার মানে না বুঝতে পেরে মৃণ্ময়ী দেবী ভাবলেন: আহা খেলার সাথী তাই মনে বড় আঘাত পেয়েছে। তিরস্কারের ভাষা ভুলে তাঁকে সান্ত্বনার ভাষা খুঁজতে হলো।

॥ ৫ ॥

রজনীর ঘন তমিস্রা ভেদ করে পূর্বদিগন্তে নবারুণের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।

মোক্ষ, স্বার্থ, শোধন, অভিলাষুক নর-নারী চলেছে গঙ্গার ঘাটের দিকে। রামলীলার সুরে, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম কীর্তনে, খড়মের শব্দে, কলে জলপড়া আর মুখ ধোয়ার আওয়াজে, মাঝে মাঝে ময়লাফেলা গাড়ীর ঘড়ঘড়ানির মধ্যে দিয়েই মহানগরীর মৌলিক প্রভাত রক্তাক্ত উষার কোলে নবজন্ম লাভ করছে।

অমিতাভ ও অমিয়কান্তি বেরিয়েছে প্রাতঃভ্রমণে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারা গঙ্গার দিকে।

চিররহস্যময়ী মাতৃস্বরূপা. অনাদিকালের প্রাচীনা ধাতৃদেবী। কত মহানগরীর উত্থান-পতন, কত মহাসভ্যতার উন্মেষ ও বিলোপ, কত গৌরব গাঁথা, কত সুখস্মৃতি, কত কলঙ্কিত কাহিনী অমিতাভর মনে পড়ে যায় ওই স্রোতের দিকে চাইলে।

অমিয়কান্তি বললে, জানিস মিনটু কাল বাড়িতে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেছে!

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো অমিতাভ।

ছোটকাকার সঙ্গে বাবার ঝগড়া।

কি নিয়ে?

রুনুর শ্বশুরবাড়ি থাকা নিয়ে।

কেন?

একটু থেমে বললে অমিয়কান্তি, বাবার মতে রুনুকে আর শ্বশুর-বাড়িতে রাখা চলে না, ওরা নাকি লোক খারাপ, রুনুকে মারধোরও করে। বিস্ফারিত নেত্রে চাইল অমিতাভ তার মুখের দিকে, সে

বলে চললো, নবনী মারা যাবার পর থেকেই অত্যাচারের মাত্রাটা বেড়ে চলেছে—তাছাড়া বাবার ইচ্ছে রুনু লেখাপড়া নিয়ে ভুলে থাকুক, তবু একটা অবলম্বন হবে।

তারপর ?

ছোটকাকা তাতে রাজি নয়। তিনি বলেন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখে কি হবে, তারচেয়ে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করুক।

রাগে চিৎকার করে উঠলো অমিতাভ, তোর ছোটকাকা একটা পাষণ্ড অমি!

যা বলেছিস। বাবা কিন্তু কাল খুব শক্ত হয়ে গেছলেন, তিনি বলে দিলেন, রুনুকে আমি শিবকালীর কাছে পাঠাবো মেদিনীপুরে, সেখানে ও পড়াশুনা করবে।

ছোটকাকা ভবিষ্যতে আবার গোলমাল করবেন না ?

না, না, শক্তর কাছে ছোটকাকার বুজরুকি চলে না, তা ছাড়া মেজকাকাকে বড় ভয় করেন, বড়লোক বলে। কি একটা বলতে যাচ্ছিলো অমিতাভ, এমন সময় কাগজ ফেরিওয়ালার চিৎকারে দুজনেই ফিরে চাইল রাস্তার দিকে।

হৈ হৈ কাণ্ড, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, চাঞ্চল্যকর সংবাদ, দুজন ইংরাজ সমেত সারা ভারতবর্ষে একত্রিশজন গ্রেপ্তার। হৈ হৈ কাণ্ড!

দুজন ইংরেজ সমেত। চমকে উঠলো অমিতাভ।

উঠে দাঁড়িয়ে অমিয়কান্তি বললে, চল মিনটু বাড়ি গিয়ে কাগজটা পড়া যাক। অমিতাভ তখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। তাকে একটা ঠেলা দিয়ে আবার বললে অমিয়কান্তি, কিরে তুই ধ্যানস্থ হলি যে!

স্বপ্নোত্থিতের মত বললে অমিতাভ, চল।

দুজনেই পা চালিয়ে ফিরলো বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনে অমিতাভ ভাল করে লক্ষ্য করলে একবার সুরেন সিংহের তালাবন্ধ দরজাটার দিকে, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ি ঢুকলো।

॥ ৬ ॥

বৈঠকখানায় রামকালীবাবুর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা চলেছে।

রামকালীবাবু বেশ উত্তেজিত, খাদপঞ্চমে তিনি বলে চলেছেন, দেখ ব্রজেন তোমাকে আমি প্রথমেই বলেছিলুম মেয়েটার বিয়ে অন্তত ঘরটা দেখে দাও, তা তুমি কান দিলে না।

সবই গোপালের হাতে। আমরা কতটুকু করতে পারি। দার্শনিক আমেজে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

ও সব কথা রাখো, আজই গিয়ে নিয়ে আসতে হবে রুনুকে।

দাদা এখনও ভেবে দেখ। ইহকাল তো গেল মেয়েটার, পরকালের কিছু কাজ করুক শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করে।

রামকালীবাবুর মুখের চেহারা কঠিন হয়ে উঠলো, কড়াভাবে বললেন তিনি, চুলোয় যাক্ পরকাল। আমি বলছি রুনুকে নিয়ে আসতেই হবে, নয়তো আমি আজই শিবু, জ্ঞানকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখবো।

নির্লিপ্তভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, যা পারো কর তোমরা, আমার আর ভাল লাগছে না, আমি এরপর বৃন্দাবন কিংবা পুরীতে গিয়ে কিছুদিন বাস করবো, প্রভুর সেবায় যদি সব ভুলতে পারি।

রামকালীবাবু তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন : ব্রজেন্দ্রনাথের কথাগুলো আজ যেন অতি-অভিনয়ের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। তাঁর চোখে ভেসে উঠলো ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনচিত্র : অতি তুচ্ছ ব্যাপারে মাঝে মাঝে অতি কুৎসিৎ স্বার্থসচেতনতা।

ব্রজেন্দ্রনাথের বৃন্দাবন-যাত্রা তিনি শুনে আসছেন গত দশবৎসর যাবৎ। সংসারের শেকড় উপড়ে আসা-তো দূরের কথা, ভিৎ ফুঁড়ে প্রবেশ করার চেষ্টায় সেটাতে ফাটল ধরতে বসেছে।

মা গো মা ! হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে তুজনেই চমকে চাইলেন দরজার দিকে।

টলতে টলতে ঘরে ঢুকলো রুনু : একবছরের মধ্যেই তার কল্পনাতীত পরিবর্তন লক্ষণীয় ;. ঝরনার মত চঞ্চলতা বালুচরে এসে লুপ্তপ্রায় ! বিশীর্ণ মুখ, শূন্য দৃষ্টি।

বিস্ময় কাটিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কি হয়েছে রুনু হঠাৎ......কোন কথা না বলে তাঁদের তুজনের দিকে চেয়ে রুনু পিঠের কাপড়টা সরিয়ে দিলে। দগদগে আঘাতের দাগ প্রকাশ হয়ে পড়লো।

এক চাপা আওয়াজ করে রামকালীবাবু কাছে গিয়ে দেখলেন, তারপর যেন গর্জন করে উঠলেন, ভজ্যা ! ভজা ! আমার লাঠি-গাছটা নিয়ে আয় ! নবীন মিত্তিরের রক্তের ধারা যেন টগবগ ফুটে উঠলো, কাঁপতে কাঁপতে তিনি তুহাতের মুঠো চেপে ধরলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন রুনুকে, তাঁর চোখ দিয়েও তু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

'ওপর থেকে নেমে এলেন গিন্নির দল, অমিয়কান্তি, অমিতাভ, আর ভজুয়া লাঠি হাতে।

রামকালীবাবু বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি আজ দেখে নেব ছোটলোকটাকে, মিত্তিরবাড়ির মেয়ের গায়ে হাত তোলা আমি ওদের জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবো।

দরজা দিয়ে এগোতে গেলেন তিনি, রুনু পথ আগলে দাঁড়ালো। সে মিনতিভরা কণ্ঠে বললে, না জ্যাঠাবাবু ওখানে যেও না। শুধু আমায় তোমাদের কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দাও। আমি পালিয়ে এসেছি, রামকালীবাবুর বুকে মুখ লুকিয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

আশ্বস্ত হয়ে বললেন তিনি, বেশ তাই হবে। সেই ব্যবস্থা

করছি, ব্রজেন, এখুনি যাও, থানায় একটা ডায়রী করে এসো। তারপর অন্য ব্যবস্থা আমি করবো।

ব্রজেন্দ্রনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রুনুর মাথায় একটা হাত রেখে রামকালীবাবু বললেন, ওপরে যাও মা। আর কেউ আমাদের কাছ ছাড়া করতে পারবে না। রুনু আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে দরজায় দাঁড়ানো মায়ের কাছে দাঁড়ালো। অমিতাভ দেখলে রুনুর পিঠে তখনও রক্ত বিন্দু বিন্দু ফুটে আছে। সে তাড়াতাড়ি অমিয়কান্তির হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

গভীর রাত্রে ব্যস্তভাবে মৃণ্ময়ী দেবী, অমিতাভ, হারাধনবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো ললিত নিজেদের অংশের দিকে।

অমিতাভর পাশে দাঁড়িয়ে বলছে সে, জানিস মিনটু, সকাল থেকেই মায়ের বুকের ব্যথাটা বেড়ে গেল। তখন থেকেই ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে আর অজ্ঞানের মত পড়ে আছেন।

সমস্ত বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে অমিতাভ। কোথাও আলো জ্বলছে না, বাইরের ঘরে ব্রজবিহারীবাবু বসে আছেন আড়ষ্ট ভাবে, তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন হারাধনবাবু। অন্য সবাই ভেতরের ঘরে প্রবেশ করলো।

শয্যায় শায়িত সুষমা। হলদে মুখের ওপর মুদ্রিত চোখের পাতার কাল চুলগুলোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিবিড় আরামে বুঝি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে যাচ্ছেন।

পায়ের কাছে মুখে আঁচল গুঁজে বসে মালতী। একটা টুলে বসে সুরেশ ডাক্তার। কোণের দিকে মিটমিটে হ্যারিকেন জ্বলছে।

সবাই যেন ক্ষীণ আলোছায়ার অন্তরালে, নির্মম মৃত্যুর লুকোচুরি প্রত্যক্ষ করলো।

মৃণ্ময়ী দেবী সুরেশ ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন মনে হচ্ছে ?

হাতের ইসারায় জানিয়ে দিলে কোন আশা নেই। খাটের পাশে গিয়ে তিনি কপালে হাত দিলেন সুষমার। সুষমার চোখ খুলে গেল, ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে বললেন খুব ধীরে, দিদি এসেছো ? তোমার সামনেই কাজটা সেরেনি, হয়তো আর সময় হবে না। মানে না বুঝে সবাই চেয়ে রইল তার দিকে। সুষমা হাতের ইসারায় ডাকলেন সুরেশকে : তারপর দম নিয়ে বললেন, অনেকদিন তোমায় বলবো করে বলা হয়নি—মালতীর ভার তুমি নাও বাবা।

জড়িত কণ্ঠে বললে সুরেশ, তার জন্যে কি—সে সব হবে এখন।

অপলক দৃষ্টিতে সুরেশের মুখের দিকে চেয়ে বললেন সুষমা, কথা দাও বাবা।

ইতস্তত করছে দেখে মৃণ্ময়ী দেবী তারদিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকালেন, সুরেশ একটা ঢোক গিলে বলে ফেললে, কথা দিলুম মাসিমা ।

আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারবো, ভগবান তোমার ভাল করবেন বাবা। আরামে চোখ বুজলেন সুষমা একবার, তারপর হাত বাড়িয়ে মালতীর একটা হাত নিয়ে সুরেশের কম্পিত হাতের ওপর রাখলেন. মালতীর ক্লান্ত চোখদুটো সুরেশের মুখের ওপর পড়লো, সুরেশের মুখখানা তখন যেন অতিমাত্রায় লাল হয়ে উঠেছে।

সুষমার ক্ষীণ দেহটা একবার জোরে দুলে উঠলো। মৃণ্ময়ী দেবী জিজ্ঞেস করলেন, কষ্ট হচ্ছে সুষমা ?

না দিদি শুধু যেন হাওয়া নেই মনে হচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন সুষমা। ক্রমে তাঁর হাঁপানি বেড়ে উঠলো, একটু হাওয়ার জন্যে কি আকুলতা। জল থেকে তোলা মাছের মত হা করেও বুঝি হওয়া মেলে না।

মৃণ্ময়ী দেবী বললেন সুরেশের দিকে চেয়ে, এ কষ্টের কি উপশম হয় না ?

অক্সিজেন দিতে পারলে কতকটা হতো কিন্তু। নিদারুণ ছটফট করে সুষমা বলে উঠলেন, ওঁকে ডেকে দাও। ওঁকে ডেকে দাও। মালতী গিয়ে ব্রজবিহারীবাবুকে ডেকে আনলে।

স্বামীকে দেখে সুষমার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো, কোন কথা বেরোল না, শুধু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু ফোঁটা জল। প্রচণ্ড কাসিতে সমস্ত শরীরটা দুলে নেতিয়ে পড়লো, এক ঝলক রক্ত গড়ালো কশ বেয়ে, তারপর স্পন্দনহীন, অসাড় ; শুধু তীক্ষ্ণ ছুরির মত একটুকরো বিদ্রূপের হাঁসি তখনও তাঁর ঠোঁটের কোণে লেগে আছে, অমিতাভর মনে হলো।

ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লো মালতী আর ললিত। ব্রজবিহারীবাবু বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মিত্তিরবাড়ির অন্য সমস্ত বাসিন্দারা এসে প্রচুর সহানুভূতি দেখালেন, কিন্তু শব নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব ঘটলো। একে অনাত্মীয়া তায় যক্ষ্মারোগী।

হারাধনবাবু অনেক কষ্টে পাড়া থেকে কয়েকজন যুবককে ধরে এনে দায় উদ্ধার করলেন।

॥ ৭ ॥

১৩৩৫, ১৩৩৬ সাল। জাতীয় জীবনের যুগসন্ধিক্ষণ।

রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ব্যষ্টি বা সমষ্টির জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদিন এক একটি গভীর রেখাপাত করে চলেছে।

অমিতাভর তরুণ মন তারই ছায়াপাতে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে : নব বসন্তের ইঙ্গিতের সাথে সাথে ঝরা পাতার সমারোহ উঠে পড়ে লেগেছে তাকে বাস্তবমুখী করে তোলার সাধনায়।

কলিকাতা কংগ্রেস, মিরাট ষড়যন্ত্র-মামলা, কমিউনিষ্ট-বিরোধী বিলের প্রতিবাদে পরিষদগৃহে ভকৎ সিং বটুকেশ্বরের বোমা নিক্ষেপ, লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা, যতীন দাসের নির্ভীক আত্মত্যাগ, কংগ্রেসের নরমপন্থী চরমপন্থীর শক্তিপরীক্ষা, জহরলালের বৈপ্লবিক বাণী—ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ ও জগৎব্যাপী দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সবগুলো ঘটনার মধ্যে দিয়ে সে যেন দেখতে পেলে,—একদিকে শৃঙ্খল ভারাক্রান্ত নিপীড়িত জাতীয় আত্মার ক্ষুব্ধ চকিত আত্মপ্রকাশ, অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রণয়িনী বারবণিতা, অর্থনৈতিক সংকটের লালাচঞ্চল দাম্ভিক পদক্ষেপে নিষ্পেষিত সমাজজীবনের মর্মান্তিক বোবাকান্নায় সচকিত সমাজপ্রাঙ্গন।

মিত্তিরবাড়ির জীর্ণ প্রাচীরের অন্তরালে তার লক্ষণ ক্রমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বাড়ির ভাড়া নিয়মিত আদায় না হওয়ায় রামকালীবাবু ও ব্রজেন্দ্রনাথের সংসারে টান ধরেছে। রামকালীবাবুকে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ও শিবকালীর কাছে সাহায্য নিতে হচ্ছে অনেক অনুরোধের পর ; ব্রজেন্দ্রনাথের খরচ কম, রুনুর সম্পূর্ণ ভার শিবকালীবাবু নেওয়ায়,

তাঁর কোন সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয় না, আটহাতি কাপড়টা একটু দেরীতে ধোপার বাড়ি যায়, এই যা।

দালাল নিবারণ জানা আজকাল প্রায়ই স্ত্রীর ওপর ক্ষোভ মেটায়।

বাঁ-দিকের কলতলা ঘেঁষে যে পরিবারটির বাস, তাঁদের আদর্শ পারিবারিক শান্তিতেও চিড় ধরেছে। বড় ভাইয়ের চাকরী গেছে ছাঁটাইয়ের দৌলতে, মেজ ভাইয়ের মাহিনা কমেছে আর ছোটভাই মনোহর, মাষ্টারী করছে একটা স্কুলে, যে টাকার রসিদ দেয় তার অর্দ্ধেক নিয়ে বাড়ি ফেরে। চেহারার চক্‌চকে ফিটফাটত্ব ম্যাড়-ম্যাড়ে হয়ে এসেছে।

ব্রজবিহারীবাবু স্ত্রীবিয়োগের পর থেকেই দুনিয়াকে কলা দেখাবার লোভে নেশা ধরেছেন। রোজগার যা হয় তার সবটাই প্রায় খরচ করে, যৎসামান্য মালতীর হাতে দিয়ে বলেন, এতে না কুলোয় সুরেশের কাছে নিও, আস্‌ছে মাসে শোধ দিয়ে দেব। সুরেশ আজকাল এ পরিবারের ভারকেন্দ্র। মালতীকে বিবাহ করা অপেক্ষা তার সান্নিধ্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, এবং সেই কারণেই আর্থিক উদারতা তার কাছে বিরোধহীন। মালতীকে তার ভাল লাগে, কিন্তু শুধু সেই পুঁজির জোরে বিবাহবন্ধন তার কাছে যুক্তিযুক্ত নয়। ললিত ছেলে ভাল না হলেও ছবি আঁকার গুণে কর্তৃপক্ষের কাছে ফ্রী-সিপ্ যোগাড করেছে এবং বন্ধুমহলে বই ধার করে কোন রকমে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

হারাধনবাবুর ছোট পরিবারে এখনও অশান্তির আঁচ লাগেনি তবে মৃণ্ময়ী দেবীর স্নেহভীরু মনে অমিতাভ সম্বন্ধে অজানা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই এ-নিয়ে তাঁর আলোচনা চলে, কিন্তু যখন দেখেন, পিতাপুত্রের মধ্যে এমন সব আলোচনা চলছে যা সন্তানকে বহির্মুখীন করার পক্ষে যথেষ্ট তখন তিনি হাল ছেড়ে

দেন ; কারণে অকারণে তাঁর অনুযোগের মাত্রা বেড়েই চলে। অমিতাভকে বেশিক্ষণ পড়তে দেখলেও তিনি বলেন, বই বন্ধ করে দিয়ে,—এত পড়তে হবে না, যা বেড়িয়ে আয়। তুই যেন কি হয়ে যাচ্ছিস। মায়ের মুখের দিকে সে হাসিভরা মুখে চায়, কিন্তু পরমুহূর্তেই হাসি মিলিয়ে যায় ; সে ভাবে মায়েদের এত স্নেহ কি ভাল ?

॥ ৮ ॥

ক্লাসের বেঞ্চিতে বসে অমিতাভ। প্রফেসর মুখার্জি পড়িয়ে চলেছেন ইংরাজি সাহিত্য : ছেলেদের মনোযোগের অভাব, উত্তেজনায় তারা চঞ্চল! বর্তমানের প্রতি দিনটা এমন সব ঐতিহাসিক ঘটনার গৌরবে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে যার সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া তরুণ ছাত্রদের পক্ষে অন্তত অসম্ভব!

অমিতাভর পাশের ছেলেটি একটা খবরের কাগজের ছবির দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে বললে, দেখ অমিতাভ গান্ধীজির ডাণ্ডী অভিযান। অমিতাভ প্রফেসরের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছবিটি দেখলে, পড়ে গেল মহাত্মা গান্ধীর উন-আশীজন সত্যাগ্রহী সহ লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশে ডাণ্ডী অভিযান। দেখলে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন একদল স্বাধীনতার সৈনিক। স্বতন্ত্রতায় দীপ্ত তাঁদের মুখশ্রী : সম্মুখে বক্রদেহ, দণ্ডধারী কটিবাস পরিহিত সেনাপতি চলেছেন, বীরোচিত পদক্ষেপে,—মুখে ক্ষমা ও মমতা মাখানো অটুট সংকল্প!

সে ভাবলে, এই তো ভারতের অভিনব যুদ্ধ ঘোষণা। পরাধীন জাতির নিঃশস্ত্র বিদ্রোহ! ত্যাগ, আত্মাহুতি ও মহৎ বীরত্বের জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত স্বাধীনতা সংগ্রাম।

তার মানসচক্ষে ফুটে উঠলো বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র, কোটী কোটী বীর সৈনিকের জয়গর্বিত পদক্ষেপ! ভারতের প্রান্ত গ্রামে, নগরে, রাজপথে, পল্লীপথে, প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণে নিঃশস্ত্র প্রতিরোধ!

সে ফিরে চাইল সহপাঠিদের দিকে। পড়াতে পড়াতে প্রফেসর মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছেন ছেলেদের গোলমালে। আজ তিনি কোন রকমে কর্তব্য শেষ করতে পারলেই বাঁচেন।

হঠাৎ বাইরে সমবেত জনতার চিৎকারে ক্লাসের ছেলেরা চমকে

কলেজের পাশের রাস্তা দিয়ে তখন হেঁকে চলেছে, বন্দে মাতরম্ ; স্বাধীন ভারত কি জয় ; মহাত্মা গান্ধীকি জয় ; প্রফেসরের সম্মতির অপেক্ষা না-রেখে হুড়মুড় করে সমস্ত ক্লাসের ছেলেরা বেরিয়ে গেল বারান্দায়। বারান্দার দিকে তাকিয়ে জনতা উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করলে, গোলামখানা বন্ধ হোক ! গোলামি মন লুপ্ত হোক !

ছেলেরা ছটফট করে উঠলো, একটা অস্ফুট গুঞ্জনে ভরে উঠলো কলেজ সীমানা।

অমিতাভর মনে চাবুকের মত এসে পড়লো, গোলামখানা বন্ধ হোক ! কলেজের চারিদিকে সে চাইলে। এই তো শুভ মুহূর্ত !

ক্লাস থেকে বই খাতা বগলে নিয়ে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ! কলেজের গেটের কাছে গিয়ে শেষবারের মত ফিরে তাকালো কলেজটার দিকে ; একটা ব্যথার চিড়িক লাগলো মনে ; সামলে নিয়ে সে এগিয়ে চললো।

কলেজ স্কোয়ারের ধারে সত্যাগ্রহী অফিসের সামনে এসে দেখলে, তার মত বহু ছেলে আগে এসে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে। নাম লিখিয়ে নির্দেশ শুনে বাড়ি ফিরে আসতে অমিতাভর বেশ একটু দেরী হলো !

॥ ৯ ॥

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের মেয়ে ললিতার বিবাহ উপলক্ষে মিত্তির বাড়ির বৈঠকখানা আবার জমে উঠেছে। সম্ভচুনকামকরা ঘরে শাদা ধপধপে ফরাশ পাতা, পুরানো আমলের আসবাব-পত্তর যতদূর সম্ভব মেজে ঘষে মর্যাদাদানের চেষ্টা হয়েছে।

রামকালীবাবুর শান্ত স্বর কিছু জলদে চলছে, গিন্নিদের তাড়া ও শাসন সভয়ে উপেক্ষা করে বৈঠকখানায় চার ভাই তাঁদের চিরাচরিত খোস গল্পে মশগুল। তাঁদের মতে বাড়ির ছেলেদের আদেশ, উপদেশ দেওয়া ছাড়া এখন কিছুই করণীয় নেই, কারণ সব ছেলেরাই প্রায় সাবালক হয়েছে, এই সব সামাজিক কাজে তাদের পটুত্ব অর্জন করা উচিত।

আজকের আলোচনা শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে রাজনীতিতে। সকালের কাগজ পড়ে মহাত্মার আইনঅমান্য আন্দোলন তাঁদের মনকে পেয়ে বসেছে। এ ব্যাপারের কেউ সপক্ষে, কেউ বিপক্ষে, কেউ নির্লিপ্ত।

ঘরের এককোণে একটি চেয়ারে বসে আছেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, বাকি তিনজন ফরাশের ওপর। ব্রজেন্দ্রনাথ একটু অন্যমনস্ক, রামকালী বাবু ও শিবকালীবাবু তর্কে মত্ত।

একটা তাকিয়া কোলে টেনে নিয়ে বললেন শিবকালীবাবু, তোমার ওই সরকারের সৎবুদ্ধির ওপর ভরসা করা মস্ত ভুল দাদা। তুমি বড়লাটকে লেখা গান্ধীজির চিঠিটা পড়ে দেখবে, কতবড় মহত্ব দেখিয়ে তিনি একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভবি ভোলবার নয়।

গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে বললেন রামকালীবাবু, সে যাই বল গান্ধীজির এবারের কাজটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্চে।

কেন ?

খুন করে তালগাছ কেটে কি স্বাধীনতা পাওয়া যায়, লড়াই করতে হবে। তা যখন সম্ভব নয় তখন সাহেবদের চটিয়ে লাভ কি, বরং অন্য উপায়ে সুবিধা আদায় করতে হবে।

আপোসের চেষ্টার কিং কিছু কসুর হয়েছে। কিন্তু কি সুবিধেটা হলো ?

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনেই বা কি হলো ? মাঝখান থেকে মোছলমানরা বাগিয়ে নিলে, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ কোণ থেকে বলে উঠলেন, কিছু যে হয়নি তা তুমি বলতে পারো না, তার ফলে স্বদেশী শিল্প বেড়ে গেছে, বিলেতী জিনিস নেহাৎ দায় না পড়লে কেউ কেনে না—তাছাড়া অনেক লোক দেশের উন্নতির কথা ভাবতে শিখেছে।

তা যদি বলো তবে সেটা 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' থেকে শুরু হয়েছে।

শুরু হয়েছিলো বটে, তবে ততো জোর হয়নি ; গান্ধীজির আন্দোলনের ফলেই দেশে স্বদেশী শিল্পের প্রসার বাড়ে।

শিবকালীবাবু বললেন একটু নড়ে চড়ে,—

দেখে নিও এবারের আন্দোলন আরো ব্যাপক হবে—ওই সামান্য খুনকরা ব্যাপারটা দেশের গরীব চাষীদের পক্ষে যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা তোমার আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু গান্ধীজির চোখ এড়ায়নি, তিনি ঠিক জায়গায় আঘাত দিয়েছেন, এর ওপর খাজনা বন্ধের আন্দোলন হলে তো কথাই নেই, দেশের অধিকাংশ চাষী যোগ না দিয়ে পারবে না—গতবারে শুধু মধ্যবিত্ত যোগ দিয়েছিল, এবারে চাষীরা যোগ দিলে আন্দোলনের জোর বাড়বে। তবে অবশ্য অহিংস থাকা চাই, নয়তো সব পণ্ড হয়ে যাবে।

একটু হেসে বললেন রামকালীবাবু—ওই খানেই তো গোল!

সামান্য একটু হিংসার আঁচ পেলেই অচল হয়ে যাবে আন্দোলন, সেরকম গণআন্দোলন অসম্ভব!

এ সম্বন্ধে গান্ধীজি ঠিকই করেন, কারণ সাধারণ-লোক নির্বোধের মত বাড়াবাড়ি করে বসলে, গান্ধীজি কেন' কেউই তাদের ফেরাতে পারবে না!—জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন জোর'গলায়।

বিরক্ত হয়ে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, কেন বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, নেমন্তন্নের ফর্দটা সেরে ফেললে তার চেয়ে কাজ হবে।

তাঁর কথায় কান না দিয়ে বললেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, দেখ মেজদা গান্ধীজির খদ্দরের বাতিকটা যদি না থাকতো তো ভাল হতো, দেশকে বড় করতে হলে যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজন, চরকায় দেশের দুঃখু ঘুচবে না।

শিবকালাবাবু দার্শনিক ভঙ্গীতে বক্তৃতার সুরে বললেন, ওটার মধ্যে যে কতবড় মঙ্গলময় সত্য লুকিয়ে আছে তা তুমি বুঝবে না জ্ঞান, তুমি তোমার ব্যবসা বুদ্ধি দিয়েই দেখছো!

যথা?—একটু ঠাট্টার সুরে বললেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ।

সমগ্র জগতের শান্তির ও মুক্তির জন্যে অমূল্য ভারতীয় ভাবধারা ওর মধ্যে প্রত্যক্ষ সত্য রূপে নিহিত রয়েছে, তোমাদের পাশ্চাত্য বিলাসী মন ও অর্থ বুঝবে না!

ভারত স্বাধীন হলে ও তত্ত্বকথা কেউ মনে রাখবে ভাব? গান্ধীজির বড় চেলারাই তখন যন্ত্র-আমদানির কাজে উঠে পড়ে লাগবেন। স্বাধীনতা বড় প্রশ্ন,তাই আজ ওপ্রশ্ন ধামাচাপা পড়েছে!

হতাশভাবে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন শিবকালীবাবু, ওই তো, ওইখানেই আমরা ভুল করি—গান্ধীজিকে বুঝতে হলে তাঁর সমস্ত জড়িয়ে বুঝতে হবে নয়তো তাঁর কাজেরও হদিস পাব না, সিদ্ধিলাভও সম্ভব নয়!

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, থাক! তর্ক রেখে এখন একটা কাজের কথা জিগ্যেস করি,

জামাইকে একটা মোটর কিনে দিতে হবে কোন মেকারের দি বলতো?

ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন একটু আরাম পেয়ে, ভাল অবস্থায় একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ী কিনলেই তো হয় মিছিমিছি নতুন গাড়াই—

তোমার যেমন বুদ্ধি ব্রজ! একে ছেলে সরকারী চাকুরে তায় সৌখীন, নূতন গাড়ী না দিলে মন উঠবে কেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ভাল গাড়ীই কিনে দাও—বললেন রামকালীবাবু তাড়াতাড়ি।

শিবকালীবাবু দাদার হাত থেকে গড়গড়ার নলটা নিয়ে টানতে লাগলেন। কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটা নিস্তব্ধ হলো।

বেলা প্রায় একটা হয়ে গেছে, তবু কর্তাদের ওঠবার লক্ষণ না দেখে চাকর মারফৎ বড়গিন্নির পরোয়ানা হাজির হলো; সবাই সসব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ঘরে এসে ঢুকলো ললিত। তার হাতে একটা কাগজের মোড়ক। তাকে দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, কিরে ললিত ভাড়া এনেছিস্?

মোড়কটা সামনে রেখে বললে ললিত, এখন একমাসের নিন, বাকীটা পরে নেবেন।

রেগে বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ, তার মানে?

ক মাসের ভাড়া বাকী আছে হে ব্রজবিহারীর? ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন রামকালীবাবু।

তিন তিন মাসের। এ সব চালাকি চলবে না, বাবাকে বলবি ভাড়া দিতে না পারলে উঠে যেতে। বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ কড়াভাবে। ললিত মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

ললিতের মুখের দিকে চেয়ে রামকালীবাবু বললেন নরমগলায়, ললিত, বাবাকে বলো অন্তত দুমাসের একসঙ্গে দিতে, আমাদেরও খরচাপাতি আছে এমাসে।

ললিতের মুখে কোন কথা এলো না, এই একমাসের ভাড়া তাই সুরেশবাবুর কাছে ধার করে বাবা দিচ্ছেন—আরো একমাসের! তার মুখটা রাঙ্গা হয়ে উঠলো।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে.খিঁচিয়ে উঠলেন ব্রজেন্দ্রনাথ, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি মাথাটা কিনছো? যাও বাবাকে পাঠিয়ে দাও! সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রামকালীবাবুর কেমন যেন একটু মমতা আছে ছেলেটার ওপর। তিনি ভাবেন, ওর দোষ কি, বাপটা মাতাল হয়ে পড়াতেই যত গোল বেধেছে—আগে তো ভালই ছিল। তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন, যাক ব্রজ এবারে একমাসেরই নিয়ে নাও, আসছে মাসে দু-মাসের এক সঙ্গে দিতে বলো।

দেখছো সেজদা, দাদার কাণ্ড! এখন আমার চলে কি করে! বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের দিকে চেয়ে, সবাই একবার মুচকি হাসলো।

রামকালীবাবু বললেন, চল চল অনেক বেলা হয়ে গেছে ওঠো!

॥ ১০ ॥

অমিতাভ ঘরে বসে ভাবছে, কি ভাবে কথাটা মায়ের কাছে পাড়বে। এই সামান্য ব্যাপারটা তার কাছে ক্রমে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাবা, মা, দুজনেই যদি বাধা দেন? মা যদি বেশি কান্নাকাটি করেন। দারুণ অসোয়াস্তিতে সে চাইলে জানালার দিকে।

ললিতার আজ বিয়ে। অমিয়কান্তিদের বাড়িতে সবাই কর্মব্যস্ত। খুব ধুমধাম হবে; পেলেটির বাড়িতে নাকি সেজকর্তা অর্ডার দিয়েছেন। সে দেখলো, ললিতা রুনু এসে বাঁদিকের ঘরটায় ঢুকলো—বাঃ ব্যবহারে মনে হচ্ছে রুনু বড় বোন, ললিতা ছোট। ব্যবহার কেন, দেখেও মনে হচ্ছে রুনু বড়। রুনুকে এত বড় মনে হচ্ছে কেন? রুনুর সামনে আজকাল যেতে বাধ বাধ ঠেকে। দুত্তোর। যত বাজে চিন্তা। আবার সে ডুবে গেল নিজের সমস্যায়।

ঘরে এসে অমিতাভকে অন্যমনস্ক দেখে অমিয়কান্তি টেবিলে একটা চাপড মেরে বললে, এটেন্‌সান্‌!

ঘাড় ফিরিয়ে হেসে সে বললে, তুই এসে গেছিস অমি, আমি এই মাত্র তোকেই যেন চাইছিলুম।

ওটা খোসামুদি, অভিমানের সুরে বললে অমিয়কান্তি।

মোটেই নয়। তবে তোর সঙ্গের জন্যে নয়, সাহায্যর জন্যে।

বটে! অহিংস সৈনিকের আহ্বান শুনে সুখী হলুম বীর।

তাকে একটা চাপড় বসিয়ে বললে অমিতাভ, ঠাট্টা রাখ তোকে একটা কাজ করতে হবে—মাকে আমার কলেজ ছাড়া, সত্যাগ্রহীদলে নাম লেখানো, সব কথা জানাতে হবে।

বটে? মানে প্রথম ঝালটা আমার ওপর দিয়েই চালিয়ে দিতে চাও।

মানে, কাজটা করতেই হবে! বাবাকে আমি নিজেই বলতে পারবো।

আমি পারবো না! জোর দিয়ে বললে সে।

ঝগড়া হয়ে যাবে অমি!

হোক!

দুজনেই গোঁ হয়ে বসে রইল। শেষে অমিয়কান্তিই প্রথমে কথা বললে, আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে। কবে যেতে হবে তোকে কাঁথি?

দু একদিনের মধ্যেই; এখনও ঠিক হয়নি।

অমিয়কান্তি মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে চুপ করলে।

তোর ইচ্ছে করে না অমি আন্দোলনে যোগ দিতে? জিজ্ঞেস করলে অমিতাভ তার দিকে চেয়ে; কোন উত্তর না পেয়ে তাকে ঠেলা মেরে আবার বললে, কিরে কথা বলছিস না যে?

ইচ্ছে করে কিন্তু কলেজ ছাড়তে আমার আপত্তি, ওটা পারবো না।

তা পারবি কেন? সব ব্যাপারই স্বাভাবিক থাকা চাই তা সত্ত্বেও যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায় আপত্তি নেই কেমন?

তাই কি আমি বলছি, ভারীগলায় বললে সে।

ঘরের মধ্যেটা থমথমে হয়ে উঠেছে; দু-জনেই চুপচাপ, দু-জোড়া চোখ পরস্পরের মুখের ওপর দৃষ্টির-জ্যোতি ফেলে ফেলে সরে যাচ্ছে।

দুজনেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো যখন ঘরে এসে ঢুকলেন হারাধনবাবু।

ধীর শান্ত-গতিতে তিনি এসে একটা চেয়ারে বসলেন: কপালে চিন্তার রেখা, যোদ্ধার মত কঠিন মুখেও অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। স্বাভাবিক ভাবেই বলতে চেষ্টা করলেন তিনি, মিনটু আমি এক পরিচিত বন্ধুর কাছে শুনলুম তুমি কলেজ ছেড়ে সত্যাগ্রহীদলে যোগ দিয়েছ।

দম নেবার জন্যে থামলেন তিনি, অমিতাভ সংকুচিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিলে মাটির দিকে।

ভাল কাজ, কিন্তু পারবে কি?—শেষের দিকে গলার স্বর ভেঙে এলো তাঁর, অমিতাভর মনে হর্ষবিষাদের কম্পন শুরু হলো। অমিয়কান্তি বিস্ফারিতনেত্রে চাইল হারাধনবাবুর দিকে যেন নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পাচ্ছে না!

স্তব্ধ কক্ষের মধ্যে চলেছে তখন মহৎ দুর্বলতার সঙ্গে মহত্তর আদর্শের দড়ি-টানাটানি!

স্বপ্নোত্থিতের মতো বললেন হারাধনবাবু, কবে কাঁথি যাবার দিন ঠিক হয়েছে?

ঠিক হয়নি তবে দু-একদিনের মধ্যে হয়তো যেতে হবে। অতি নিম্নস্বরে বললে অমিতাভ।

হারাধনবাবু শিথিল পদে বেরিয়ে গেলেন। অমিয়কান্তি গিয়ে দাঁড়ালো অমিতাভর কাছে; তার কাঁধে একটা হাত রেখে বললে, তোর সমস্যা মিটে গেল মিনটু! যাবার একদিন আগে আমায় বলিস।

অমিতাভ ফিরে চাইল; অমিয়কান্তি দেখলে তার চোখদুটো জলে ভরা। ফিরে যাওয়া হলো না, বসে পড়লো তার পাশে।

॥ ১১ ॥

অমিতাভর বিদায়ের দিন এলো।

কাঁথি যাবার উত্তেজনার মধ্যেও মাঝে মাঝে সে দমে যাচ্ছে মায়ের কথা ভেবে।

বাবার কাছে সবকথা শুনে থেকে মায়ের একটা পরিবর্তন সে লক্ষ্য করছে; কান্নাকাটি, রাগ, অনুরোধ, অনুযোগ, কোন কিছুই নেই; শুধু প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তাঁর মুখে, ব্যবহারে, শঙ্কিত মাতৃ-হৃদয়ের অসহায় আত্মসংযমের আকাঙ্ক্ষা আর নির্লিপ্ত-কঠিন এড়িয়ে চলা। এর চেয়ে যেন ওগুলো ভাল ছিল অমিতাভর কাছে; সে যে চাইতে পারছে না মায়ের মুখের দিকে। মায়ের ওপর অভিমানে, তার মন ভরে উঠেছে।

মায়ের সেলাই করে দেওয়া ঝোলানো মোটা খদ্দরের ব্যাগটার মধ্যে, দুটো কাপড়, দুটো ফতুয়া, একটুকরো সাবান, দাঁত মাজার সরঞ্জাম আর খান দুই বই ভরার সময় অমিতাভ যেন একটু আরাম পেলে, আজই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এই ভেবে।

ব্যাগটায় বোতাম দিয়ে বন্ধ করার সময় তার মনে পড়ে গেল, মা তাকে এই ব্যাগটা দেবার সময়ও কোন কথা বলেননি। হাত গুটিয়ে সে চুপ করে বসে রইল।

নানাবিধ রন্ধনকার্যে ব্যস্ত মৃণ্ময়ী দেবী। অমিতাভর পাঁচবছরের ছোটবোন মাকে খুঁটিনাটি সাহায্য করতে গিয়ে কাজের ফিরিস্তি বাড়িয়ে ফেলছে।

বাজার থেকে নানা জিনিস আজ আনিয়েছেন মৃণ্ময়ী দেবী: মাছ, মাংস, তরিতরকারি, প্রায় যোগ্‌গী বাড়ির মতন। সকাল থেকে

একটার পর একটা রেঁধে চলেছেন :—ছেলেটা আজ কাঁথি যাবে, কোথায় থাকবে কি খাবে তার ঠিক নেই, যাবার দিনটায় ভাল করে খাইয়ে তো দি। ভাবতে ভাবতে হাতের খুন্তিটা মাঝে মাঝে থেমে যায় ; তা দেখে ছোটখুকি বলে ওঠে,—মা, তরকারি পুড়ে যাবে !

স্নানের সময় অমিতাভ দু তিনবার উঁকি মেরে গেছে রান্না ঘরের দিকে কিন্তু মায়ের মুখের চেহারা দেখে সে কিছু বলতে সাহস করেনি।

স্নান সেরে হাতপা ছাড়িয়ে বসে আছে, ছোটখুকী এসে ডাকলে ; তার চুলগুলো দু-হাতে এলোমেলো করে দিতে দিতে বললে, অমিতাভ, চল।

খাবার জায়গায় বসতে গিয়ে দেখলে অদ্ভুত কাণ্ড ! থালার চার-পাশে অন্তত আটটা তরকারির বাটি, রূপোর রেকাবীতে মিষ্টি, ফল, পাথরের দুটো বাটিতে দই রাবড়ী ! পাখা হাতে বসে মৃণ্ময়ী দেবী।

তুমি কি আমায় রাক্ষস ঠাউরেছ মা ? এত খাব কি করে ? হেসে ফেলে বললে অমিতাভ মার দিকে চেয়ে।

যা পারিস খা !—তাঁর যেন গলা ধরেছে মনে হলো।

খেতে খেতে সাহস সঞ্চয় করে বললে অমিতাভ, তুমি খুব রাগ করেছ না মা ?

কেন ?

এই যে আমি কাঁথি যাচ্ছি, পড়া ছেড়ে দিলুম !

মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন মৃণ্ময়ী দেবী প্রায় মনে মনে, আমি জানতুম।

দুটিমাত্র কথা কিন্তু ছুরির মত বিঁধলো অমিতাভকে।

নীরবে খেয়ে চললো সে।

॥ ১২ ॥

অমিতাভ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ঘরের মধ্যে অমিয়কান্তি, ললিত, ভুতো প্রভৃতি আরো দু-তিনজন এসে জমেছে। সকলের মুখে বিদায়ের পূর্বাভাস : কথা বলার চেয়ে, অমিতাভর মুখের দিকে চাইছে বেশি।

কাপড়টা মালকোঁচা মেরে, বেল্ট এঁটে অমিতাভ হাতকাটা ফতুয়াটা পরলে; কাঁধে মায়ের দেওয়া ব্যাগটা ঝুলিয়ে, মাথায় গান্ধী টুপী পরে, মাদ্রাজী স্যাণ্ডেলটা পায়ে গলিয়ে বললে, তোরা বাইরে দাঁড়াবি চল, আমি দেখা করে আসি।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলে, শাঁখ হাতে নিবারণ জানার স্ত্রীর পেছনে মা, আশীর্বাদী ধান দুর্বা হাতে দাঁড়িয়ে।

সে আস্তে আস্তে গিয়ে প্রথমে মায়ের পদধূলি নিলে, তারপর নিবারণ জানার স্ত্রীর। আশীর্বাদ শেষ করে মৃণ্ময়ী দেবী বললেন, নিচে চল, উনি দাঁড়িয়ে আছেন।

নিচে দরজার গোড়ায় দেখলে অমিতাভ, তার বাবার সঙ্গে এ বাড়ির প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, এমন কি মিত্তির বাড়ির বড়কর্তা, মেজকর্তা, সেজকর্তাও তাঁদের অংশের দিকে অপেক্ষা করছে।

সকলের কাছে বিদায় নিতে তার বেশ খানিকটা সময় লাগলো।

শেষে হারাধণবাবুকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, সাবধানে থেকো।

দরজার আড়ালে দাঁড়ানো মায়ের দিকে আর একবার চাইতেই তিনি বললেন নিম্নস্বরে, চিঠি লিখতে ভুলোনা মিনটু—শেষের দিকে তাঁর গলাটা কেঁপে গেল, অমিতাভ দেখলে তাঁর মুখের মাংস-

পেশীগুলো টক্‌টকে লাল আর কঠিন হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে উঠানে নেমে পড়লো।

উঠানের মাঝখানে এসে দেখলে, মিত্তিরদের জানালার গরাদে ধরে রুনু দাঁড়িয়ে আষাঢ়ের ঘন কাজল মেঘের মতই ঢলঢলে বর্ষণোন্মুখ চোখ দুটো। নিজের চোখ টিপে বন্ধ করে এগিয়ে গেল অমিতাভ—ওঃ অসহ্য! বাড়ি থেকে বেরোতে পারলেই যেন বাঁচে।

মিত্তির বাড়ির বাসিন্দারা অমিতাভর পেছনে পেছনে সদর দরজা পর্যন্ত গেল; রাস্তায় নামতেই কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, বন্দেমাতরম্।

মিত্তিরদের জীর্ণ বাড়িটা কাঁপিয়ে বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠলো, বন্দেমাতরম্।

অমিতাভ ফিরে তাকিয়ে দেখলে, দাঁত খিঁচনো বাড়িটা যেন হাসছে—আর পেছনের গাড়োয়ানগুলো এসে দাঁড়িয়েছে বিস্মিত চোখে।

গলিটা পেরোতেই ছুটতে ছুটতে অমিয়কান্তি তার সঙ্গ নিলে; সে বললে হাঁপাতে হাঁপাতে, চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কলেজ স্কোয়ারে পৌঁছোতে অমিতাভ দেখলে কাঁথি যাত্রী সত্যাগ্রহীরা সব নিচে জমা হয়ে গেছে; তার দেরি হয়ে গেছে, সে তাড়াতাড়ি অমিয়কান্তির কাছে বিদায় নেবার জন্য হাত বাড়ালে; অমিয়কান্তি হাতদুটো চেপে ধরলে।

চিঠি দিস মিনটু! সে বললে কম্পিত কণ্ঠে।

দেবো, মাকে দেখিস ভাই! মিনতির সুরে বললে অমিতাভ।

তার দিকে না চেয়েই, মাথাটা নিচু করে বললে অমিয়কান্তি, দেখবো! তারপর হন হন করে ফিরে গেল।

অমিতাভ অন্য কুড়িজন সত্যাগ্রহীর সঙ্গে মিলিত হবার পর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন—তাঁর মূল কথা হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রেই অহিংস থাকতে হবে, গুলীর সামনে, লাঠির

সামনে, নির্ভীক যোদ্ধার মত এগিয়ে, বিনা প্রতিবাদে বুক পেতে দিতে হবে।

কুড়িজন সত্যাগ্রহী সার বেঁধে দাঁড়ালো। সামনে নেতার হাতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হাওয়ায় দুলছে।

সমবেত কণ্ঠের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল।

নেতা আদেশ দিলেন, আগে বাড়ো।

সত্যাগ্রহীর দল সামরিক কায়দায় এগিয়ে চললো।

অমিতাভ দেখলে, রাস্তায় দুধারে পথিক, দোকানদার, গৃহস্থ, সবাই তাদের দিকে চেয়ে আছে। নীরব চোখে তাদের আশীর্বাদের বাণী—জয়যুক্ত হোক তোমাদের অভিযান।

মুহূর্তে মনের মেঘ বৈশাখী ঝড়ে উড়ে গেল; অনিরুদ্ধ বাসনা এতদিনে সার্থক হতে চলেছে। হাত দুলিয়ে পা মিলিয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সে সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠলো—

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

তৃতীয় সর্গ

॥ ১ ॥
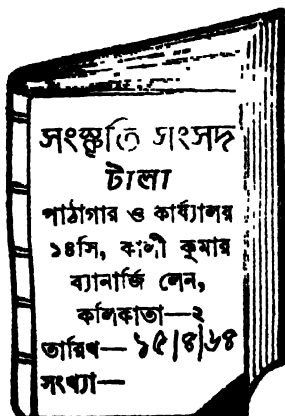
কণ্টাই রোড স্টেশন। রাত্রির অন্ধকার বিদায় নিচ্ছে; বেগুনে আলোয় আশ্চর্য দেখাচ্ছে লাল কাঁকড় বিছানো ছোট স্টেশনটি।

জনহীন, নিস্তব্ধ; তেলের বাতিগুলো তখনও জ্বলছে।

আকাশে বেগুনে আলো, মিটমিটে বাতি, টেলিগ্রাফের ক্ষীণ ধাতব শব্দ, সবগুলো জড়িয়ে অনন্য অনুভূতি অমিতাভর মনে।

সত্যাগ্রহীরা ট্রেন থেকে নামবার পর নেতার কণ্ঠে ধ্বনি উঠলো বন্দেমাতরম্। প্রতিধ্বনি হলো কুড়িটা কণ্ঠে।

সাড়া পড়ে গেল স্টেশনে। স্টেশনমাষ্টার বেরিয়ে এলেন; তাঁর হাতের গোল আলোটা তখনও জ্বলছে। অন্য কর্মচারীরা এসে ছড়িয়ে দাঁড়ালো, সাধারণলোকরা এসে ঘিরে নিলে সত্যাগ্রহীদের।

তারা কোন কথা জিজ্ঞেস করবার পুর্বেই একজন বললেন, আপনারা কাঁথি যাবেন তো? রাস্তায় ওই-যে বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ওতেই আপনাদের যেতে হবে।

তাঁকে একটা নমস্কার ক'রে আদেশ দিলেন নেতা, আগে বাড়ো!

দুটো সারি এগিয়ে চললো।

রাস্তায় বাসচালকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কে নিয়ে যাবে; সবাই বলতে শুরু করেছে,—আমার জানা আছে আমি নিয়ে যাবো!

চালকদের মধ্যে কোন আপোসের সম্ভাবনা না দেখে আদেশ দিলেন নেতা, আমাকে অনুসরণ কর!

ভিড় ঠেলে নেতার পেছনে পেছনে সমগ্র দলটি উঠলো সামনে দাঁড়ানো একটি বাসের মধ্যে।

তখন বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। দু'পাশে বিসর্পিত কাটা ধানজমি

আর ধুলোয়ভরা রাস্তার, ছু-ধারে গাছের সারির মধ্যে দিয়ে বাস ছুটে চললো।

মোটর বাসের ছন্দহীন নৃত্যের মধ্যে অনুভব করলো সকলে, পথটা মসৃণ নয়, নিকটও নয়, বহুদূর।

ঘণ্টাকতক পরে, বাসটা এসে ঢুকলো কাঁথির জনবহুল উপকণ্ঠে : মেদিনীপুর জেলার মহকুমা হলেও কাঁথি প্রায় শহরেরই সামীল। শুধু শহর নয়, বহু পুরাতন শহর, সাবেকি শহরের নিস্তব্ধ বৈশিষ্ট্য হিসাবে কাঁথির অল্প-পরিসর পথে, ধীর গতিতে বাসটা চল্‌লো। একদল সত্যাগ্রহী ধ্বনি দিতে দিতে চলেছে শহরের-বাইরের দিকে ; বাসটা গলির মোড় ঘুরে এসে দাঁড়ালো একটা গেটের সামনে।

বাড়ির ওপরে কংগ্রেস পতাকা-উড়ছে ; চারিদিকে টিনের চালায় কর্মব্যস্ত স্বেচ্ছাসেবক। অমিতাভর বুক দুর দুর করে কেঁপে উঠলো ; আনন্দে, আকাঙ্ক্ষায়, না উত্তেজনায়, ঠাওর করতে পারলেনা সে ; ফিরে চাইলে সঙ্গীদের দিকে ; সকলেরই মুখে ছায়া ঘনিয়ে এসেছে ; ক্লান্তির ? তাই হবে।

দ্বাররক্ষী স্বেচ্ছাসেবক, নবাগতদের, এগিয়ে নিয়ে চললো অফিসের দিকে। সেখানে একজন কৃষ্ণ শ্মশ্রুল, গুরুগম্ভীর ব্যক্তি নানারকম ফাইল নিয়ে ব্যস্ত। দলের নেতা পরিচয়-পত্র দেখাতে, তিনি ক্লান্তচোখে চাইলেন সকলের দিকে, তারপর দণ্ডায়মান স্বেচ্ছা-সেবককে আদেশ করলেন, এদের থাকার ব্যবস্থা করে দাও। তিনি মন দিলেন লেখায় ; নবাগতরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

স্বেচ্ছাসেবকের নির্দেশ অনুযায়ী, অমিতাভদের দল ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। মনঃপুত না হলেও মেনে নিতে হলো ;— অমিতাভ এবং আরো চারজন স্থান পেল দোতলার একটি ঘরে।

কাঁধের থেকে ব্যাগগুলো মাটিতে ছুঁড়ে দিয়ে তারা গড়িয়ে পড়লো কম্বলের ওপর ; তারপর চললো পরস্পরের পরিচয়ের পালা।

প্রথমটির নাম সুনির্মল সরকার ; আসছে কৃষ্ণনগর থেকে, দোহারা চেহারা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখে কৈশোরের কোমলতা এখনও মিলোয় নি। দ্বিতীয় জন সুধীর সেন : আসছে ঢাকা থেকে, পেশীবহুল চুলগুলো ছোট করে কাটা, উঁচু চোয়াল, নাক চেপটা, রং ফরসা বলা চলে। তৃতীয় বিভূতি মিশ্র : এও ঢাকার রোগা লম্বা চেহারা, মুখে ব্রণের দাগ, রং ময়লা। চতুর্থের নাম সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় : আসছে ক'লকাতা থেকে, সাধারণ চেহারা, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে চোখের হালকা চাহনি।

সত্যাগ্রহী শিবিরের কঠিন শৃঙ্খলা ও নিস্তব্ধ-পরিবেশ সকলকে মনমরা করে তুলেছিল ; একটা ঘণ্টা ধ্বনি হওয়ায় তারা যেন একটু আরাম পেলে।

একজন অল্পবয়স্ক ছেলে তাদের এসে বললে, স্নানের ঘণ্টা পড়েছে আপনারা স্নান সারুন।

সুধীর বললে ছেলেটির দিকে চেয়ে; কোথায় স্নান সারবো খোকা ?

খোকা বলাতে ছেলেটি বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে উত্তর দিলে, চলুন আমি দেখিয়ে দেবার জন্যেই এসেছি।

॥ ২ ॥
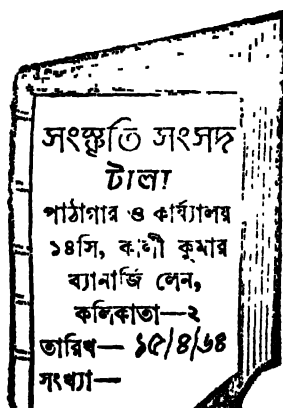
কেন্দ্রীয় সত্যাগ্রহ শিবিরে, চব্বিশ ঘণ্টা 'থাকার পর অমিতাভদের প্রতি একটি লিখিত নির্দেশ এলো—'সুধীর সেনের নেতৃত্বে তাদের চারজনকে বেলা চারটের সময় পিছাবনকেন্দ্রে রওনা হতে হবে। পথপ্রদর্শক একটি স্বেচ্ছাসেবক তাদের প্রয়োজন হলে সঙ্গে যেতে পারে। নিচে অধিনায়কের সই। সুনির্মল সকলের দিকে চেয়ে বললে, এখানে কাল শুনলাম পুলিসের রোখ পিছাবনী কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি।

ভালতো একেবারে সেরা কেন্দ্রে হাজির হবো। তোমার কি ভয় করছে সুনির্মল ? বললে সুধীর তাকে ইঙ্গিৎ করে। না না ভয় নয়, আমাদের অভিজ্ঞতা নেই তাই ভাবছি। চল ভাই অভিজ্ঞতা হতে কতক্ষণ ? তার পিঠে একটা চাপড় মেরে অমিতাভ বললে।

বিদেশে বিপদের মুখে বন্ধুত্ব জমে ভাল। এরাও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বেশ পরস্পরকে আপনার করে নিয়েছে।

বেলা চারটের সময় তাদের প্রস্তুত হবার আহ্বান এলো পথ-প্রদর্শক এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। রওনা হলো তারা চারজন।

কাঁথি শহরের মধ্যে দিয়ে বুক টান করে চললো ধ্বনি দিতে দিতে।

শহর ছেড়ে পিছাবনীর পথে হাঁটতে হাঁটতে তারা মাঝে মাঝে গাছের তলায় বসলো।

হাঁটায় অনভ্যস্ত সবাই তবু কেউ কারুর কাছে হার মানবে না এই পণ। যেতে যেতে সুখময়ের স্যাণ্ডেলের ফিতেটা গেল ছিড়ে; বিরক্ত হয়ে পায়ের থেকে খুলে ধুলোশুদ্ধ সেটা ব্যাগের মধ্যে ভরে নিতেই সবাই হেসে উঠলো।

একবার সুনির্মল বিশ্রাম করবার সময় গাছে হেলান দিয়ে তার ধুলাধুসরিত পায়ের দিকে চাইল ; তার মুখখানাও একটু শুকিয়ে গেছে। ঠাট্টার সুরে সুখময় বলে উঠলো, কি হে পা কন্‌কন্‌ করছে নাকি, টিপে দেবো ?

লজ্জিত হয়ে উঠে পড়ে বললে সুনির্মল, মোটেই না, চলো।

একটা গান হলে ভাল হতো! বিভূতি বললে সুধীরের দিকে চেয়ে। সুধীর গান জানে, কিন্তু গান গাইলে পাছে নেতার মর্যাদা নষ্ট হয় সেই জন্যে স্বীকার করেনি। শেষে বিভূতি নিজেই তার ভাঙ্গা বেসুরো গলায় গান শুরু করে দিলে—যায় যেন জীবন চলে জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্‌ বলে......

তার গলার সুরে চেঁচিয়ে উঠলো বিভুতি, ওরে বাবা, ছাই চাপা আগুন ! ফুর্তিতে সুরে-বেসুরে চেঁচিয়ে চললো পাঁচজন।

অন্ধকার হয়ে এসেছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না ; শুধু তারা বুঝলে রাস্তার ধারে খড়ের একটা বড় চালার দরজার কড়া নাড়লো পথ প্রদর্শক।

রোগা, লম্বা, কাল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে রূপোর চশমা হাটুর ওপরে কাপড় পরা, খালিগায়ে একটি লোক এসে দরজা খুলে দাঁড়ালেন।

তাকে উদ্দেশ্য করে পথপ্রদর্শক বললে, এদের পাঠিয়েছেন এই কেন্দ্রের জন্যে। তারপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সে মিশিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

দরজায় দাঁড়ানো লোকটি বললেন, তোমরা ভেতরে এসো।

॥ ৩ ॥

পিছাবনী কেন্দ্রে অমিতাভর ঘুম ভাঙ্গতেই চোখে লাগলো তীব্র আলোর ঝলক। সে মাথা নিচু করে চোখ রগড়াতে লাগলো। শুধু ব্যাগ মাথায়, মাদুরে রাতটা একঘুমে কেটে যাবে কে ভেবেছিল! আজকের ঘুমভাঙ্গা যেন নবজীবন! হাতপাগুলো টান করে আরামে হাই তুলে সে চারিদিকে তাকালে।

মস্তবড় ছাউনি; চারিদিকে সারি সারি মাদুর-কম্বল গুটিয়ে তোলা। সে বেশ বুঝতে পারলে, সুনির্মল আর নিজে ছাড়া অন্য সবাই শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে গেছে। কানগুলো লাল হয়ে উঠলো তার! তাড়াতাড়ি পাশে নিদ্রিত সুনির্মলকে ঠেলা দিয়ে ডাকলে, উঠে পড়ো! সে ধড়মড়িয়ে উঠে চোখ রগড়াতে লাগলো।

অমিতাভ বললে, বড বেলা হয়ে গেছে! কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই, এখন কি করা যায়?

চল, চারিদিক ঘুরে দেখি কেউ আছে কি না! জড়িতগলায় সুনির্মল বললে, দেখতে দেখতে তারা এসে দাঁড়ালো পশ্চিমের দিকে চাঁচ-আড়াল দেওয়া একটা ঘরের সামনে। পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে ঢুকে পড়লো সেটার মধ্যে। সেখানে দেখলে, দেওয়ালে একটা ম্যাপ টাঙানো, নানা রকম নোটিশ ঝুলছে, নিচে কম্বলের ওপর ফাইল; নামের তালিকা ইত্যাদি ছড়ানো। অমিতাভ বললে, এটা অফিসঘর মনে হচ্ছে, চলো অন্য জায়গা দেখি। ভেতরে কাউকে না দেখতে পেয়ে তারা ছাউনির বাইরে এসে একটা বুড়ো বটগাছ তলায় দাঁড়ালো। ধুধু মাঠের মধ্যে শুধু তাদের এই ছাউনি; তার পশ্চিম দিকে একটা পুকুর; পুকুরের অপর পাড়ে কতকগুলো খোড়ো চালা।

চালাগুলো লক্ষ্য করে দু-জনেই বলে উঠলো, ওই যে ওখানে কতক-গুলো ঘর রয়েছে।

জনহীন প্রান্তরের মধ্যে, কলকাতা থেকে সদ্য-আগত তারা যেন একটু আরাম পেল।

চলো মুখ ধুয়েনি পুকুরে।—অমিতাভ বললে।

বাঁধানো ঘাটের অভাবে ঢালু পাড় বেয়ে নামতে তাদের বেশ খানিকটা অসুবিধা হলো পুকুরের দলগুলো সরিয়ে একটু ইতস্তত করে দুজনে মুখ ধুয়ে হাত ধরাধরি করে আবার উঠে এলো পাড়ে।

কি করবে না-করবে ইত্যাদি নানা কথা ভাবছে অমিতাভ, এমন সময় বলে উঠলো সুনির্মল, পুলিশ, পুলিশ, অমিতাভ!

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলে অমিতাভ, একদল পুলিশ সামরিক কায়দায় এসে ঢুকছে পুকুরের ওপারের ঘরগুলোর মধ্যে।

তবে কি ওপাড়েও সত্যাগ্রাহী শিবির? তাদের ধরবার জন্যে পুলিশ এলো?—সেইদিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো তারা।

পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, আপনাদের ঈশ্বরদা ডাকছেন অফিসঘরে যান। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে সুনির্মল, ঈশ্বরদা কে?

ঈশ্বরচন্দ্র পালিত, পিছাবনী কেন্দ্রের অধিনায়ক। ছেলেটি বললে।

দুজনেই অফিসে গিয়ে দেখলে, গত সন্ধ্যায় দরজায় দাঁড়ানো সেই রোগা কাল লোকটি কম্বলের ওপর পা গুটিয়ে বসে আছেন, তারা একটু সংকুচিত হয়ে পাশে দাঁড়ালো, রুপোর বাঁধান ঢিলে চশমাটা হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে তিনি বললেন, বোস তোমরা। কি করছিলে বাইরে?

তাঁর অস্ফুট গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অমিতাভ দ্বিধাজড়িত সাহসে বলে ফেললে, ওপাড়ের ঘরগুলোয় পুলিশ এসে কি করছে তাই দেখছিলুম।

হাসির রেখা ফুটে উঠলো ঈশ্বরবাবুর মুখে, অমিতাভ ভেবেই পেলে

না এতে হাসি পাবার কি আছে ; ওদিকে পুলিশ আসেনি। ওই খানেই ওরা থাকে, ওটা অস্থায়ী থানা, বললেন তিনি।

অবাক কাণ্ড, পুকুরের এপাড়ে সত্যাগ্রহী শিবির, ওপাড়ে পুলিশের থানা! দুজনেই হতবাক হলো।

এদিকে জনশূন্য ছাউনিটা তখন সত্যাগ্রহীতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। খালি গায়ে ; ছোট ছোট কাপড় পরা, ছেলের দল, প্রায় সব একই রকম দেখাচ্ছে!

একটি ছেলে এসে ঈশ্বরবাবুকে বললে, ঈশ্বরদা, ওই গ্রামের নবীন ওঝার এক হাজার মন ধান আর খামার ভর্তি খড় পুলিশে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে!

কেন ?

সে নাকি সত্যাগ্রাহীদের সাহায্য করতো।

তারপর—শান্তভাবে বললেন তিনি।

একদিনে আগুন নেভাতে পারেনি! তিনদিন পরে আগুন যখন নিভলো তখন এক কণাও অবশিষ্ট নেই! ছেলেপিলে নিয়ে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে!

নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনলে অমিতাভ ; ঈশ্বরবাবুর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই ; তুমি সাইকেলে এখুনি কাঁথিতে এইখবরটা জানিয়ে এসো—ছেলেটি দ্রুতগতিতে চলে গেল, তিনি অমিতাভদের দিকে চেয়ে বললেন, চলো তোমাদের নুন পরিষ্কার করা শিখিয়ে দি, ওই কাজই তোমাদের এখন করতে হবে।

পিঠটা একটু বেঁকিয়ে তিনি অফিস ঘর থেকে বেরোলেন, সঙ্গে সঙ্গে সুনির্মল অমিতাভও চললো।

॥ ৪ ॥

পিছাবনী কেন্দ্রে পনেরঁদিন কেটে গেল। অমিতাভর আর ভাল লাগছে না। কাজের মধ্যে শুধু নুঁন ফোটানো। এইজন্যেই কি সে এতদিন এতো কথা ভেবে রেখেছে! বীর অহিংস সৈনিক হবে, অত্যাচার উৎপীড়ন তুচ্ছ করে হাসি মুখে বিপদের সামনে দাঁড়াবে এই তো তার কাম্য—কিন্তু একি? শিবিরে বসে দিনের পর দিন নুন ফোটানো!

এরি মধ্যে সে বার দুয়েক ঈশ্বরদাকে অনুরোধ করেছে, তাকে কোন সক্রিয় কেন্দ্রে পাঠাবাব জন্যে, যেখানে নুন তৈরি করা হয়। তিনি শুধু হেসে বলেছেন, হবে হবে ব্যস্ত কেন?

আজকাল তার ক্রমে একটু একটু রাগ হতে আরম্ভ হয়েছে, ঈশ্বর-দাব ওপর। তিনি তো লোক মন্দ নন, তবে কেন তার অবস্থাটা বুঝছেন না? শুধু কি সে, সুনির্মলও হাঁপিয়ে উঠেছে!

রাত্রি প্রায় নটা। মাদুরে শুয়ে-শুয়ে অমিতাভ চাইলে ছাউনির দিকে। সত্যাগ্রহীর দল এরি মধ্যে যে যার কম্বলের ওপর লম্বা লম্বা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; তাদেয় ক্লান্ত মুখে সারাদিনের পরিশ্রমের ছাপ তখনও মিলোয়নি।

উঠে বসে অমিতাভ জানলা দিয়ে তাকালে; ওপারের পুলিশের শিবিরটাও নিঝুম, নিস্তব্ধ!

অন্ধকারে অজগরের নিঃশ্বাসের মত শব্দ ভেসে আসছে ওপাড় থেকে।

অমিতাভর মনে পড়ে গেল, এই সময় সবচেয়ে খুশিমনে গীতা পড়েন ঈশ্বরদা, ঠিক এই সময় ধরতে পারলে তার একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। পা টিপে সে উঠে দাঁড়ালো। তাকে উঠতে দেখে শুয়ে-শুয়েই সুনির্মল বললে, কি হলো? উঠলে যে?

সুনির্মল যে ঘুমোয়নি সেটা ধারণা ছিলো না তার ; সে বিরক্ত-ভাবেই বললে, হবে আবার কি, ঈশ্বরদাকে একটা কথা জানাতে হবে !

তড়াক করে একলাফে উঠে বললে, সুনির্মল, বুঝেছি ! আমিও যাবো ।

সুনির্মলের কম বয়সের অছিলায়—পাছে অনুমতি না পায় এই ভয়ে সঙ্কিত হয়ে উঠলো অমিতাভ । সে মুখ গোঁজ করে এগিয়ে গেল অফিস ঘরের দিকে ।

যেতে যেতে মিনতির সুরে বললে সুনির্মল, আমার জন্যেও একটু বলে দিও অমিতাভ, আমারও আর ভাল লাগছে না এখানে !

বলতে হয় নিজে বলো, আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাক, রাগের সুরে বললে অমিতাভ ।

অফিস ঘরের চাঁচের ফাঁকে চোখ রেখে অমিতাভ একবার দেখে নিলে ঘরের ভেতরটা : ঈশ্বরদা রোজকার মত আজও আসন করে গীতা পড়ছেন ; চশমাটা প্রায় নাকের ডগায় ঝুলে পড়েছে । অমিতাভ একটা গলার আওয়াজ করে ঢুকে পড়লো ।

গীতার থেকে চোখ তুলে হেসে প্রশ্ন করলেন তিনি, কি হে খবর কি এখনও ঘুমোওনি !

অমিতাভর পেছনে সুনির্মলকেও ঢুকতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, আরে তুমিও যে ? মারামারি করেছ নাকি দুজনে ?

মাথাটা প্রচণ্ডভাবে চুলকোতে চুলকোতে বলে ফেললো অমিতাভ, আমাদের আর ভাল লাগছে না এখানে । দুজনের দিকে সোজা তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন তিনি সত্যাগ্রহী হলে কেন ? বাড়িতে থাকলেই ত পারতে ? .

তাঁর গলার স্বর ও চোখের দৃষ্টি দেখে দুজনেই ঘাবড়ে গেল ।

একটু থেমে অবার বললেন তিনি, বেশ কালই তোমাদের বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি !

মরিয়া হয়ে কাঁদ কাঁদ সুরে বলে উঠলো অমিতাভ, আমরা বাড়ি যেতে চাইনি ঈশ্বরদা, কোন সক্রিয় কেন্দ্রে আমাদের পাঠাবার কথা বলছি।

মুহূর্তে ঈশ্বরদার মুখখানা হাসিতে ভরে উঠলো তিনি বললেন, তাই বলো! আমি ভুল বুঝেছি, বোস বোস। দেখি কি করতে পারি।

খুশিমনে বসলো দুজনে। ঈশ্বরবাবু তাঁর পাশের ফাইলগুলো ঘেঁটে নামের তালিকা বার করলেন। সেগুলো অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, কোথাও তো খালি নেই তবে সুধীরদের কেন্দ্রে দু-জনকে বদলি করা যেতে পারে। কিন্তু......

উৎসাহিত ভাবে বললে অমিতাভ, ওইখানেই না হয় পাঠিয়ে দিন!

ওখানে তোমাদের পাঠানো আমার ইচ্ছা নয়—চশমাটা খুলে চিন্তিত ভাবে বললেন তিনি।

কেন ঈশ্বরদা?

ওখানের কাজ শক্ত! অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি।

সুনির্মল না হয় থাক, আমাকে ওইখানেই পাঠিয়ে দিন! জোর গলায় বললে অমিতাভ।

অভিমানে বললে সুনির্মল, কেন তুমি যেতে পারো আর আমি যেতে পারবো না!

তাদের ভাব দেখে হেসে ফেললেন ঈশ্বরবাবু তিনি বললেন, ঝগড়া নয়! ঝগড়া নয়! কালকে তোমাদের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। অনেক রাত হয়েছে এখন ঘুমোওগে, কাল ভোরবেলা প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

তিনি আবার চশমা চোখে লাগিয়ে গীতা পড়তে শুরু করলেন। অমিতাভ আর সুনির্মল একানড়ের মত পা ফেলে ফেলে বেরিয়ে গেল।

॥ ৫ ॥

সকালে ব্যাগ ঝুলিয়ে, টুপী-পরে, প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ালো সুনির্মল, অমিতাভ, ঈশ্বরদার অফিসের সামনে।

তাদের দেখে চিন্তিতভাবে বললেন ঈশ্বরদা, নেহাৎ যাবে?

দুজনে কোন কথা না বলে মাথা হেলালো। একটি ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন ঈশ্বরদা, সুধীরের কেন্দ্রে এদের দুজনকে পৌঁছে দিয়ে এসো—সেই সঙ্গে তাদের রিপোর্ট ও নিয়ে আসবে। তিনজনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ঈশ্বরদা।

পুকুরের পাড় দিয়ে যেতে যেতে অমিতাভ একবার ভুরু কুঁচকে চাইল থানাটার দিকে। সুনির্মল শিবিরের দিকে ফিরে চাইতেই, দেখতে পেলে ঈশ্বরদা তখনও তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; সে বললে, অমিতাভকে, ঈশ্বরদা এখনও দাঁড়িয়ে।

অমিতাভ চাইল সেইদিকে, তারপর দুজনেই হেসে হাত তুলে আবার এগিয়ে গেল। পথপ্রদর্শক ছেলেটি ততক্ষণে ধানমাঠের আলের ওপর নেমে পড়েছে।

মেঠো রাস্তায় খানিকটা যাবার পর তারা এসে উঠলো উঁচু রাস্তায়। রাস্তাধারে একটা ছোট বসতি পেরিয়ে, আবার নামালো ধানজমিতে।

দুজনেরই আলে হাঁটা অভ্যাস নেই; পথপ্রদর্শকের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে এরি মধ্যে পা ফোস্‌কে দু-তিনবার আছাড় খেয়েছে।

মাঠের শেষে একটা বড় নারিকেল গাছের বাগানে উঠলো তারা। বড় বড় ছাতার মত নারিকেল গাছগুলো সে-জায়গাটাকে প্রায় অন্ধকার করে রেখেছে। গুটিকতক মুসলমান চাষী, গান্ধীটুপি-পরা ছেলেদের

দেখে নিজেদের মধ্যে কি বলাকওয়া করে হাঁক দিলে, ও স্বদেশী-বাবুরা, স্বদেশীবাবুরা।

তিনজনেই থেমে গেল। ওদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারা এগিয়ে এলো। কোমরে দড়ি বাঁধা, পেছনে গোঁজা ধার দেওয়া কাস্তের মত একটা করে কাটারি। একজন মাথা চুল্‌কে বললে, কোথায় যাবেন বাবুরা ?

বলা নিষেধ ভাই—বললে পথপ্রদর্শক।

একটু ডাবের জল খেয়ে যান।

আমাদের দেরী হয়ে যাবে আমরা কাজে যাবো!

কিছু দেরী হবে না বাবু!—মিনতির সুরে বললে চাষীরা। তারা পথ আগলে দাঁড়িয়েছে দেখে, বলতে হলো, তাই দাও দেরী না হয়।

অমিতাভ লক্ষ্য করলে এদের কথায়, বাংলা হলেও উড়িষ্যা প্রদেশের টান রয়েছে।

চোখের পলকে একটি লোক সড় সড় করে লম্বা একটা গাছে উঠে একটা ডাব ভর্তি কাঁদি কেটে দিলে; সেটা এসে সশব্দে পড়লো মাটিতে। নিচের চাষীরা পেছনে গোঁজা কাটারি দিয়ে ডাবের মুখগুলো কেটে এনে ধরলো অমিতাভদের সামনে!

একটা করে ডাব খেয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই তারা বলে উঠলো, আর একটা দয়া করে খেয়ে যান বাবুরা! অগত্যা আর একটা করে খেতে হলো সবাইকে।

লোকগুলো কোমর বেঁকিয়ে সেলাম করে সরে দাঁড়ালো, অমিতাভরা এগিয়ে চলল: অজান্তে বুকগুলো একটু উঁচু হয়ে উঠেছে—চলার গতিবেগ গেছে বেড়ে।

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর তারা একটি গ্রামে এসে পৌছালো। গ্রামের মাঝে সিঁথির মত সরু রাস্তা, দুপাশে নানাআকারের মাটির ঘর।

একটা পরিষ্কারভাবে নিকানো দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ালো পথপ্রদর্শক। চারিদিকে চেয়ে সে ডাকলে, সুধীরবাবু, সুধীরবাবু!

দাওয়ার ভেতর দিক থেকে অতিবৃদ্ধ একজন লোক হুকো হাতে এসে দাঁড়ালেন ছেলেদের সামনে।

সুধীরবাবু আছেন কি?

ওরা তো এখনও ফেরেননি! বললেন তিনি কেসে।

ফিরতে দেরী হবে কি?

না এই এলেন বলে, আপনারা বিশ্রাম করুন—তারপর বাড়ির ভেতর দিকে চেয়ে হাঁকলেন, মানুকে ও মানুকে চাটাইটা আর পা ধোয়ার জল আন! অমিতাভ দেখলে,—দাওয়ার দেওয়ালে নিপুণ হাতে সাদা খড়ির আলপনা আর দরজার ওপরে লেখা বন্দেমাতরম্। দাওয়ার পাশে ছোট একটা ঘেরা দেওয়া জায়গার মধ্যে কতকগুলো সাধারণ ফুলের গাছের সঙ্গে উচ্ছে গাছের লম্বা লতা। সবই যেন নিখুঁৎ করে রাখা, সজাগ দৃষ্টির পাহারায়।

সামনে এসে দাঁড়ালো চাটাই ঘটি হাতে বার-তের বছরের একটি ছেলে; দুষ্টুমি ভরা চোখেই তার পরিচয়।

দাওয়ার ধারে ঘটি রেখে, সে আড়চোখে চাইতে চাইতে চাটাই পেতে দিলে; বৃদ্ধ বললেন হুকোর থেকে মুখ তুলে, হাত পা ধুয়ে বসুন বাবুরা!

হাত-পা ধুয়ে সকলেই এসে বসলো চাটাইয়ে। মানিক অর্থাৎ মানুকে, গিয়ে দাঁড়ালো দরজার গোড়ায়।

নিম্নস্বরে মানুকে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে দরজার আড়ালে; বুড়ো কাসে আর তামাক টানে, দাওয়ার ধারে উবু হয়ে বসে; পথ-প্রদর্শক পথের দিকে চেয়ে ভাবে, কখন কাজ বুঝিয়ে পাড়ি দেবে।

বন্দেমাতরম্ হাঁকতে হাঁকতে সুধীরের দল এসে পৌঁছালো।

পথপ্রদর্শক ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সুধীরবাবু এরা

দুজন এখানে কাজ করবে,—ঈশ্বরদা কদিনের রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন।

সুধীরের চোয়ালের হাড়গুলো যেন আরো চোয়াড়ে হয়ে গেছে, কপালে একটা কাটা দাগ, রং হয়ে গেছে তামাটে। সুখময়, বিভূতি তাদেরও চেহারা বদলে গেছে।

অমিতাভ, সুনির্ম্মলের দিকে চেয়ে আকর্ণ হেসে বললে সুধীর, এইতো চাই, দেখবো এইবার বীরত্ব।

এক পোঁটলা নুনমাটি দিয়ে সুধীর বললে পথপ্রদর্শককে, এটা জমা দিও, অনেক কষ্টে আজ বাঁচিয়েছি।

জিজ্ঞাসুনেত্রে সে চাইতেই বিভূতি বললে, পুলিশে উনুন ভেঙ্গে দেবার সময় সুধীরদা ওটা বুকের তলায় নিয়ে শুয়ে পড়েছিল, শ্রীবপুকে দুতিন জন পুলিশে মাটি ছাড়াতে না পেরে গোটা দুয়েক কোঁৎকা মেরে ছেড়ে দিলে। সবাই হেসে উঠলো সেই কথায়।

সুধীর রাগের ভান করে বললে, আমি এদিকে কোমর কন্‌-কনানিতে গেলুম আর ওঁরা হাসছেন, এসো তোমরা আমার সঙ্গে। হাসতে হাসতে সবাই তাকে অনুসরণ করলো।

॥ ৬ ॥
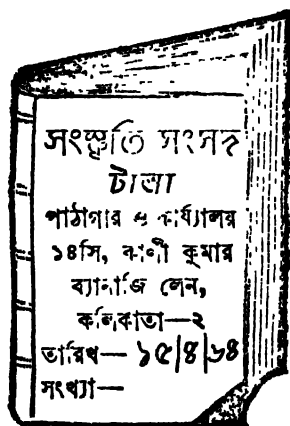
স্নান সেরে অমিতাভ এসে নিজেদের ডেরাটার দিকে ভাল করে চাইলে।

অনেকগুলো বাড়ির পেছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে চালাটা যেন উঁকি মারছে—কোথাও জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই।

সে সুধীরকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা সুধীরদা থাকবার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে এই ঘরটাই বাছলে কেন?

কারণ প্রভুরা—অতিপরিচিত ভঙ্গী করলে সুধীর।

কিন্তু সুধীরদা নীতির দিক থেকে এটা কি ঠিক?

কার্যক্ষেত্রে একটু-আদটু নীতির পরিবর্তন হয়ে যায় ভাই।

কিন্তু গান্ধীজি যে চিঠি লিখে...

কথা শেষ করতে না দিয়ে, বলে চললো সুধীর, সেটা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সম্ভব, গণ-আন্দোলনে সেটা সম্ভব নয়। সংগ্রাম শুরু করে শত্রুপক্ষকে পদ্ধতিগুলো জানিয়ে না দেওয়াই সংগ্রামের পক্ষে সুবিধাজনক আজকাল সেই রকমই নির্দেশ আসছে—পরে হয়তো আরো গোপনতার প্রয়োজন হবে ভাই।

অমিতাভ চুপ করলে। মানিক এসে খবর দিলে ভাত দেওয়া হয়েছে। সবাইকে ডেকে সে চলে গেল।

লম্বা একটা সরু দাওয়ায় সারি সারি খাবার জায়গা করা। অমিতাভরা একে একে গিয়ে বসলো।

একটি একটি বাড়াভাতের থালা দিয়ে গেলেন একজন স্ত্রীলোক; দোহারা শ্যামবর্ণ চেহারা, সাধারণ মুখের ওপর মমতা মাখানো, শক্ত বাঁধন।

সুধীর বললে, অমিতাভের দিকে চেয়ে, আমাদের সোনাদি।

বিভুতি বললে হেসে, ওঁর নাম অবশ্য জানা নেই, মানিকের মা, সুধীরদা পূর্ববঙ্গীয় নাম দিয়েছে।

ডালের বাটি দেবার সময় সোনাদি একবার ভাল করে দেখে নিলেন অমিতাভ সুনির্মলকে।

এত কম বয়সে কি তোমাদের আসূতে আছে বাছা এই কষ্টের মধ্যে। বললেন তিনি।

বয়সের চেয়ে মুখের চেহারাটা বেশি-কচি হওয়ায় অমিতাভর আজ রাগ হলো নিজের ওপর। সুনির্মল মাথাটা নিচু করলে।

সোনাদি সস্নেহ চোখে চাইলেন দুজনের দিকে।

অমিতাভর মায়ের মুখখানা আজ প্রথম মনে পড়ে গেল; কখন তার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। সোনাদির কণ্ঠস্বরে চৈতন্য হলো, বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে বুঝি ভাই ?

লজ্জিত হয়ে সে খেতে আরম্ভ করলো।

সুধীর কৃত্রিম অভিমানের সুরে বললে, সোনাদি আজ নতুন ভাই দুটি পেয়ে আমাদের ভুলেই গেছেন। ছি: ছোট ভাইদের হিংসে করতে নেই—তাঁর মুখে সুন্দর একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো।

সুনির্মলের সামনে বসে বললেন তিনি, তুমি বড় লজ্জা করছো। না না—বলতে বলতে সুনির্মলের কান আরো লাল হয়ে উঠলো।

সব শেষ না করে উঠতে পাবে না বুঝেছো।

সুধীর, সুনির্মলের দিকে হেসে বললে বড় শক্ত ঘানি, পার পাওয়া দায়।

খাওয়ার শেষে একটা করে পান সকলের হাতে দিতে দিতে বললেন সোনাদি, এখানে খাবার খুব কষ্ট ভাই—কিন্তু কি করবো শহর অনেকটা দূর—গ্রামে কিছুই মেলে না।

থাক সোনাদি। ওসব বললে এরপর চলে যাবো। সুধীর তাঁর দিকে চেয়ে বললে।

অমিতাভ লক্ষ্য করলে সোনাদির কথায় এ দেশের টান নেই। ফেরার সময় সে জিজ্ঞেস করলে সুধীরকে—সোনাদির বাড়ি কোথায় সুধীরদা?

বিলেত!—এই মাত্র ওঁরই বাড়িতে খেয়ে এলে বুদ্ধিমান।

কিন্তু কথা বলার...

প্রশ্নের আসল দিকটা বুঝে বললে, মেদিনীপুর শহরে বাপের বাড়ি—এখানে শশুর বাড়ি। বুঝেছো?

॥ ৭ ॥

শীর্ণ স্রোতস্বিনী : চৈত্রের দেউলিয়া নদী চলেছে ধীর মন্থর গতিতে সমুদ্র মিলনে ; অহঙ্কারে স্ফীত নয়, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে মদ গর্বিত গতি নয় ; এ যেন আত্মত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল, লজ্জা-জড়িত সার্থক মিলনের আনন্দে কল-কল ধ্বনি মুখরিত অভিসারে যাত্রা।

সমুদ্র দূরে নয় : তার প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে লবণাক্ত ঝোড়ো হাওয়ায়, আর এ তল্লাটের বাসীন্দাদের উদার প্রশস্ত মানসক্ষেত্র।

নদীরই বুকের চড়ায় ব'সে, স্রোতের দিকে চেয়ে অমিতাভ : যে সংগ্রাম শুরু হলো আজ, তারই অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত। নূতনত্বের কৌতূহলে ভরা সমগ্র পরিবেশ।

নুন সংগ্রহ করার করণীয় খুঁটিনাটি সেরে ডাকলে সুধীর, এসে বসো তোমরা চারপাশে, ওদের আসার সময় হয়ে গেছে।

সবাই গিয়ে ঘিরে বসলো, গ্রাম্য পদ্ধতিতে নুন করবার জন্যে গড়া খেলাঘরের উনুনের মত ঢিপিগুলোর সামনে।

বাঁশি বাজলো : কাটা কাটা তীব্র কম্পিত। সুধীর আদেশ দিলে, প্র—স্তুত্। পুরাতন সত্যাগ্রহীদের মুখে ফুটে উঠলো একটা রুক্ষ দৃঢ়তা ; নবাগতদেব মুখে,—কৌতূহল ভাবালুতা ও চঞ্চলতা।

তারা পরস্পরের হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে, জড় হয়ে নুনের ঢিপির ওপর ঝুঁকে পড়লো। দারোগার ইঙ্গিতে পুলিশদল সাবধানী পদক্ষেপে এসে ঘিরে দাঁড়ালো সত্যাগ্রহীদের।

নিম্নস্বরে সুধীর বললে, ওরা ভাঙতে এলেই শুয়ে পড়বে।

দারোগা আদেশ দিলেন, তোড় দেও। নিমক ছিন লেও।

পুলিশদের বিরক্ত মুখগুলোয় অনিচ্ছাজনিত শিথিলতা : তারা নিচু-গলায় ভাঙা বাংলায় বললে সত্যাগ্রহীদের, উঠিয়ে বাবু উঠিয়ে, কেয়া

মুস্কিলকা বাত। অমিতাভ তাদের গলার-স্বরে অবাক হয়ে গেল; সুধীর শক্ত করে ধরলো তার হাতটা।

পুলিশদল খুঁজতে লাগলো কোন ফাঁকে লাঠি গলিয়ে নুনের ঢিপি গুলো ভাঙবে; হাড়মাংস চাপাচাপিতে নিরেট হয়ে গেছে। একজন বললে, আরে বাবা থোড়া নিমককা লিয়ে এৎনা তখলিপ, ছোড় দেও বাবু, ছোড় দেও।

অমিতাভ ভাবলে, স্বত্বভাবে বঞ্চিত ভারতবর্ষ এক মুঠি বে-আইনী নুন মুষ্টিবদ্ধ করে তার কতবড় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে সে মর্ম এখনও এরা বঝেনি তাই ওকথা বলছে।

দেরী দেখে পাড়ের ওপরে দাঁড়ানো দারোগা চেঁচিয়ে উঠলেন, জল্‌দী কাম সারো!

পুলিশরা সত্যাগ্রহীদের হাত ধরে টানাটানি শুরু করলে;—দম ধরে মাটি কামড়ে পড়লো তারা।

কুছ্ কাম কা নেহি!—বলতে বলতে নেবে এলেন দারোগা। পুলিশের হাত থেকে একটা লাঠি নিয়ে নির্দয়ভাবে সেটা চালিয়ে দিলেন অমিতাভ সুধীরের পায়ের ফাঁকে—তারপর একটা সজোরে চাড়া দিতেই সত্যাগ্রহীদের হস্ত-বন্ধন খুলে গেল, বেদনায় কাল হয়ে উঠলো সকলের মুখ। পুলিশের দল, আরো গোটা কতক লাঠি-চালিয়ে নুনের ঢিপিগুলো ভেঙ্গে দিলে। দারোগা একটা ধাক্কা মেরে বিভুতিকে ফেলে দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

পুলিশদল অদৃশ্য হয়ে যাবার পর হেসে বললে সুধীর, কিছুটা আজও বাঁচিয়েছি!

আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি ভাই, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রত্যেকটি ভারতবর্ষীয়, এই সামান্য খানিকটা নুন মুষ্টিবদ্ধ করে তুলে ধরেছে, স্বাধীনতার গোড়াপত্তন হিসাবে। এই সামান্যর মধ্যে অসামান্য সম্ভাবনা। শুধু নিঃস্বার্থ, সাহসী নেতৃত্ব আজ ভারতে নব যুগের সূচনা করে দেবে।

॥ ৮ ॥

মিত্তির বাড়ির ছাতের ওপর চলেছে বঙ্গীয়-ছাত্র-সমিতির তরফ থেকে একটি ঘরোয়া গোপন বৈঠক। আলোচনায় ঠিক হয়ে গেল গোপনতা বজায় রেখে তারা সক্রিয়ভাবে যোগ দেবে আইন অমান্য আন্দোলনে। তাদের প্রধান কাজগুলি হচ্ছে,—সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চালাবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ, সংগ্রামের সঠিক খবর প্রচার, বিলাতী-দ্রব্য-বর্জন আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা।

অমিয়কান্তি, ভুতো, ললিত এবং অন্যান্য গুটিকতক সহপাঠি আজ এই ঘরোয়া বৈঠকে হাজির। একটা-কর্মসূচী ঠিক হয়ে যাওয়াতে তারা বেশ উৎসাহিত।

আলোচনার শেষে ভুতো বললে, জানিস কাল আমি একটা চমৎকার ব্যাপার দেখেছি?

সমস্বরে সবাই বললে, কি?

কলেজ স্কোয়ারে সরবতের দোকানে একজন পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাতেই তার পাশে অন্য যেসব লোক ছিলো তারা উঠে গেল—ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলেন। উৎফুল্লকণ্ঠে বললে ললিত।

সত্যি! সিগারেট বয়কট একদিনে হয়ে গেল, একি কম কথা, কাউকে বলতেও হয়নি!

হেসে বললে অমিয়কান্তি, আমার সাহেব কাকা দেখছি বিলাতী চুরুট ছেড়ে দিশি সরু চুরুট খেতে আরম্ভ করেছেন। সেদিন চাকরটা কি একটা বিলিতি জিনিস এনেছিলো বলে তাকে মারেন আর কি!

একজন বেঁটে খাটো ছেলে বলে উঠলো, আর এই তকলি। বাসে, ট্রামে, রাস্তায়, ঘরে সবাইয়ের হাতেই ঘুরছে।

তা হলে আজকের মত বৈঠক ভাঙ্গা যাক। বললে অমিয়কান্তি সকলের দিকে চেয়ে। সবাই একে একে উঠে দাঁড়ালো।

ললিত জিজ্ঞেস করলে, অমি মিনটুর মায়ের খবর কি ?

এখন সামলে নিয়েছেন, মিনটুর একটা চিঠি এসেছে, সে ভাল আছে রোজ নুন তৈরি করছে।

সবাই চলে যাবার পর অমিয়কান্তি সিঁড়ি দিয়ে নিজেদের অংশে নেবে গেল তার পড়ার ঘরে। বৈঠকখানা থেকে ডাকলেন রামকালী বাবু, অমি এদিকে শুনে যাও!

অমিয়কান্তি গিয়ে দাঁড়ালো পিতার সামনে। রামকালীবাবু তাকে হাতের ইঙ্গিতে বসতে বললেন, বসো তোমার সঙ্গে কথা আছে।

অমিয়কান্তি জড়সড় হয়ে বসলো, বাবার কণ্ঠস্বর আজ বিশেষ অর্থ-পুর্ণ। খানিকটা থেমে বললেন তিনি, দেখ অমিয় তোমার বয়স কম এখন লেখাপড়া করার সময়। এমন সময় ডেকে এই কথাটি শোনাবার মানে খুঁজলে অমিয়কান্তি, তিনি চারিদিকে চেয়ে নিয়ে বললেন আবার, আমি শুনলুম তুমি কতকগুলো স্বদেশী ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করছো, এমনকি সময় মত বাড়ি আসছো না, মিটিং করে বেড়াচ্ছ—তোমরা যে নিজের মঙ্গল বোঝ না এটা বড় দুঃখের ব্যাপার।

কোন কিছু না বলে অমিয়কান্তি ভেবে নিতে চেষ্টা করলো কার খবরে কথাগুলো বাবার জানা সম্ভব হয়েছে। তাকে নীরব থাকতে দেখে ধমকের সুরে বললেন, রামকালীবাবু, চুপ করে রইলে কেন, উত্তর দাও ?

আমি এমন কিছু করি না যাতে পড়ার ক্ষতি হতে পারে।—কঠিন সুরে বললে সে।

করো না মানে ? এই তো তোমার ছোটকাকা দেখেছেন তুমি খদ্দরপরা কতকগুলো স্বদেশী ছেলে নিয়ে ছাতে মিটিং করছিলে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে অমিয়কান্তি একটা কড়া জবাব সংযত

করে নিলে। নির্মম কাঠিন্য ফুটে উঠলো তার মুখে। রামকালীবাবু একটু শান্ত-স্বরে বললেন, দেখ, খদ্দর পরো, চরকা কাটো, স্বদেশী-জিনিস ব্যবহার কর, তাতেই দেশের অনেক কাজ করা হবে। পড়াশুনা করার সময় হুজুক করা কি ভাল?

ব্রজেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, তা ছাড়া ওই মিনটুর বাড়িতেই ওর অত ঘন-ঘন যাবার প্রয়োজনটা কি? ওরা আমাদের ভাড়াটে।

বিরক্তিতে অমিয়কান্তি মাথাটা ঘুরিয়ে নিলে। তার মুখের অবাধ্য ভাব দেখে রামকালীবাবু একটু ভীত হয়ে পড়লেন: আজকালের ছেলেদের বিশ্বাস নেই। স্বদেশীর হুজুগে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে কতক্ষণ! তিনি নরম গলায় যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, দেখ বাপু স্বদেশীই করো আর যাই করো লেখাপড়া শেষ না করলে কেউ আমলই দেবে না। তুমি ভালকাজ করতে চাইলেও কেউ মানবে না। এই দেখ না,—মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, সবাই বড় বড় পাশ করে তবে নেমেছেন, তাই লোকেও তাদের মানে, স্বদেশী-করা খারাপ তা তো বলছি না—পাশ-টাশ করে যা খুশি করো কেউ বারণ করবে না—প্রাণ ভোরে স্বদেশী করো।

দম নিলেন তিনি। অমিয়কান্তি মনে মনে বললে—স্বদেশী-করা! বিদেশী করা!—এইজাতীয় কথার ব্যবহার তার কাছে হাস্যকর ঠেকলো; অদ্ভুৎ কথার ঢং! যেন জোর করে একটা কিছু করার আছিলাতেই কথাটার সৃষ্টি—স্বাভাবিক সত্য কিছু নেই।

ছেলেকে নির্বাক হয়ে বসে থাকতে দেখে রামকালীবাবু বললেন, তোমার ভালর জন্যেই বলা, এখন যা ভাল বঝো করো।

অমিয়কান্তি মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় যাবার সময় শুনতে পেলে ছোটকাকা বলছেন, 'ওই মিনটু ছোঁড়াটাই ওর মাথাটা খেয়েছে, বুঝেছো দাদা।

॥ ৯ ॥

একটু বেলা করে আজ অমিতাভ বেরোচ্ছিল ডেরাটার থেকে, গলির মোড়ে যেতেই সোনাদির ডাক শুনতে পেলে, আজ নাই-বা যেতে অমিতাভ।

সে ফিরে তাকালো। তিনি বললেন, কাল রাত্রে কিছু খাওনি, শরীরটাও খারাপ আজ বিশ্রাম করো নুন করা পালিয়ে যাবে না।

হেসে বললে সে। সকালে আমি ভালই আছি। কিছু হবে না, এখুনি ফিরে আসবো সোনাদি।

তাঁর মুখখানা ম্লান হয়ে এলো, অভিমানের সুরে বললেন, ভাল যে কেমন তা মুখ দেখেই মালুম হচ্ছে।

না না আপনি কিছু ভাববেন না—বলতে বলতে এগিয়ে গেলো সে।

যেতে যেতে সোনাদির কথাই ভাবতে লাগলো : অশিক্ষিতা গ্রাম্য স্ত্রীলোক যে পরের জন্যে এতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারে স্বচক্ষে না দেখলে অবিশ্বাস্য থেকে যেত। যত দিন যাচ্ছে এর মহত্ত্বের নব নব রূপ তার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। নিজের পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্বামী ও অতি বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবায় সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকলেও, কোন দিনের জন্যে সত্যাগ্রহীদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অমনোযোগিতা সে লক্ষ্য করেনি। গ্রামের সমস্ত চাষী মিলে চাঁদা দিয়েই খালাস, তারপর সত্যাগ্রহীদের যা কিছু ব্যবস্থা সব সোনাদি। দিনের পর দিন বিনা দ্বিধায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, কেউ কোন দিন মুখে বিরক্তির আভাস পায়নি।

সুধীরদা সেদিন বলেছিলেন, কলকাতায় এ জিনিস সহজলভ্য নয়, দেখে নাও গল্প করতে পারবে। শহুরে সভ্যতায় মেকি বেশি, আছে মনের দৈন্য, নিষ্ফল গর্ব, আর স্বার্থপরতা গোপন করার নানা চতুর চেষ্টা। সবারি সেখানে গুণের সামিল।

কথাগুলো ঠিক হলেও সবটা অমিতাভ মেনে নিতে পারে না। সোনাদিকে ভাবলে তার সুজাতাদিকে মনে পড়ে যায়। বাইরে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও ওরা যেন একই সূত্রে গাঁথা। একদিকে স্নেহাতুর, অন্যদিকে শৃঙ্খলিতা বিদ্রোহী। পাশাপাশি আরো দুটো মুখ ভেসে ওঠে, এঁরাও কি এক ?

অমিতাভ নদীর পাড়ে এসে পড়লো। অন্যমনস্ক ভাবে নেমে গিয়ে দাঁড়ালো ছেলেদের পাশে।

সুধীর তাকে দেখে বললে, আজ তুমি না এলেই পারতে অমিতাভ, আমরা তোমাকে ওই জন্যেই ডেকে আনিনি।

এখানে আসাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে না এসে পারলুম না সুধীরদা।

সুধীর কোন কথা না বলে ঢিপি করার কাজে মন দিলে।

পাড়ে দেখা গেল পুলিশের দল। অভ্যস্ত সত্যাগ্রহীরা মুহূর্তে সাজিয়ে নিলে নিজেদের ঢিপির চারিদিকে। সুধীর চকিতে পাড়ে দাঁড়ানো দারোগার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললে, আলি সাহেব এসেছে—সাবধান।

অমিতাভ সুখময়ের মুখে একটু চঞ্চলতা লক্ষ্য করে বললে তার হাতটা চেপে ধরে, এখনও ভয় ? ছি সুখময়।

আলি সাহেব বেত দোলাতে দোলাতে নেমে এলো: পিশুন মুখ বসন্তের দাগে ভর্তি, নাকের গোড়াটা ভাঙ্গা, ডগাটা উঁচু; ডেবডেবে লাল চোখ, চোয়ালের হাড়গুলো থেকে চিবুক পর্যন্ত নেবে এসেছে একটা হিংস্র কুঞ্চন।

নিস্তব্ধ ছেলের দল পরস্পরকে আঁকড়ে বসে আছে; পুলিশরা তাদের ঘিরে দাঁড়ালো।

চিৎকার করে উঠলো আলি সাহেব, শুয়োরের বাচ্ছারা, ঘরে ভাত নেই এখানে এসেছে মরতে, আর আমাদের জ্বালাতে।

সপাং শব্দে বেতটা এসে পড়লো বিভূতির কাঁধে ; থর থর করে কেঁপে উঠলো সমস্ত শরীরটা, চোখ বুজে গেল তার। তেরি... বলে একটা অকথ্য গালাগাল দিয়ে আলি সাহেব বেত চালাতে শুরু করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের তরবারি ঘোরানোর অনুকরণে বেত ঘুরতে রইল ডাইনে, বামে! অন্যদিকে অবশ্য সর্বংসহা মাটিকেও লজ্জিত করে অসাড় হয়ে পড়ে আছে সত্যাগ্রহীরা।

অমিতাভ মুখ গুঁজে মাটিতে পড়ে রইল : সপাং সপাং শব্দের ছন্দে, তার দেহে একটা করে শিহরণ হচ্ছে, পিঠের ওপর যেন শত শত ক্রুদ্ধ বোলতায় হুল ফোটাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চিপে সে নিশ্বাস বন্ধ করলে। খানিক পরে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় গড়াতে গড়াতে নদীর কিনারে গিয়ে পড়লো, তারপর গাঢ় অন্ধকার, সংজ্ঞাহীন নিরবতা।

আলি সাহেব থামলেন : ক্লান্তিতে তার হাতটা ঝুলে গেল, কপাল দিয়ে গলগল করে ঘাম গড়িয়ে তার বিভৎস মুখটা আরো হিংসালু করে তুলেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে লক্‌লকে জিবটা দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে তিনি হুকুম দিলেন পুলিশদের, চলো। তারপর টলতে টলতে পাড়ের ওপর উঠে গেলেন।

বহু কষ্টে ঘাড়টা তুলে হাঁকলে সুধীর, সুনির্মল, বিভূতি, সুখময়, অমিতাভ। সবাই আস্তে আস্তে মাথা তুলে উঠে বসলো, অমিতাভ ছাড়া।

নরনারী নির্বিশেষে গ্রামের সমস্ত লোক এসে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের মুখে বেদনা, ঘৃণা, ক্রোধ যেন একই সঙ্গে ফুটে বেরোচ্ছে।

পিঠের জ্বলন্ত রেখাগুলোর কথা ভুলে সত্যাগ্রহীরা অজানা আশঙ্কায় ছুটে গেল অমিতাভর কাছে।

॥ ১০ ॥

জ্বরের ঘোরে পড়ে আছে অমিতাভ, সোনাদি বাতাস করে চলেছেন।

জড়তা মাখান চোখে সে চাইলে ; তার কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন সোনাদি,—এখন কেমন আছ ভাই ?

মুখে কোন উত্তর না এসে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো ; সোনাদি বললেন,—বললুম বেরিয়ে কাজ নেই, তা তো শুনলে না। এখন দেখতো, গাটা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

মানিক এসে চুপিচুপি সোনাদিকে কি বললে ; সোনাদি তাড়াতাড়ি পাখাটা রেখে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

অমিতাভর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, সারা দেহে আগুন জ্বলছে। চোখের সামনে সব কিছুই হলদে হয়ে আসছে। সে পাশ ফিরে চোখ বুজলো ; তার মনে, মা, বাবা, রুনু, অমি, কত মুখ ছায়াচিত্রের মত আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে মনে এলো ঢেউয়ের দোলা লাগা বয়াটা—এই মুহূর্তে সে যদি একবার যেতে পারতো। ভাবতে ভাবতে মনে হলো মা, বাবা, অমি, রুনু সবাই তাকে ঘিরে বসে আছে। আঃ।

এদিকে বাড়ির সামনে গলির মুখে চলেছে দারুন গোলমাল। গ্রামের অধিকাংশ চাষী এসে জুটেছে। দাওয়ায় বসা বৃদ্ধ মানিকের ঠাকুরদা হাত মুখ নেড়ে একজন দারোগাকে, কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন। দারোগা বলছে চড়া গলায়,—আমরা খবর পেয়েছি এইখানেই স্বদেশী ছেলেগুলো আড্ডা গেড়েছে। বল কোথায় তারা নয়তো তোমাদেরই ফল-ভোগ করতে হবে।

সেই সময় মানিক এসে ভিড়ের মধ্যে একজন চাষীকে কি যেন

বললে ; তার কথা শুনে চাষীটি, দারোগাকে লক্ষ্য করে বললে,—এত গোলমাল কেন হুজুর—ভেতরে গিয়ে দেখে নিন না।

বেশ চলো!—ঘুরে বললেন দারোগা।

পুলিশদল সঙ্গে নিয়ে তিনি গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক সন্ধান করে শেষে পুলিশদল গিয়ে দাঁড়ালো সত্যাগ্রহীদের ডেরাটার সামনে। একবার একটু ইতস্তত করে দরজার শেকল খুলে দারোগা ভেতরে গেলেন।

ফাঁকা ঘর খাঁ খাঁ করছে, এমন কি সত্যাগ্রহীদের ব্যাগগুলো পর্যন্ত কে সরিয়ে ফেলেছে!

দারোগা প্রশ্ন করলেন,—ফাঁকা ঘরে চাটাই পাতা কেন?

আজ্ঞে ঘরটায় আমাদের যাত্রার দলের আখড়াই হয়!—মাথা চুলকোতে চুলকোতে উত্তর দিলে একজন চাষী।

কুঞ্চিত কপালে দারোগা ফিরে চাইলেন।

ফেরার পথে দারোগার চোখে পড়লো,একটা ঘরের দরজার সামনে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে, একাগ্রচিত্তে তাদের লক্ষ্য করছে! সন্দেহের তড়িৎ খেলে গেল মনে ;—আপনার থেকেই পাগুলো তার এগিয়ে গেলো সেই দিকে।

দারোগাকে আসতে দেখে সোনাদির মুখখানা মলিন হয়ে উঠলো ; দরজার দুদিকে দুটো হাত রেখে তিনি চাইলেন। অন্য দিকে চেয়ে দারোগা বিনীতভাবে বললে,এই ঘরটা আমি একবার দেখতে চাই।

ওখানে কি দেখবেন বাবু ওটা মেয়েছেলের ঘর!—পেছন থেকে সমস্বরে বলে উঠলো চাষীর দল।

না আমায় দেখতে হবে পথ ছাড়ুন!

পাথরের মত নিশ্চল সোনাদি দরজার চৌকাট জোরে চেপে ধরে বললেন, এ আমার ঘর এখানে আমি কাউকে যেতে দেব না!

নিজের ঠোঁটে একটা কামড় দিয়ে দারোগা চেঁচিয়ে উঠলেন, সোরে যাও বল্‌ছি নয়তো আমায় জোর করে ঢুকতে হবে।

সোনাদির শরীরটা তখন থরথর করে কাঁপছে, মাথার ঘোমটা খসে রাশি রাশি কাল চুল সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠছে বুকটা। বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরেছেন চৌকাট।

হারামজাদী স্বদেশীদলে ঢুকেছে! ওরা তোর কোন জন্মের ....কথাটা চেঁচিয়ে শেষ করলে একটা অকথ্য কথা জুড়ে।

অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন সোনাদি দারোগার দিকে।

জ্বরের ঘোরে চমকে উঠলো অমিতাভ। অপচ্ছায়ার মত দৃশ্যটা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে।

দাঁড়া তোর স্বদেশীপণা ছাড়াচ্ছি!

সজোরে একটা চড় এসে পড়লো সোনাদির মুখে! প্রচণ্ড উত্তেজনায় দুর্বল শরীরটা তুলতে গিয়ে অমিতাভ পড়ে গেল মুখ গুঁজে।

এক ধাক্কায় সোনাদিকে মাটিতে ফেলে প্রায় তাঁকে মাড়িয়ে ঘরে ঢুকে গেল দারোগা।

চাষীরদল একটা হিংস্র চিৎকার করে উঠলো!

দারোগা ভেতরে উল্লাসে হাঁকলো,—এই যে একশালা শুয়ে! শালা আবার গোঁ গোঁ করছে।

উন্মাদের মত হাতড়াতে হাতড়াতে এসে নিজের শরীরটা দিয়ে অমিতাভকে ঢেকে মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন সোনাদি,—একে মেরো না তোমরা! জ্বরের ঘোরে বেহুস্‌ হয়ে পড়ে আছে—একে ছেড়ে দাও! একে ছেড়ে দাও!

থমকে গিয়ে দারোগা একবার সোনাদির মুখের দিকে চাইলে, তারপর ধীরপদে বেরিয়ে গেল—গলি পেরিয়ে সোজা রাস্তায়!

চাষী একজন বলে উঠলো,—যাও বাছা কি করবো, গান্ধীজির নিষেধ নয়তো ফিরতে হতো না!

॥ ১১ ॥

জাতীয় সংগ্রামের উচ্চতম গৌরবমুহূর্তে, কলকাতার জীবনস্পন্দন বিবর্দ্ধিত হয়ে চলেছে।

বাংলার একপ্রান্তে, সমুদ্রসৈকতে অহিংস সংগ্রামের চরম অগ্নি-পরীক্ষা, অপরপ্রান্তে, চট্টগ্রামের পর্বতমালার নিস্তব্ধ অটবী ভেদ করে স্বপ্নবিভোর কৈশোরের অনিরুদ্ধ বাসনার আত্মঘাতী বিস্ফোরণ।

গভীর রাত্রে, বাস্তব কলকাতার রূপান্তর ঘটেছে। বগলে একটা করে প্রচার পত্রের বাণ্ডিল নিয়ে অমিয়কান্তি, নির্মল বেরিয়ে গেল হোস্টেলের পাঁচিল টোপকে ; দারোয়ানটা তখন রোয়াকের ওপর পড়ে নাসিকার সাহায্যে শঙ্খধ্বনি করছে।

তাদের নির্দিষ্ট এলাকায় লোকের সংবাদপত্রের চাহিদা মিটিয়ে, কোথাও জানলা গলিয়ে ফেলে, কোথাও দেওয়ালে লটকে তারা ফিরলো। ক্লান্ত তড়িৎপদে হোস্টেলের পাঁচিল টপকাবার সময় অমিয়কান্তি দেখতে পেল, চোরের মত একজন লোক যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করে চিন্তিতপদে উঠে গেল পূর্বের ঘরে।

পা ছড়িয়ে শুয়ে তক্তপোশটার ওপর কখন যে অমিয়কান্তি ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না, একটি ছাত্রের ঠেলাঠেলিতে তার ঘুম ভাঙ্গলো। নিচু গলায় সে বললে, পুলিশে হোষ্টেল ঘেরাও করেছে!

বাইরের লোকের তো এখানে থাকার নিয়ম নেই, অমিয়কান্তি ঘাবড়ে বললে,

না। মেসিনটাকে আর তোমাকে দেখতে পেলেই সব ধরা পড়ে যাবে।

এখন উপায় ?

ঘরে এলেন হোষ্টেলের ওয়ার্ডেন, চেহারায় স্রষ্টা-প্রকৃতির অবজ্ঞার লক্ষণ সুস্পষ্ট। চেহারার জন্যেই হোক বা যে-কারণেই হোক ছেলেদের কাছে ইনি মোটেই প্রিয়পাত্র নন,—বরং নানা হাস্যকর নামের গৌরবে ইনি ছাত্রমহলে পরিচিত।

গুরুগম্ভীর গলায় বললেন তিনি, দেখ যদি কোন গোলমাল থাকে, আমাকে গোপন করো না, জানলে হয়তো তোমাদের কিছু সাহায্য করতে পারি।

নির্মল সাহস করে একটা ঢোক গিলে বললে, স্যার, একটা মেসিন আর এই ছেলেটি। চকিতে একবার অমিয়কান্তির দিকে চেয়ে বললেন তিনি, মেসিন নিয়ে আমার সঙ্গে চলে এসো। অমিয়কান্তি গেল তাঁর পেছনে ওয়ার্ডেনের নিজস্ব অংশটার দিকে। পুলিশের ভারী বুটের শব্দ তখন সিঁড়িতে শোনা যাচ্ছে।

প্রকাণ্ড-হোষ্টেলের সমস্ত ঘরগুলো তছনছ করে খুঁজে পুলিশ এসে দাঁড়ালো ওয়ার্ডেনেব দরজার গোড়ায়।

ওয়ার্ডেন তাদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। সামনেই বসবার ঘরে অমিয়কান্তিকে খাটের ওপর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন দারোগা, ইনি কে?

দ্বিধাহীন ঔদাসিন্যের সুরে ইংরাজিতে বললেন ওয়ার্ডেন ইনি আমার কাজিন, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার জন্যে বিদেশ থেকে এসেছেন—অসুস্থ, নাম বিজয় বাজপায়ী। পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লো দারোগা। অমিয়কান্তি আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে হাসি সংবরণ করছে তখন।

খানিক পরে ফিরে এসে বললেন দারোগা, কিছু মনে করবেন না, ছেলেদের সম্বন্ধে একটু সজাগ থাকবেন যা দিন কাল।

নিশ্চয় নিশ্চয় লক্ষ্য রাখতে হবে বইকি। মাথা নেড়ে বললেন ওয়ার্ডেন। পুলিশের দল চলে গেল।

ঘরে এসে ঢুকলো নির্মল ইত্যাদি ছেলের দল, অমিয়কান্তি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো।

গম্ভীরভাবে বাড়ির ভেতর থেকে মেসিনটা এনে ছেলেদের হাতে দিতে দিতে বললেন তিনি, যাও এটা সরিয়ে দাও, এরপর আর আমি সামলাতে পারবো না বলে দিচ্ছি।

যাঁকে চিরকাল অশ্রদ্ধা করে এসেছিলো তাঁর মহত্বের নিদর্শন পেয়ে পরমোৎসাহে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ছেলের দল। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে তাদের মন।

॥ ১২ ॥

বাংলার গোপনতম পল্লীস্রোতস্বিনীর ধারে দৈনিক হয়ে চলেছে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ বিকাশ।

তুচ্ছ ঘটনার অন্তরালে বৃহত্তর সম্ভাবনা নিয়ে রোজকার মত আজও বসে সুধীর, অমিতাভ, বিভূতি, সুখময়, সুনির্মল।

সামান্য মাটির ঢিপির মধ্যে জীবনের মূল্যবান মর্মকথাকে মুক্তি দেবার মানসে যেন পাঁচটি জাটায়ু পক্ষ-বিস্তার-করে, ধীরে ধীরে স্ফুটনোন্মুখ তাদের অতি প্রিয় ভবিষ্যৎকে বলদর্পী রাবণের শ্যেন-দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায়।

শালারা একটা দিনও কি কামাই দেবে না! চাবুকের চোটে পিঠে দগ্‌দগে ঘা হয়ে গেল তবু তেলানি যায়নি, দাঁড়াও আজ দেখাচ্ছি! পাড়ে আগত দারোগা চিৎকার করে উঠলো।

বেতটা হাওয়ায় ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে নেবে এসে দারোগা অমিতাভর ফতুয়াটা একটা হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেললে, তারপর আদেশ করলেন পুলিশদের, সব শালাকো কাপড়া ফাড়ো।

চমকে উঠলো সত্যাগ্রহীরা; অমিতাভর মুখেও কিসের যেন চাঞ্চল্য। নিজের শরীরটা আপ্রাণ-শক্তিতে গুটিয়ে সে দম ধরে পেটের কাপড়ের বাঁধনটা শক্ত করে নিলে। পুলিশবাহিনীর চললো ধস্তাধস্তি।

দুঃশাসনের দ্বারা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সম্ভব হয়নি: হয়তো নারী বলেই ব্যাসদেবের কিছুটা দুর্বলতা ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে পুরুষ, এবং এমন পুরুষ যাদের মন্ত্র: রাগ, লজ্জা, ভয় তিন থাকতে নয়, কাজেই দ্বাপরের পরাজিত গ্লানি মুছে গেল কলিতে, অন্য ছদ্মবেশে।

অল্প সময়ের মধ্যেই সত্যাগ্রহীদল সমতল ভূমিতে নাগা সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করলো।

বিভূতি, সুখময়ের এলো এক দুর্বল মুহূর্ত। তারা ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিলে নদীর জলে। আবক্ষ জলের মধ্যে তাদের মস্তক নত হয়ে পড়লো। বাকি তিনজন বসে রইল, অটল অচল। অমিতাভ চাপাকণ্ঠে বললে, বিশ্বাসঘাতক!

সুধীর অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো বিভূতি সুখময়ের দিকে।

দারোগা চেঁচিয়ে উঠলেন, নির্লজ্জ বেহায়াগুলো তবু বসে!

আশা করেছিলো নুতন চালে আজ জয়ী হবে—ক্ষিপ্ত হয়ে বাতাসে শিস্ দিতে দিতে বেতের বাড়ি চললো উলঙ্গ, নিস্পন্দ দেহ তিনটের ওপর।

বেতের শিস্ বন্ধ হতেই সবাই শুনলে, দারোগা বলছেন, শালা লোককো দরিয়ামে ফ্যেকো!

উলঙ্গ মূর্তিগুলো তার চোখেও অসহ্য লাগছে; দারোগা নিজেই সুনির্মলকে হেঁচড়ে নদীর জলে ঠেলে দিলে। অন্য পুলিশেরা বাকী দুজনকে টেনে নিয়ে ফেললো।

ক্ষতস্থানগুলোতে বৈদ্যুতিক আঘাত পাওয়ার মত জ্বলন্ত অনুভূতি তিনজনেরই শরীরকে কাঁপিয়ে দিলে।

পাড় বেয়ে ফিরলো দারোগা পুলিশের দল।

সুধীর বললে বিভূতি, সুখময়কে লক্ষ্য করে, এতো দুর্বল মন নিয়ে সত্যাগ্রহী হওয়া উচিত হয়নি।

ভর্ৎসনার সুর চাবুকের চেয়ে জোরে এসে লাগলো দুজনকে, বিভূতি বললে লজ্জিতকণ্ঠে, আমায় ক্ষমা করো সুধীর আর কখনও হবে না।

সুখময়ও কি বলতে যাচ্ছিলো তাকে থামিয়ে দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বললে অমিতাভ, দেখ সুধীরদা, আমাদের এখন কাপড়ের দাবী নিয়ে পুলিশের কর্তাদের সামনে হাজির হতে হবে। পিছাবনী থানার সামনে আমরা এই অবস্থায় সত্যাগ্রহী দাবী তুলবো—কাপড় দাও।

সুধীরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সে বললে, ঠিক বলেছ। যদি এরকম কিছু না করি ওরা শুধু কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়েই আমাদের সংগ্রামকে দুর্বল করে দেবে। চলো ওই পুলিশদের পেছনে পেছনে।

জল ছেড়ে পাঁচজন নাগা উঠলো নদীর পাড়ে। কণ্ঠে তাদের ধ্বনিত হয়ে উঠলো রণোল্লাস—বন্দেমাতরম্। কম্পিত প্রতিধ্বনি ভেসে গেল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। চারিদিকে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা এসে জমা হয়ে লক্ষ্য করছে সত্যাগ্রহীদের। সম্মুখে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলা পুলিশের দল একবার ফিরে তাকালো। সুধীর বললে, তাড়াতাড়ি চলো ওদের সঙ্গ নিতে হবে।

অগ্রগামী পুলিশ দলের দিকে দৃষ্টি রেখে তারা গতিবেগ প্রাণপণ শক্তিতে বাড়িয়ে দিলে। একটু দূরে তাদের পেছনে পেছনে চললো গ্রাম্য চাষীরদল। তাদের দিকে লজ্জিতভাবে একবার চাইল অমিতাভ, তার ধারণা ছিলো ওরা বুঝি হাসছে এই অত্যদ্ভুৎ দৃশ্য দেখে। কিন্তু তার চোখে পড়লো, ওদের মুখে হাসির কোন চিহ্ন নেই, আছে শুধু বেদনাহত, বিক্ষুব্ধ মনের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আর আত্মসংযমে দমিত হিংস্র বিপ্লব-বহ্নি। অমিতাভর মন আনন্দে নেচে উঠলো, তারা জয়ী হবেই হবে।

সুধীর হেসে বললে, দেখ পুলিশগুলো কি রকম ফিরে ফিরে চাইছে আর জোরে জোরে হাঁটছে। এ যেন আমাদের পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারী শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন।

থানার সামনে এসে নাগা শোভাযাত্রা থামলো। সংকুচিত, ত্রস্ত পুলিশদল ত্বরিত পদে ঢুকে পড়লো তাঁবুগুলোর মধ্যে। এতটা হবে এ বোধ হয় তারা আশা করেনি, তাদের মধ্যে সভ্যমানব মন বুঝিবা অনুশোচনার চাবুক চালাচ্ছে।

থানার সামনে মাটিতে বসে পড়ে সত্যাগ্রহীদল চিৎকার করলো, কাপড় চাই—কাপড় দাও।

ভেতর থেকে একজন পদস্থ কর্মচারী রাগে গরগর করে বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, একটা ঢোক গিলে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নরম গলায় বললেন, কেন গোলমাল করছো। চলে যাও।

চিৎকার উঠলো, যেতে আমরা প্রস্তুত, কাপড় দাও।

নিস্ফল আক্রোশে জুতোটা মাটিতে ঠুকে তিনি ভেতরে ফিরে গেলেন—ভেতর থেকে আদেশ শোনা গেলো, মারকে হাটা দেও। কে একজন পুলিশ উত্তর দিলে, সরম লাগতা সাব্ এ ক্যাইসে হো স্বাক্তা।

বাহিরে চিৎকার বেড়ে উঠলো, বন্দেমাতরম্, কাপড় দাও।

এই গোলমালে পুকুরের ওপারে পিছাবনী শিবিরে সাড়া পড়ে গেছে। যত সত্যাগ্রহীরা সেখানে এই নাগা দৃশ্য দেখবার জন্যে উঁকি ঝুকি মারছে আর মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপছে। ব্যতিব্যস্ত ঈশ্বরবাবু, এই দৃশ্য দেখতে না দেওয়ার অক্ষম চেষ্টায় ছেলেদের কোন রকমে সামলাতে না পেরে শেষে শিবিরের বাইরের দিকের দরজাটায় শেকল তুলে দিলেন। কড়া নীতিবিদ্ ঈশ্বরদার বর্তমান অবস্থা দেখে মায়া হলো অমিতাভর, এমন কি তিনি নিজে একবারও নাগাদের দিকে চাইছেন না!

সূর্য পশ্চিমে হেলে গেলো অনেকটা, তবু সভ্যসবকারের প্রতিনিধিদের কাপড় দেবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না; যাওবা দু এক-জন মাঝে মাঝে তাঁবু থেকে উকি ঝুকি মারছিলো তাও বন্ধ হয়ে গেছে। থানটা একটা মৃত অজগরের মত নিঃসাড়ে পড়ে, ক্ষতবিক্ষত উলঙ্গ দেহগুলোর অপরাজেয় দীপ্তিতে যেন সেটার বিষাক্ত নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে।

পিছাবনী শিবির থেকে একটা ছেলে মাথা নিচু করে এসে বললে, ঈশ্বরদা আপনাদের শিবিরে ফিরতে বলছেন।

নিজেদের শিবিরের সীমানায় আসতেই তারা দেখলে ঈশ্বরদার

অদ্ভুত অবস্থা। তাদের দিকে সম্পূর্ণ পেছন ফিরে তিনি বললেন, সুধীর, তোমরা ওই গাছের তলায় দাঁড়াও একটা ফটো তুলে পাঠাতে হবে।

অমিতাভর হাসি পেল ঈশ্বরদার এই ধরনের কথা বলার ভঙ্গী দেখে, সামনে চোখ তাই চক্ষুলজ্জা বজায় রেখেছেন, ইন্দ্রদেবের মত সহস্র চক্ষু হলে ফ্যাসাদে পড়তেন।

সুধীর বললে হেসে, ঈশ্বরদা আপনি ঘুরে দাঁড়াতে পারেন, পাঁচ ছয়-ঘণ্টা এই অবস্থায় থেকে আমাদের আদিম অবস্থা প্রাপ্তি হয়েছে, যারা দু ম্যাইল রাস্তায় শত লোকের সামনেও নির্ভিক ছিল তারা কি আপনার কাছেই হার মানবে?

না না তা নয় এই আমি ফটো-গ্রাফারকে ডেকে আনি।

জড়িতকণ্ঠে কথাগুলো বলতে বলতে ঈশ্বরদা পালালেন। ফটো-তোলার ব্যাপারে অমিতাভ সুনির্মল ঘোর আপত্তি জানালে; অমিতাভ বললে, এ হয় না, এ সম্ভব শুধু এই পরিবেশের গৌরবে কিন্তু এটাকে চিরস্থায়ী করা বড় লজ্জাজনক।

ঈশ্বরদা ফটোগ্রাফার নিয়ে এলেন। অবশ্য এবারেও তিনি তাঁর পুরোনো পদ্ধতি ছাড়েননি; তাঁর বেঁকা পিঠের দিকে লক্ষ্য করে বললে অমিতাভ, এ হয়না ঈশ্বরদা এ পারবো না।

পারতেই হবে, এ ছবির মূল্য অনেক। ভবিষ্যতে ওরা অস্বীকার করতে পারবে না ওদের এই বর্বোরোচিত ব্যবহারটা।

অগত্যা মুখগুলোকে যতদুর সম্ভব নিচু করে ঘুরিয়ে পাঁচজন সার-বেঁধে দাঁড়ালো। একটা চিড়িক শব্দে চিরদিনের জন্যে প্রামাণিক হয়ে উঠলো তাদের এই নাগা অভিযান।

একজন এসে পাঁচখানা কাপড় তাদের হাতে দিলে, তারা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেগুলো জড়িয়ে নিয়ে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

এতক্ষণ রুদ্ধ হাসির চাপে শিবিরের মধ্যে ছেলেদের নাড়িভুঁড়ি গুলিয়ে উঠছিল, সুধীরদের দেখে তা যেন বাঁধভেঙ্গে বন্যা বহিয়ে দিলে। সে হাসির ধাক্কায় লজ্জিত হয়ে দাঁড়ালো বিজয়ীদল। ঈশ্বরদা প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন. কিন্তু কে মানে। এমন কি হাসির সংক্রামতায় তাঁর ঠোঁটেও একটা ঝিলিক মেরে গেল। হাসতে হাসতে সবাই ঘিরে দাঁড়ালো পাঁচজনকে। তাদের চোখে পড়লো অমিতাভ, সুধীর, সুনির্মলের শরীরের ক্ষতস্থানগুলো; তখনও রক্তের দাগ শুকিয়ে আঁকড়ে আছে। চকিতে স্তব্ধ হয়ে গেল উচ্ছল কণ্ঠস্বর, সকলের মুখে ফুটে উঠলো সৈনিক-কাঠিন্য।

ঈশ্বরদা সুধীরকে বললেন, তোমরা কিছুদিন বিশ্রাম নাও এখানে, তারপর অমিতাভর কাঁধে হাত দিয়ে সুনির্মলের দিকে চাইলেন। অমিতাভ দেখলে, তাঁর চোখের দৃষ্টি সৈনিকের গর্বে, সেনাপতির গৌরবে উজ্জ্বল।

॥ ১৩ ॥

দেখ বাপু আমি আর খরচ চালাতে পারবো না, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো, এখন তো আর তুমি নাবালক নও যথেষ্ট বয়স হয়েছে—কথাগুলো একদমে বলে ব্রজবিহারীবাবু চুপ করলেন। তাঁর চেহারায় বেশ পরিবর্তন হয়েছে : চুলগুলো সব সাদা হয়ে এসেছে, কসের কতকগুলো দাঁত পড়ে গিয়ে ডানদিকের গালটা তুবড়ে গেছে, লাল বড় বড় চোখ ছুটো বিসদৃশভাবে ভুরুর তলায় জ্বলছে, চোখের নিচে দগদগে কাল দাগ।

ললিত মাটির দিকে চোখ রেখেই বললে, আই, এ, পরীক্ষাটা চালিয়ে দাও বাবা—তারপর......তার গলা ভেঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেল।

অত খরচ কোথায় পাব ? সামান্য রোজগার তাও কোন মাসে আছে কোন মাসে নেই। আর পড়েই বা কি হবে, এই তো আমি বি, এ, পাশ করেছি কি বা করতে পারলুম ও সব কিছু না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি, মুখে ফুটে উঠলো অব্যক্ত নৈরাশ্য।

ললিত তাঁর মুখের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে, ভাবলে পড়াশুনা ছাড়াই ভাল, যা হোক একটা চাকুরী করে সে হয়তো বাবাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে।

আমি তা হলে একটা চাকরীর চেষ্টা করি বাবা ?

হ্যা তাই করো—পায়াবল না থাকলে পাশ করে লাভ নেই কোন দিকেই সুবিধা করতে পারবে না।

ললিত আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। টেবিলে রাখা মদের বোতলটার ছিপি খুলে খানিকটা মুখে ঢেলে নিলেন ব্রজবিহারী বাবু। প্রথম প্রথম যে গোপনতার প্রয়োজন হতো এখন সেটা

সরল সহজ হয়ে এসেছে। এক ঢোক পেটে পড়তেই যেন জীবনের মানে খুঁজে পেলেন, খুশিমনে একটা বিড়ি পকেট থেকে বার করে ধরালেন।

ঘরে এসে ঢুকলো সুরেশ। তার হাবভাবে আর সংকোচের কোন বালাই নেই, সোজা গিয়ে পাশে একটা ভাঙ্গা চেয়ারে বসে বললে সে, আজ এখনও কাজে বেরোননি আপনি, শরীর খারাপ নাকি?

এই যে এইবারে যাবো, ললিতের সঙ্গে একটা কথা বলতে দেরী হয়ে গেল।

সুরেশের প্রতি ব্যবহারে ব্রজবিহারীবাবুর বেশ একটু তারতম্য ঘটেছে, আজকাল তাকে ভয়মিশ্রিত সম্মানের চোখেই দেখেন। এমন কি পাছে সুরেশ অসন্তুষ্ট হয় সেই ভয়ে মালতীর বিয়ের ব্যাপারেও তাকে বেশি চাপাচাপি করতে ভরসা পান না। আজ সাহস করে বলে ফেললেন, সুরেশ এরপর তোমাদের বিয়ের একটা দিন ঠিক করে নাও, অনেকদিন হয়ে গেল তুমি এবাড়িতে মেলামেশা করছো, লোকের চোখে সেটা খারাপ ঠেকছে, এমন কি মিত্তির বাড়ির ছোট কর্তা তো একরকম শাসিয়েই গেলেন সেদিন, বললেন মেয়ের বিয়ে দাও নয় তো বাড়ি ছেড়ে দাও।

সুরেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, আমার বিয়েতে কোন আপত্তি নেই তবে কি জানেন এই অঘ্রাণে মা আসবেন কলকাতায়, আমার ইচ্ছে সেই সময়েই......চুপ করলো সে। ব্রজবিহারীবাবু পেরেকে টাঙ্গানো ময়লা জামাটা গলায় গলিয়ে দরজার গোড়ায় যেতে যেতে বললেন, তবে সেই ভাল তোমার যখন ইচ্ছা। বস তুমি আমি কাজটা সেরে আসি।

ব্রজবিহারীবাবু বেরিয়ে যেতেই সুরেশ ভেতর দিকে গেল। সবেমাত্র খাওয়া সেরে মালতী এসে বসেছে রান্নাঘরের পাশে একফালি

বারান্দাটায়, সুরেশকে দেখে তার মুখটা খুশিতে ভরে উঠলো। আজ কাল তার পাথর খোদাই মুখখানা, দেহের কোমল বঙ্কিম রেখাগুলো, বয়সের গরিমায় আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে, শ্রাবণের ভরা নদীর গভীরতা ও অজানা আশঙ্কা মিশিয়ে সে যেন একটা ভয়াল সুন্দর রূপের আলেখ্য।

মুগ্ধ বিস্ময়ে সুরেশ চাইল তার দিকে, অনাদি চঞ্চলতায় ভোরে উঠলো তার মন। এত কাছে এসেও তৃপ্তি নেই, মালতীকে পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে তার মন ক্লান্ত। মালতীর ব্যবহারে সে খুঁজে পেয়েছে এমন একটা নির্লিপ্ত কাঠিন্য, একটা অবনমিত স্বাধীকার সীমানা যা তাকে ব্যথায় ক্ষিপ্ত করে তোলে। ক্ষণেকের জন্যে মনে হয় এ-বাধা সে মানবে না, সে সর্বজয়ী হবে, কিন্তু মালতীর চোখে ফুটে ওঠা দুর্লঙ্ঘ্য নিষেধের দৃঢ় সীমারেখায় ঠেকে তার কামনা শামুকের মতই চকিতে আত্মগোপন করে।

মালতীর পাশে মেজেতেই বসে পড়লো সুরেশ।

তার দিকে চটুল চোখে চেয়ে বললে মালতী, ডাক্তারবাবু যে আজ বড় সকাল সকাল রুগী দেখতে এলেন ?

রুগীর বিকার দেখা দিয়েছে কিনা, তাই—বললে সুরেশ।

একটা ক্ষীণ হাসির ঝিলিক খেলে গেল মালতীর কণ্ঠে, সে চোখ নামিয়ে বললে, বিকার ডাক্তারের, না রুগীর সেইটেই আগে ঠিক হোক।

আচ্ছা মালতী তুমি আমাকে ডাক্তারবাবু বলে ডাক কেন ?

কি বলে ডাকবো ?

কেন সুরেশ বলে !

বিমনা হয়ে মালতী কথাটার মোড় ঘোরালে, জানেন বাবা ললিতের পড়া ছাড়িয়ে দিচ্ছেন ?

ও সব কথা পরে শুনবো আগে আমার জবাব দাও।

মালতী চুপ করলো, সুরেশ তার একটা হাত টেনে নিয়ে

অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললে, বলো মালতী এখনও কেন তোমার এই সংকোচ ?

লজ্জা করে—সময় এলে চেষ্টা করবো। জড়িত কণ্ঠে বললে মালতী।

আগামী অগ্রাণে আমাদের বিয়ে ঠিক করলাম—জোর দিয়ে বললে সুরেশ।

হালকা পালকের মত নেচে উঠলো মালতীর মন, সন্দেহের মেঘ ফিকে হয়ে এলো, সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে দাঁড়ান, আপনাকে চা করে দি ভুলেই গেছ্লাম।

চতুর্থ সর্গ

॥ ১ ॥
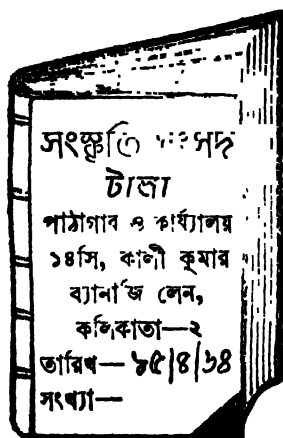
পিছাবনী কেন্দ্রীয়-শিবিরে সাতদিন বিশ্রাম করে অমিতাভর দল ফিরে এসেছে তাদের পূর্বের কেন্দ্রে। সুধীর গেছে অন্য কেন্দ্রে, তার স্থলে অমিতাভকে নেতৃত্বে বহাল করেছেন ঈশ্বরদা। এই নূতন দায়িত্ব অমিতাভর ভাল না লাগলেও মেনে নিতে হয়েছে।

পুলিশের দল যে আজকাল একই রকম পন্থা নেয় না তা সে দুএক-দিন ঠেকে বুঝে নিয়েছে। সেদিন এলো একটি ছোকরাগোছের দারোগা, চোখে চশমা, শান্ত মুখ, মনে হয় সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। গালাগালি, মারধোর কিছু না করে তিনি এসে বললেন, আমি আপনাদের গ্রেপ্তার করছি উঠে আসুন। সবে নেতৃত্ব পেয়ে মহা ফাঁপরে পড়েছিল অমিতাভ. কি করবে কিছুই প্রথমটায় ঠিক করতে পারেনি। বিনা উত্তেজনায় দারোগা আবার বললেন, আপনাদের সত্যাগ্রহী নিয়ম অনুযায়ী গ্রেপ্তার করলে কোন বাধা না দিয়ে আমাদের সঙ্গে আসা উচিৎ এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? উঠুন।

দারোগার মুখে সত্যাগ্রহী নিয়ম শুনে লজ্জিত অমিতাভ আদেশ দিলে সবাইকে দারোগার সঙ্গে যেতে। পুলিশেরদল অতি সহজে ভেঙ্গে দিলে নুনের ঢিপিগুলো

মাইলখানেক দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে হাসিমুখে দারোগা বললেন, কেন এত কষ্ট করছো, বাড়ি ফিরে যাও, নুন করে কি সুবিধা হবে দেশের?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অমিতাভ ভাবলে, এ আবার কি। গ্রেপ্তার করলো কি এই কথা শোনাবার জন্যে।

আমরা এখন আসি, তোমরা এইখানেই থাকতে পারো, কিম্বা ফিরে

যেতে পারো যা খুশি।—অমিতাভর পিঠে একটা মৃদু-চাপড় মেরে দারোগা এগিয়ে গেলেন সামনে।

আমাদের জেলে নিয়ে যাবেন না?

জেলে অত লোক ধরবে কেন? যেতে যেতে পেছন ফিরে বললেন দারোগা।

সেই থেকে অমিতাভ সাবধান হয়ে গেছে; এখন গ্রেপ্তার করছি বললেই সে আর উঠে দাঁড়াবার আদেশ দেয় না।

আজ আবার এক নূতন সমস্যায় পড়েছে: ওপর থেকে আদেশ এসেছে এরপর থেকে সত্যাগ্রহীরা কোন রকম গ্রামের সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে না।

হাতের আদেশপত্রটার লালকালির দাগ দেওয়া জায়গাটা সে নিম্নস্বরে আর একবার পড়লে, গ্রাম্য চাষীদের সঙ্গে যেন কোন সহযোগ না থাকে; অহিংস সংগ্রামের মূল আদর্শচ্যুতির আশঙ্কায় এই রকম নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আদেশটা পড়ার পর থেকেই নানা কথা জটপাকিয়ে এলো অমিতাভর মাথায়। সে সেটা সবাইকে পড়ে শুনিয়ে দিলে। ক্ষুণ্ণমনে সবাই চাইল অমিতাভর দিকে, সে বললে, বিচারের প্রয়োজন নেই, পালন করতে হবে।

খাবার সময় সবাই এক একবার সোনাদির মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চাইল। কাল তারা চলে যাবে শুনে সোনাদির মুখখানা থমথমে হয়ে উঠেছে। মুখের মিষ্টি হাসিটুকু একবারের জন্যেও কেউ দেখতে পেলে না। খাওয়া শেষে সোনাদি বলে উঠলেন, এ অন্যায়। আমাদের কি সাধ যায় না দেশের কাজ করতে।

অমিতাভ একবার তাঁর দিকে চেয়ে মাথা নিচু করলো; কি যেন সে দেখতে পেলে ওই মুখে। মনে মনে বললে, ধন্য মেদিনীপুর! তোমার মাতৃত্ব সার্থক।

নিঃশব্দে উঠে পড়লো ছেলের দল। সোনাদি তাদের কাছে এগিয়ে

এসে বললেন, আমাদের মনে রেখো ভাই, আমরা বড় গরীব বড় দুঃখী ; ছেলেদের চোখে জল ভরে এলো ; এ যেন তাদের অতি প্রিয়জনের কাছে বিদায় নেবার বিষাদমুহূর্ত। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

নিজেকে সংযত করে বললে অমিতাভ, সোনাদি এর মধ্যেই বিদায় দিচ্ছেন কেন ? আমরা গ্রামের ধারেই তো থাকবো ?

গ্রামের মধ্যে থাকা আর ধারে থাকা এক নয় ভাই। একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো সোনাদির ঠোঁটে।

মানিক এসে বললে, মা, বাবা এদের একবার দেখতে চান।

অমিতাভ চমকে উঠলো, তাইতো এ বাড়িতে এতদিন বাস করলো অথচ গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা করেনি। সে অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি বললে, সোনাদি চলুন আমাদেরও দেখা করতে হবে।

উঠোন পেরিয়ে চললো সবাই। ছেলেদের মনে অদ্ভুত কৌতূহল, সোনাদির স্বামী।

গৃহস্বামীর ঘরের দেওয়ালে সাদা খড়ির নিপুণ আলপনা আঁকা, একপাশে একটি ফাঁকা খাটিয়া, অন্যদিকে একটা খাটিয়ায় শায়িত নরদেহ। রোগ-পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে যে কোন বয়স ঠিক করা যায়। মুদিতচক্ষু, অবশ শরীর শিথিলভাবে পড়ে আছে খাটিয়ায়

সোনাদি তাঁর কাছে গিয়ে উঁচু গলায় বললেন, ছেলেরা তোমাকে দেখতে এসেছে। ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালেন তিনি ছেলেদের দিকে ; জীবনে এমন নির্জীব শূন্যদৃষ্টি অমিতাভ দেখেনি। অনেক কষ্টে হাতটা কাঁপাতে কাঁপাতে কি যেন ইঙ্গিত করলেন।

সোনাদি বললেন, উনি তোমাদের বসতে বলছেন।

অমিতাভ দেখলে, তাঁর গালের কুঞ্চনগুলো অক্ষম চেষ্টায় বার বার দুলে উঠছে। সে একবার সোনাদি একবার তাঁর মুখের দিকে চাইল। মন তার কোথায় যেন চলেছে। এই তো সমাজের

সত্য রূপ, একদিকে সোনাদি অন্যদিকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু তাঁর স্বামী। সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

আপনভোলা মহেশ, পাত্র হাতে এসে দাঁড়ালো অন্নপূর্ণার দ্বারে, সেখানে দেখলে অন্নপূর্ণার মূর্তি গেছে বদলে, সৃষ্টিময়ী শক্তির পা জড়িয়ে যাচ্ছে স্থবির মহাকালের দেহে। না না এ হতে পারে না, সোনাদির স্বামী এ নয়—ছটফট করে উঠে পড়লো অমিতাভ, সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল।

দরজার চৌকাট ধরে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সোনাদি তাদের গতিপথের দিকে।

॥ ২ ॥

বড়কর্তা ফরাসে বসে গড়গড়া টানছেন। ইদানিং তাঁর কপালের রেখাগুলো প্রায়ই স্পষ্ট দেখা যায়। চাপা লোক, মুখ ফুটে না-বললেও তাঁর মনের ভাব বোঝা মোটেই শক্ত নয়।

ঝড়ের পুর্বাভাস যেন তিনি পাচ্ছেন, তাই প্রতি মুহুর্তেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন সেই অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে।

অমিয়কান্তি কলেজ যাচ্ছে ঠিক সময়ে কিন্তু ফেরার সময় ঠিক নেই, এমন কি মাঝে মাঝে রাত্রেও বাড়ি ফেরে না, জিজ্ঞেস করলে বলে, সহপাঠির সঙ্গে পড়লে পড়া ভাল হয় তাই হোষ্টেলেই ছিল রাত্রে।

কথাটা বিশ্বাস হয় না রামকালীবাবুর, আবার ভরসাও হয় না ঘাঁটাতে। যা দিন কাল পরেছে। অমিয়কান্তির বেপরোয়া ভাবও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

নিজের যৌবনের দিনগুলো আর পিতার শাসন মনে পড়ে রামকালীবাবুর। তাঁর মনে হয়, সে-কালের পিতাদের চিন্তার গুরুত্ব এ-কালের চেয়ে অনেক কম ছিল। সন্তানের চরিত্রহীনতার আশঙ্কা যেন এ-কালের চরিত্রবান সন্তানের সমস্যার চেয়ে অনেক নগণ্য।

তিনি ভাল করেই জানেন যে, অমিয়কান্তি এমন কিছু করতেই পারে না যা তাঁর মুখ মসীলিপ্ত করবে; তবু তাঁর মাঝে মাঝে মনে হয় যদি সে দুর্নীতির তাগিদে কোন কিছু করতো, তা হলে তিনি যেন এরচেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন।

এর ওপর অর্থনৈতিক সমস্যা, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তার সাহায্যের হার কমিয়ে দিয়েছে, সেও বলতে শুরু করেছে অমিয়কান্তির পড়াশুনা করে কি হবে? দেশ স্বাধীন না হলে কোন আশা নেই।

শিবকালীর তো কথাই নেই মেদিনীপুরে চরকা খদ্দর নিয়ে হৈ হৈ করছে, এমন কি রুনুও নাকি তাতে মেতে উঠেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ অবশ্য এ-সব ব্যাপারে খুবই নির্লিপ্ত কিন্তু তার এই আত্মসর্বস্ব জীবন যাত্রাও রামকালীবাবুর মনঃপুত নয়। তাই চিন্তার জটিল জালে আবদ্ধ রামকালীবাবু তাঁর অতি পরিচিত যাত্রাপথেও পথ হারাচ্ছেন।

বাড়িভাড়া দেবার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করলে ললিত। তাকে দেখে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন রামকালীবাবু।

ভাড়ার টাকা গুনে নিতে হিতে বললেন, হ্যারে ললিত পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, ভাল ভাবে পাশ করতে পারবি তো ?

পড়ার কথায় ললিতের চোখ ছলছল করে উঠলো সে মাথা নিচু করলে। তাকে ইতস্তত করতে দেখে বললেন রামকালীবাবু, কি রে উত্তর দিচ্ছিস না যে ? তুইও স্বদেশীতে মাতলি নাকি ?

লজ্জিত কণ্ঠে বললে ললিত, কলেজ ছেড়ে দিয়েছি জ্যাঠামশায়।

তোরা সবগুলো একসঙ্গে যুক্তি করে বয়ে যেতে বসেছিস।

কি করব ; বাবা খরচ চালাতে পারছেন না।

রামকালীবাবুর কঠিন মুখখানা বেদনাতুর হয়ে এলো ; এই সামান্য কথার মধ্যেই যেন অনেক কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে আসছে। শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি, কি করবি ঠিক করেছিস ?

কিছুই ঠিক করতে পারিনি।

কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো রামকালীবাবুর। ললিত দলের সেরা ছেলে এ যেমন লেখাপড়ায় তেমনি ছবি আঁকায়, তার ভবিষ্যৎ এ ভাবে নষ্ট হতে বসেছে। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন, কলেজ যখন ছেড়েই দিলে তখন যা হয় একটা ঠিক করে নাও,—বয়েস কম, এখন থেকে পরিশ্রম করলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।

কি যে করি জ্যাঠামশায় ? চাকরীর সন্ধানে কদিন ঘোরাঘুরি করলুম কিন্তু কোনো আশা দেখছি না।—আপনি যদি একটা কিছু...

আমি আর কি-বা করতে পারি ?—একটু থেমে আবার শুরু করলেন—তবে আমার মনে হয় তুমি সাধারণ লাইনে না গিয়ে ছবি আঁকার লাইনে গেলে ভাল হয়।

ক্ষণেকের জন্যে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ললিতের, সে বললে, ছবি আঁকায় কি পয়সা রোজগার হবে ?

তা হবে না বটে, তবে যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ডিজাইন, সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন তৈরির কাজ করো তা হলে চর্চাও থাকবে আর পয়সাও কিছু কিছু পাবে।

কথাটা ললিতের মন্দ লাগলো না সে তাড়াতাড়ি বললে, জ্যাঠা-মশায় আপনার জানাশোনা কোন লোক আছেন কি যিনি আমাকে এই সম্বন্ধে কিছু সাহায্য করতে পারেন ?

একজন লোককে আমি জানি সে যদি তোমাকে তার এ্যাসিস্‌টেণ্ট করে নেয় তা হলে ও কাজের হদিশ বুঝতে পারবে, আমি তাকে কাল একবার বলে দেখবো।

আনন্দে নেচে উঠলো ললিতের মনটা, ভরসা হলো, উনি কাউকে বললে সে না করতে পারবে না।

আপনার একটা ছবি এ কে দেবো জ্যাঠামশায় ? আমি কি রকম আঁকতে পারি বুঝতে পারবেন।

দুর পাগল! আমার ছবি আঁকতে হবে না।

রামকালীবাবুর গুরুগম্ভর মুখখানা হাসিতে ভরে উঠলো।

বায়নার স্থুর ধরে বললে ললিত, বেশি দেরী হবে না জ্যাঠামশায়, পেন্‌সিলে আঁকবো, আপনার স্নানের সময়েব আগেই শেষ করে দেব।

তাঁকে আপত্তির অবকাশ না দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ললিত ঘর থেকে।

রামকালীবাবু গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে নিয়ে টানতে লাগলেন, খেয়াল নেই কল্কের আগুন কখন নিবে গেছে।

ললিতের কথায় তাঁর হুস হলো, তিনি দেখলেন একটা শাদা কাগজ আঁটা পিজবোর্ড আর পেনসিল ইত্যাদি নিয়ে সে হাজির।

আমার দিকে একটু ঘুরে বসুন জ্যাঠামশায়।

তাঁকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সামনে একটা চেয়ারে বসে ললিত ছবি আঁকা শুরু করে দিলে।

রামকালীবাবু একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে বসলেন, তাঁর মনটাও যেন কতকটা হালকা হয়ে এলো।

পেনসিলের টান দিতে দিতে তন্ময় ললিত ভাবলে, আঁকার মত চেহারা বটে, অন্তরের ঐশ্বর্য মুখ দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে।

অনেকক্ষণ একভাবে বসে থেকে একটু আড় ভেঙ্গে রামকালীবাবু বললেন, আর কত দেরী ললিত ?

ঘাড় না তুলেই উত্তর দিলে, হয়ে এসেছে জ্যাঠামশায়, আর একটু। কতকগুলো সস্নেহ-আঁচড় কেটে ছবিটা দূরে রেখে দেখতে লাগলো ললিত বিচারকের দৃষ্টিতে ; তার মুখদিয়ে বেরিয়ে গেল, হয়েছে মন্দ নয়, তবে ওইটে আর একটু স্পষ্ট করতে পারলে ভালো হতো।

ওইটে কি ললিত ? কি স্পষ্ট করতে ? বললেন তিনি।

ও কিছু নয়। আপনি নিজে দেখুন ঠিক হয়েছে কিনা ? ছবিখানা হাতে নিয়ে রামকালীবাবু একবার দেওয়ালে টাঙ্গানো নিজের তৈলচিত্রের দিকে, একবার এই ছবির দিকে দেখতে লাগলেন। কি যেন একটা নতুন জিনিস তিনি লক্ষ্য করলেন সদ্য-আঁকা ছবিটার মধ্যে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে ললিতের দিকে চেয়ে বললেন, চমৎকার

হয়েছে। ছবির মানস ফুটিয়ে-তুলতে তোমার অদ্ভুত দক্ষতা ললিত। আমি বলছি এ চর্চা ছেড়োনা, ভবিষ্যতে তুমি বড় শিল্পী হবে।

আমি এখন আসি জ্যাঠামশায়, আপনার বেলা হয়ে যাচ্ছে। অন্য-মনস্কভাবে বললে ললিত।

এসো বাবা। কাল সকালে মনে করে দেখা করো, তোমার সেই কাজের খবরটা কালই পেয়ে যাবে।

॥ ৩ ॥
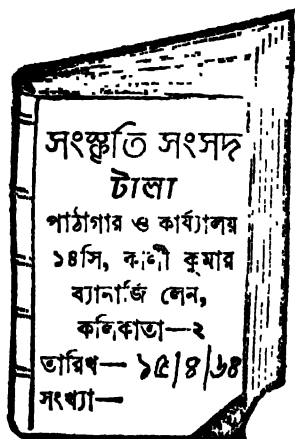
লালকাঁকড়ের বাঁধ দেওয়া বিঘে দুয়েক পুকুর। পাড়ের ওপার গোটা কতক বট, অশ্বত্থগাছের নমুনা দেখে মনে হয় বাঁধটার বয়স হয়েছে; বহুদিনের পোক্তা বাঁধন আজও কোথাও চিড় ধরেনি, এই বাঁধের দৌলতে সম্মুখের ঢালুটার যত জল এসে জমা হয় এই পুকুরে। জলটায় গেরুয়া রং হলেও সাঁতার-জল থাকে গ্রীষ্মকালে। উত্তরে আমকাঁঠালের বাগান, দু-একটা লিচুর গাছও খুঁজে বার করা যায়। বাগানের উত্তর পশ্চিম কোণ ঘেঁষে সোনাদির গ্রাম।

সত্যাগ্রহীরা এই পুকুরপাড়টাই তাদের বাসের জন্যে বাছাই করেছে।

রোজ সকালে স্নান করে নদীর ধারে, ফিরে এসে রান্না করে আম-বাগানে। দৈনিক পিছাবনী শিবিরের বরাদ্দ নিয়ে আসে একটি স্বেচ্ছাসেবক, কোনদিন চাল ডাল, কোনদিন চাল আলু, আবার কোন দিন শুধু চাল। রান্নার সময় লাগে কম; ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে অমিতাভরা পায় অফুরন্ত অবসর।

অন্ধকার হলেই চাটাই পেতে ঘুমের ব্যবস্থা করে, প্রথম দিকটা ঘুমিয়ে পড়ে সবাই, তারপর গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়: চারিদিকের নিস্তব্ধ নিঝুম নিরালার মধ্যে তারাভরা আকাশটাকেই নিকটতম মনে হয়। দক্ষিণের আদিগন্ত-বিসর্পিত প্রান্তরের অপর প্রান্ত থেকে সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়ার চাপে শরীরগুলো যখন কন্‌কনিয়ে ওঠে তখন উঠে গিয়ে কোন গাছের আড়ালে বসে বলে, পুলিশকে পারা যায়, কিন্তু এই হাওয়ার জ্বালাতেই পালাতে হবে দেখছি। অফুরন্ত বাতাসের ঢেউগুলো যেন একবার থামলে বাঁচে তারা।

পুলিশের দল এখনও এই ডেরার সন্ধান পায়নি। নদীর ধারে দেখলেই বলে,—শালারা থাকেই বা কোথায়, খায়ই বা কি?—গ্রামের

লোকদের ওপর শাসানি চলে, সন্ধানের আশায় কাউকে বেঁধে মারে কাউকে পয়সার লোভ দেখায়।

বেতে যখন বশ হলো না, তখন অন্য পন্থা ধরলেন দারোগারা। থাকা খাওয়ার আস্তানাগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে বিদেশী ছেলেগুলো পালাতে পথ পাবে না তাই ইদানিং ডেরার সন্ধানে শিকারী কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ধার নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

অমিতাভদের এ আস্তানা পুলিশের ধারণা বহির্ভূত, আজগুবী ব্যাপার। কাজেই এখানে নির্বিবাদে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো।

সকালবেলা খুন করা সেরে গোপন পথে ঘুরে ঘুরে তারা এসে পৌঁছলো আমবাগানে। সকালের চিড়েগুলো পেটের মধ্যে ফুলে ফেঁপে আবার কোথায় মিলিয়ে গেছে। সবাই মিলে পুকুরের আঁজলা-কতক জল খেয়ে পেটের চুপসেযাওয়া চামড়াগুলো একটু উঁচু করে নিয়ে বসলো গাছের ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে।

সুনির্মলের রান্না করার পালা আজ, সে না বসেই ভাত সেদ্ধ করার ব্যবস্থায় মন দিলে। অমিতাভ হেসে বললে, দেখ ভাই আজও পুড়িয়ে ফেলো না ভাতটা—চিড়েও নেই—আজ তা হলে স্রেফ্ হরিমটর।

রোদে তামাটে হওয়া সুনির্মলের মুখটা আরো যেন লালচে হয়ে এলো, সে তাড়াতাড়ি বললে, না না আজ পুড়বে না। আতপ চাল যে অত চট করে সেদ্ধ হয় সেদিন জানতুম না।

তা হলে একটা শিক্ষা হলো কি বলো ?

সুনির্মলকে চোখের একটা ইসারা করে বিভূতি বললে, আর একটা শিক্ষা হয়েছে। বলবো নাকি হে ?

তার দিকে চেয়ে ঘোর আপত্তি জানালো।

অমিতাভ বললে বিভূতির দিকে চেয়ে, বল হে বল, সত্যাগ্রহীদের কিছু গোপন করতে নেই।

হাসতে হাসতেশুরু করলে বিভূতি, প্রথম প্রথম এসে এই মাঠের মধ্যে রাত্রে মোটেই ঘুম হতো না সুনির্মলের, খালি আমার গা ঘেঁসে ঘেঁসে শুতো—আজকাল এক ঘুমে রাত কেটে যায়।

লজ্জিত সুনির্মল মাথা নিচু করলে, সবাই হেসে উঠলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাত নামিয়ে হাঁড়িটা দড়ি দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রেখে সুনির্মল বললে, ভাত হয়ে গেছে স্নান সারবে চলো।

সবাই যে যার গামছা বার করে পুকুরের দিকে চললো।

সকলে মাঝপুকুরে মনের সুখে ভাসছে এমন সময় সুখময় চেঁচিয়ে উঠলো, পুলিশ। পুলিশ।

অমিতাভ আমবাগানের দিকে তাকিয়ে বললে, তাই তো! এখানেও পুলিশ খুঁজে বার করেছে দেখছি। সবাই সাঁতার কেটে পাড়ের দিকে গেল।

পুলিশের দল এসে থামলো রান্নার জায়গাটায়। দারোগা পাড়ে দাড়ানো সত্যাগ্রহীদের দিকে চেয়ে নিয়ে পুলিশদের আদেশ দিলেন, শালাদের খাবার কোথায় আছে খুঁজে বার করো।

নানা ভাবে চারদিকে খোঁজাখুঁজি চললো, হঠাৎ একটা আঙ্গুল বাড়িয়ে দারোগা বললেন, তেওয়ারী গাছের ওপর ওই হাঁড়িটা কি দেখ তো। একজন পুলিস গাছে উঠে হাঁড়িটা নামিয়ে আনলে দারোগার সামনে, খুশিতে ভরে উঠলো তাঁর মুখ, বললেন, ভেঙ্গে ফেল।

তেওয়ারী আদেশ মানায় ইতস্তত করছে দেখে, দারোগা নিজেই সবুট পদাঘাত করলেন হাঁড়িটার ওপর। চৌচির হয়ে ফেটে তার মধ্যের সমস্ত ভাত ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

শালাদের খাওয়া ঘোচাচ্ছি, বলতে বলতে দারোগা ভাতগুলো মাড়িয়ে চলে গেলেন। সত্যাগ্রহীদের মনে হলো যেন সবুট পাদুটো তাদের পেটের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

পুলিশদল চলে যাবার পর সবাই পরস্পরের দিকে তাকালো,

তারা দেখলে অমিতাভর চোখ দুটো বাঘের মত জলছে, ঠোঁট চেপে সে ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে, শরীরের পেশীগুলো ফুলে পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠেছে।

অমিতাভর এ মূর্তি আগে কখনও দেখেনি, ভয়ে ভয়ে সুনির্মল ডাকলে, অমিতাভ। অমিতাভ।

চমকে উঠে নিজেকে সংযত করে অমিতাভ বললে, এখন উপায় তোমরা কি খাবে ?

যা হয় হবে। ছায়াতে বসবে চলো ত।

আমগাছের ছায়ায় বসে বিভূতি জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা অমিতাভ দারোগাগুলো তো ভারতবর্ষেরই লোক।

আমিও ওই কথাই ভাবছি ভাই, বলে চললো অমিতাভ— সুযোগ থাকলে মানুষের আত্মাগুলো কিনে ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায় এই তার বড় প্রমাণ নয় কি ?

ক্ষুধাটাকে হজম করার চেষ্টায় হাঁটু মুড়ে নেতিয়ে পড়লো সবাই মাটিতে, ভিজে কাপড় গায়েই গেল শুখিয়ে।

একদল ছেলের কলকলানিতে সবাই উঠে বসলো। দেখলে ভারি কোঁচড় দোলাতে দোলাতে মানিক আসছে।

কোঁচড় থেকে কাঁচা পাকা আমগুলো মাটিতে ঝেড়ে দিয়ে মানিক বললে একগাল হেসে, আমরা সব দেখেছি—উ-ই গাছের ওপর চেপে ছিলুম। আমগুলো দেখে কৃতজ্ঞতায় সকলের মন ভোরে উঠলো।

একটা করে আম প্রত্যেকের হাতে তুলে দিতে দিতে অমিতাভ বললে, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাবে কি করে সুনির্মল ?

পরম তৃপ্তির সঙ্গে টক আমগুলো চিবুতে লাগলো তারা। ছেলের দল আবার হৈ হৈ ক'রে ছুটে চলে গেল। খাওয়ার শেষে পুকুরে দমভোর জল খেয়ে দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে নিশ্চিন্ত আরামে সকলে শুয়ে পড়লো।

॥ ৪ ॥

অপরাহ্নে অন্যদিনের মত আজও এলো পিছাবনী শিবিরের সংযোগ-রক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবক, বরাদ্দ চাল ডালের কোন চিহ্ন নেই তার সঙ্গে। সে শুষ্ক মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, খবর খুব খারাপ, পিছাবনী শিবির পুলিশে দখল করেছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বললে অমিতাভ, ঈশ্বরদা কোথায়?

ঈশ্বরদা এবং অন্য সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

এখন উপায়?

ঈশ্বরদা আদেশ দিয়ে গেছেন, এখন থেকে সমস্ত কেন্দ্রে স্থানীয় নেতারা তাদের এলাকায় অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে নেবে। সত্যাগ্রহীদের মুখগুলো শুকিয়ে এলো।

অমিতাভ বললে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি করে করবো।

স্বেচ্ছাসেবকটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এখন আসি ভাই—আর হয়তো দেখা হবে না, আমাকে এখনও আরো দুতিন জায়গায় খবর দিতে হবে; হাওয়ার বেগে বেরিয়ে গেল সে সাইকেলে চেপে; অমিতাভ চিন্তিত ভাবে পায়চারি করতে লাগলো।

অন্ধকার ঘন হয়ে গেল। অমিতাভর কাছে একমাত্র পথ খোলা—গ্রামের সাহায্য কিন্তু গ্রামবাসীর বিপদের কথা ভেবে সে সাহস পাচ্ছে না। এ ছাড়া উপায় কি? হয় সংগ্রাম বন্ধ করে ফিরে যেতে হবে, নয় গ্রামবাসীর সাহায্য নিতে হবে।

অন্ধকারে মানিক এসে দাঁড়ালো সামনে। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলে অমিতাভ, কি খবর মানিক, এ সময়?

পুরোদস্তুর মুরুব্বির মত বললে, আজকার ব্যাপার শুনে সবাই ঠিক করেছেন, আপনাদের গ্রামেই খেতে হবে।

সে হয় না মানিক, পুলিশ তোমাদের বাড়িটার ওপর নজর রেখেছে—তোমাদের ক্ষতি করতে পারে।

হ্যাঁ পুলিশ! চারিদিকে গাছে গাছে ছেলে বসিয়ে রাখবো, পুলিশ দেখলেই কোকিল ডেকে সাবধান করে দেবে। তা ছাড়া খাওয়ার ব্যবস্থা অন্য বাড়িতে করা হয়েছে—রাত্রে থাকবার জন্যে ঠিক করা হয়েছে একটা বারোয়ারী মনসা-মেলা।

সুনির্মল বললে, রাজি হয়ে যাও অমিতাভ, এ ছাড়া কোন উপায় নেই।

আচ্ছা তাই হবে মানিক, চিন্তিতভাবে বললে অমিতাভ।

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে মানিক, কিন্তু সাবধান! নিশুতরাতে যাবেন আর ভোরের আগে গ্রাম ছেড়ে চলে আসবেন, কোকিলের ডাক শুনলে লুকিয়ে পড়বেন।

হাসতে হাসতে বললে অমিতাভ, আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে সেনাপতি মশায়। মানিক ছুটে অদৃশ্য হলো, সুনির্মল বললে, ছেলে নয়তো দমদম বুলেট।

গভীর রাত্রে অমিতাভ বললে ডেকে, চলো এবার যাওয়া যেতে পারে।

গা হাত পা ঝেড়ে সবাই উঠে দাঁড়ালো; ঘন অন্ধকারের মধ্যে শুধু আমবাগানেব পায়েহাঁটা পথের শাদা ধুলোগুলো দেখা যাচ্ছে।

সুনির্মলের পাশ দিয়ে একটা শেয়াল ছুটে যেতেই সে চমকে উঠলো, বিভূতি ঠাট্টার সুরে বললে, আরে শেয়াল শেয়াল।

বাগানের ঠিক শেষে এসে পৌঁছতেই কোকিলের ডাক কানে এলো; অমিতাভ বললে, মানিকের আদেশ লুকিয়ে পড়তে হবে, চটপট করে সবাই গিয়ে দাঁড়ালো একটা ঝোপের আড়ালে।

ছুটতে ছুটতে মানিক এসে হাঁক দিলে, কোথায় গো তোমরা?

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সবাই দাঁড়ালো মানিকের সামনে ; মানিক বললে ঠিক হয়েছে।

কি ঠিক হয়েছে মানিক ? প্রশ্ন করলে বিভূতি।

কোকিলের ডাকে লুকোতে পারবেন কিনা দেখে নিলাম—চলুন এইবার খেতে।

ওরে পাজি তাহলে শুধু শুধু আমাদের ঝোপের আড়ালে দাঁড় করালে, পুলিস আসেনি ?

না, দেখে নিলাম।

চলো চলো খিদেয় নাড়ীভুড়ী হজম হয়ে যাবে—হেসে বললে অমিতাভ।

॥ ৫ ॥

ঘরের এককোণে মাছুরে বসে মালতী ললিতের একটা সার্ট সেলাই করছে। দ্বিপ্রহরে সে পায় একটানা অবসর।

ব্রজবিহারীবাবু দালালীর কাজে বেলা এগারোটার আগেই বেরিয়ে গেছেন, ললিতও বেরিয়েছে তার নতুন চাকরীতে। ফিরবেন সব অন্ধকার হবার পর।

সুরেশকে দিয়ে লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে নিয়েছে মালতী, এই দীর্ঘ একঘেঁয়ে দিনগুলো কাটাবার তাই একমাত্র ভরসা।

সেলাইটা শেষ করে ভাবতে লাগলো মালতী : নিজের কথা, সুরেশের কথা, আরো কত কথা।

সুরেশ আজকাল আসে কম, কি রকম যেন মনমরা হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুকটা কেঁপে ওঠে, হাজার হোক পুরুষ মানুষ, ওদের ভালবাসা ধৈর্য মানে না, কিন্তু কি করবে সে? তারই কি ভাল লাগে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা। সুরেশকে ভালবাসে, তাকে নিবিড় ভাবে পেতে চায়, এটা কি সে বোঝে না, তবে কেন তার এই অভিমান, এই এড়িয়ে চলা? নিলেই তো পারে সুরেশ তাকে আপনার করে, মাকে দুদিন আগে আনা যায় না? তার যে আর ভাল লাগছে না এই একঘেঁয়েমি। মনে পড়ে যায় মায়ের মৃত্যুর সময়টা। মুহূর্তের জন্যে সে যেন অতি আপনার করে পেয়েছিল সুরেশকে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল, সুরেশ খালি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে—আর একটু আর্থিক স্বচ্ছলতা হলে তবে বিবাহিত জীবন সুখের হবে। এ কথার মানে মালতী বুঝতে পারে না, তার দাবী তো বেশি নয়, সামান্য খাওয়া পরা আর শান্তি, এই তো। ঐশ্বর্য, নাই বা হলো।

সুরেশকে আজকাল তার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। এখনই সে যা খরচ করে তাতে করে সচ্ছন্দে দুটো পেট চলে যায় : বাবাকে মদের খরচ দেওয়া, নিজের খরচ, বাবুয়ানার খরচ, সবই তো চলছে, আবার ললিত বলছিল সে নাকি রোজ ট্যাক্সী করে এখানে আসে। এত খরচ চলছে আর বিয়ে করতেই যত টাকার চিন্তা।

আজ মুখ ফুটে বলবে, আর অপেক্ষা করতে পারবে না—এত লজ্জাই বা কিসের ?

ছটফট করে গিয়ে দাঁড়ালো মালতী জানালার ধারে। জনশূন্য রাস্তা রোদের ঝাঁঝে চকচক করছে, চারিপাশের বাড়িগুলো যেন নিদ্রিত ; আলসের ওপর একজোড়া পায়রার গুঞ্জনধ্বনি নির্জন দ্বিপ্রহরকে স্বপ্নালু করে তুলেছে।

আস্তে আস্তে মালতী এসে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো ; পরিচিত কড়ার শব্দের আশায় সে আজ ব্যাকুল।

কড়ার শব্দে ধড়মড়িয়ে ওঠে ; কাপড়টাকে সামলে নিয়ে কম্পিত পদে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ায়, সুরেশ হাসি মুখে ঘরে ঢোকে, বলে অদ্ভুত চোখে চেয়ে, কি হচ্ছিলো ?

নিজের ভাবনার কথা ভেবে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে মালতী, সে সুরেশের দৃষ্টি এড়াবার অছিলায় দরজা বন্ধ করতে যায়।

পাতা মাদুরের ওপর দুজনে গিয়ে বসে ; সাহসে ভর করে মালতী বলে, এতদিন আসোনি কেন বলো তো ?

কি করতে আসবো—তুমি তো চাও না আমি আসি। উত্তর দেয় সুরেশ।

চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে মালতীর সে মাথাটা ঘুরিয়ে নেয়।

সুরেশ তার একটা হাত তুলে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলে, আর কটা মাস, তারপরেই তোমাকে পাব মালতী।

মনের মেঘ কেটে যায়, নিশ্চিন্ত আরামে মালতীর মাথাটা এলিয়ে পড়ে সুরেশের কাঁধে। সুরেশের মুখটা নেমে আসে, সে মালতীর কম্পিত ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে জলন্ত ঠোঁটটা। আগুন জলে ওঠে মালতীর সারা দেহে, তার দেহ এলিয়ে পড়ে আজ আর বুঝি কোনো বাধা মানে না; উম্মত্ত হাত দুটোর মধ্যে সে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। চোখের সামনে সব কিছু মুছে যায়, শুধু সুরেশের দ্রুত নিঃশ্বাস আর শরীর।

মধুর ক্লান্তিতে চোখ বুজে শুয়ে থাকে মালতী—তার পিঠে হাত রেখে সুরেশ বলে, আজ আমি আসি? লজ্জাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দেয় মালতী, এসো, চোখ তার ঘুমে জড়িয়ে আসে।

ললিত এসে ডাকলো মালতীকে ঠেলা দিয়ে—দিদি, দিদি, ওঠো আর কত ঘুমোবে, রাত হয়ে গেছে যে।

ঘুম ভেঙ্গে স্বপ্নরঙীন চোখে চাইল মালতী চারিদিকে। ভয়ে তার বুকটা একবার কেঁপে উঠলো।

এত ঘুমোতেও পার দিদি!

তাড়াতাড়ি উঠে বসে ভাল করে চাইল মালতী, সে যে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। সে কি এসেছিল? ভাল করে অনুভব করতে চেষ্টা করলে মালতী।

দিদি, আজ সুরেশদার সঙ্গে দেখা হলো দুপুরে, তিনি বললেন নানা ঝঞ্ঝাটের জন্যে আসতে পারেননি কদিন—কাল আসবেন।

আরামের একটা নিঃশ্বাস পড়লো মালতীর: কি সর্বনেশে স্বপ্ন; বুকের কাঁপুনিটা এখনও থামাতে পারছে না।

ঘরে এসে ঢুকলেন ব্রজবিহারীবাবু। জড়িতকণ্ঠে তিনি বললেন, বেশ হয়েছে ছোঁড়াটাকে ধরে নিয়ে গেছে—বড় জ্বালাচ্ছিল কদিন মদের দোকানটার সামনে। ললিত মালতী ভীতভাবে চাইল তাঁর মুখের দিকে।

ওই যে কর্তাদের ছোঁড়াটা—অমি, অমি—আমাকে কি না পথ আগলে দাঁড়ায়, বলে মদ খেতে পাবেন না—হুঃ মদ খাব না তো খাব কি বাবা, আছে কি দুনিয়ায়। বোকার মত হেসে উঠলেন ব্রজবিহারীবাবু।

ললিত কোন কথা না বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মালতী একপাশে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলে।

॥ ৬ ॥

দিনের পর দিন অমিতাভদের হুন্ করা চলেছে। হুন করাটা এখন অতিরিক্ত, পুলিশকে কর্মক্লান্ত করাই সংগ্রামের আসল রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানিকের কোকিলের দল গাছে গাছে বসে তাদের নানা কাজে সাহায্য করে; তাদের চাতুরী—সুচতুর পুলিশদলকেও হার মানিয়েছে। এই কেন্দ্রে এখন মাত্র তিনজন আছে, অমিতাভ, সুনির্মল, বিভূতি। পুলিশের দলকে নদীর পাড়ে দেখে অমিতাভ আদেশ দিলে ঠিক হয়ে বসতে। হুন করার ভঙ্গীতে সবাই বসে পড়লো।

দারোগা তাদের কাছে এসে দারুণ বিরক্তিতে বললেন, না এই তিনটেকে পারা গেল না। কাঁথি না পাঠিয়ে উপায় নেই—এই ছোঁড়ারা চল্ তোদের গ্রেপ্তার করলুম।

চলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, বরং যেন বেশি করে চেপে বসলো তিনজনেই।

গলাটা চড়িয়ে বললেন দারোগা, শালারা কি এমনি যাবে কাঁধে চেপে যাবার মতলব—আচ্ছা ফন্দী বার করেছে আজকাল। পুলিশদের আদেশ করলেন, তিনটেকে কাঁধে ওঠাও—গাঁয়ে গরুর গাড়ী ভাড়া করে কাঁথি জেলে চালান দিতে হবে।

দুজন করে পুলিশ এক একজন সত্যাগ্রহীকে মড়া ঝোলানো করে নিয়ে চললো দারোগার পেছনে। চাপা হাসিতে পেটে খিল ধরবার জোগাড় হয়েছে সুনির্মলের; সেটা ভোলার জন্যে সে চিৎকার করে উঠলো বন্দেমাতরম্। সবাই তাতে যোগ দিলে, দারোগা ভ্রুকুটি করে ফিরে তাকিয়ে আবার এগিয়ে চললো।

গ্রামে গরুর গাড়ীতে চাপবার সময় অমিতাভ দেখতে পেলে রাস্তায়

একধারে মাথায় কাপড় টেনে দাঁড়িয়ে সোনাদি ; মনটা ভারী হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি চোখটা নামিয়ে নিলে।

গ্রাম ছাড়িয়ে গাড়ী যখন আমবাগানের মধ্যে এসে পড়েছে তখন চারিদিকে কোকিল ডেকে উঠলো। পরিচিত মুখখানা দেখবার আশায় সবাই উঁকি মারলো গাড়ীর মধ্যে থেকে। দূরে একটা ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে মানিক হাত উঠিয়ে বিদায় জানালো। সশব্দে এগিয়ে চললো গরুরগাড়ীটা কাঁথির পাকা রাস্তা ধরে।

কাঁথির জেলে এসে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। বড ফটকটা খুলতেই তাবা শুনতে পেলে সুধীরের গান, তোরা ভয় দেখিয়ে করছিস শাসন্ জয় দেখিয়ে নয় ; পুলিসের কাঁধে ঝুলতে ঝুলতে হাঁকলে তিনজনে বন্দেমাতরম্। জেলের থেকে গুটিকতক সত্যাগ্রহী এসে দাঁড়ালো গেটের সামনে। পুলিশের দল অমিতাভদের মাটিতে ফেলে দিয়ে ফিরে গেল গেটের বাইরে, বড় ফটকটা আবার কোঁকাতে কোঁকাতে বন্ধ হলো। পেছনে হাত বোলাতে বোলাতে তিনজনে জেলের মধ্যে ঢুকে গেল।

কাঁথি মহকুমা অনুপাতে জেলের পরিধি। আগে সরকার ভাবেনি বোধ হয়, দস্যু তস্করের পরিবর্তে সাধুরা দলে দলে এখানে এসে বাসা বাঁধবে। জেলের চলতি নিয়ম কানুন অমান্য করে সংখ্যাধিক সত্যাগ্রহীতে পরিপূর্ণ। এরা দস্যুও নয় তস্করও নয়, কাজেই সাধারণ মানবিক নিয়ম এদের বেলায় খাটে না। আইন অমান্য-কারীদের জন্যে আইনঅমান্য দোষের নয়।

অমিতাভদের দেখে রান্না ছেড়ে ঈশ্বরদা একটা চালা থেকে বেরিয়ে বললেন একগাল হাসি হেসে, এই যে তোমরা এসে গেছ ? ভাল হলো খানিকটা বিশ্রাম করে নাও, সরকারী খিচুড়ী খাও আর ঘুমোও, দেখবে দিনকতকের মধ্যেই শরীর সেরে গেছে।

সুধীর এসে অভিনয়ের ভঙ্গীতে তাদের সামনে হাত নেড়ে গান

শুরু করে দিলে—কারার এই লৌহ কপাট ইত্যাদি গান শেষে জেলটা কাঁপিয়ে শতকণ্ঠে চিৎকার উঠলো বন্দেমাতরম্।

সুধীর অমিতাভকে বললে, চলো ভেতরে সব আলাপ করিয়ে দি। লম্বা ঘরের মধ্যে ঢুকে সবাইকে দেখিয়ে বললে, আমাদের নাগা দল, পিছাবনীর সেরা দল।

চললো আলাপ পরিচয়ের পালা। সবাই আগ্রহের সঙ্গে অমিতাভদের সংগ্রামের কাহিনী শুনতে লাগলো।

একটি লোক এগিয়ে এলেন অমিতাভদের কাছে: রোগা লম্বা চেহারা, নাকটা খাঁড়ার মত ঝুলছে, পাকানো চোখ দুটো যেন দুধারী তলোয়ার, বিঁধে চলে যাবে। একটু সংকুচিত হয়ে পড়লো তিনজনেই। তিনি হেসে বললেন, আচ্ছা বলোত কেন এসেছ কাঁথি? এই সরল প্রশ্নটায় সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল; অমিতাভ বললে দ্বিধাহীন কণ্ঠে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে।

স্বাধীনতা মানে? হেসে বললেন তিনি।

মানে, যেমন স্বাধীন ইংল্যাণ্ড আমেরিকা।

তাতে লাভ কি? আমেরিকার শত শত লোক ডাস্টবিনের থেকে খাবার কুড়িয়ে এই সেদিনও খেয়েছে।

খানিকক্ষণ চুপ থাকলো সে তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, স্বাধীনতা পেলে সে সমস্যার সমাধান করবে দেশবাসী—স্বাধীনতা আগে।

তার পিঠে একটা চাপড় মেরে তিনি বললেন, ঠিক, স্বাধীনতা আগে কিন্তু এই কথাটাও ভুললে চলবে না ভাই—মনে রাখতে হবে, তোমার ওই সোনাদি ওই মানিকদের স্বাধীনতার কথা।

তিনি অন্য দিকে চলে গেলেন, অমিতাভ জিজ্ঞেস করলো সুধীরকে, উনি কে সুধীরদা?

জানি না। নাম মহেশ ভাদুড়ী, ওঁর অর্ধেক কথা বোঝা যায় না। তোমরা এখন বিশ্রাম করো।

॥ ৭ ॥

কাঁথি জেলে এসে অনেক দিন পর আরামে দিবানিদ্রা দিচ্ছে অমিতাভ। সুধীরের ঠেলাঠেলি আর বন্দেমাতরম্ চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই সুধীর বললে, উঠে পড়ো। হাঁদা এসেছে। কথাটা বুঝতে না পেরে বোকার মত চেয়ে রইল অমিতাভ।

এখানের পুলিশের বড়কর্তা, জেল পরিদর্শনে এসেছেন। অদ্ভুত লোক, হাসতে হাসতে লাথি চালান সত্যাগ্রহীদের ওপর, যেন ফুটবলে পেনালটি কিক্ করছেন।

বাইরে বেরিয়ে দেখলে সার দিয়ে সত্যাগ্রহীরা দাঁড়িয়ে এবং একজন সায়েবি পোশাকপরা লোক সদর্পে পায়চারী করছেন। ছোট্ট মেয়েলি ছাঁদের চেহারা, মুখে সুকুমার লালিত্য, রং ধবধবে, কোঁকড়া চুলগুলো ব্যাক্‌ব্রাশ করা।

সুন্দর কান্তি এই লোকটি হুদা সাহেব। যাঁর নির্দেশে চলেছে কাঁথির যা কিছু।

অমিতাভ যেন বিশ্বাস করতে পারলো না। ফিরে ফিরে তাকালো তাঁর দিকে।

মুচকি হেসে সুধীরের মুখের দিকে দেখছেন হুদা; সেও চেয়ে আছে সোজা।

কোথায় বাড়ি হে? প্রশ্ন করলেন পুলিশকর্তা।

ঢাকা। উত্তর দিলে সুধীর।

চোখ দেখে টেররিস্ট মনে হচ্ছে, কি হে টেররিস্ট নাকি?

অহিংস সৈনিক, সত্যাগ্রহী।

'ওটা ভাঁওতা। জোরে হেসে উঠলেন পুলিশ কর্তা। ঢাকায় আমারও বাড়ি, চিনে রাখছ নাকি?

কত লোককে চিনবো ? সুধীর বললে।

একটু গম্ভার হয়ে গিয়ে বললেন পুলিশকর্তা, তা হলে টেররিস্ট এটা স্বীকার করছো ?

না, সত্যাগ্রহী—উত্তর এলো।

একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন হুদাসাহেব, ও সব চালাকি আমরা বুঝি।

সুধীর চুপ করে গেল, হুদা সাহেব এগিয়ে গেলেন অন্য ছেলের সামনে।

অমিতাভ ভাবলে, ফন্দী মন্দ নয়, সত্যাগ্রহীকে টেররিস্ট আখ্যা দিয়ে প্রভুর স্বরই বিবর্ধিত করছে।

হুদাসাহেব পরিদর্শন শেষ করে কম বয়সের সত্যাগ্রহীদের জেলের বাইরে নিয়ে যাবার জন্মে পুলিশকে আদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

অমিতাভ সুনির্মল ইত্যাদি জনদশেক সত্যাগ্রহীকে পুলিশদল টেনে বার করলে লাইন থেকে। তারা লাইনের বাইরে এসে বসে পড়লো মাটিতে।

পুলিশদল যত তাদের তোলার চেষ্টা করে ছেলেরা তত গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। অগত্যা হুজন করে পুলিশ এক একজন সত্যাগ্রহীকে ঝুলিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ানো মোটরবাসে ভরাবস্তার মত ছুঁড়তে লাগলো ; তারা পড়ে পড়ে চিৎকার করে উঠলো বন্দেমাতরম্।

দশজন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে বাস ছুটলো কণ্টাই রোড স্টেশনে।

স্টেশনে লাল কাঁকরের ওপর লম্বা হয়ে শুলো সত্যাগ্রহীদল। একজন পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করলে অমিতাভকে, বাড়ি কোথায় বাবু ?

মেদিনীপুর। উত্তর বেরিয়ে গেল অমিতাভর। অন্য সবাইকে জিজ্ঞেস করতে সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, মেদিনীপুর জেল।

একখানা কলিকাতাগামী ট্রেন, এসে থামলো ; সত্যাগ্রহীরা চিৎকার করে উঠলো বন্দেমাতরম্। ট্রেন থেকে যাত্রীদের সমস্ত মুখগুলো বেরিয়ে এলো জানালা দরজা দিয়ে। আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলো সত্যাগ্রহীদের সমর কৌশল।

সত্যাগ্রহীদের ট্রেনে তোলার সমস্যায় ট্রেনখানা নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধঘণ্টা পরে স্টেশন ছাড়লো।

খড়্গপুরে আবার একই পদ্ধতিতে অমিতাভদের নামানো হলো। চিৎকার করে গলা তাদের ভেঙ্গে এসেছে।

মেদিনীপুরগামী একখানা ট্রেন এসে থামতেই পুলিশদল আবার তৎপর হয়ে উঠলো। গাড়ীতে যথেষ্ট ভিড়, দশজনকে কাঁধে করে ট্রেনে তুলতে পুলিশদের বেশ বেগ পেলে।

অমিতাভকে ওঠাবার সময় তারা বিরক্ত হয়ে তাকে গাড়ীর ভেতরে জোরে ছুঁড়ে দিলে ; একজন যাত্রীর গায়ে ধাক্কা খেয়ে অমিতাভ ছিটকে গিয়ে পড়লো ; ষ্টীল ট্রাঙ্কের একটা ধারালো কোণে তার মাথাটা সজোরে লাগতেই ঝনঝন করে উঠলো সমস্ত শরীরটা, সে চোখ বুজলে।

গাড়ীর যাত্রীদল ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলো, রক্ত! রক্ত!

লালটকটকে রক্ত তখন অমিতাভর মাথার থেকে নগ্ন গা বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সে মাথাটা হেলিয়ে পড়ে আছে—বেদনাবোধ বুঝি তার লোপ পেয়েছে।

সত্যাগ্রহী, পুলিশ যাত্রী ও সকলেই কি কর্তব্য ঠিক করতে না পেরে ছটফট করে উঠলো।

এক সঙ্গে অনেকগুলো হাত এগিয়ে এলো, ভিজে ন্যাকড়া নিয়ে ভেজানো কাপড়ের ফালি বেঁধে অমিতাভকে জনকয়েক মিলে তুলে শুইয়ে দিলে ইতিমধ্যে খালি করা একটা বেঞ্চির ওপর।

মাথার শাদা কাপড় লাল হয়ে ওঠে আর একটা শাদা কাপড়

চেপে ধরে। বহুক্ষণ পরে রক্ত যখন থামলো, অমিতাভ তখন ক্লান্তিতে ঢলে পড়েছে।

মেদিনীপুর স্টেশনে তাকে আস্তে আস্তে ধরে নামানো হলো, অন্য সত্যাগ্রহীদের কাঁধে করে নামালো পুলিশদল।

স্টেশনের বাইরে একটা গাছের গোড়ায় তাদের বসিয়ে পুলিশ অদৃশ্য হলো।

লজ্জায় লাল হয়ে পুর্ণিমার চাঁদ তখন একটা তামার থালার মত দেখা দিয়েছে পুর্বাঞ্চলে।

দারুন দুশ্চিন্তায় সত্যাগ্রহীরা ঝুঁকে পড়লো অমিতাভর মুখের দিকে : তারা কি করবে, কোথায় যাবে, কার কাছে সাহায্য নেবে। কিছুই ঠিক করতে পারছে না। আকুলভাবে বারে বারে তাকাতে লাগলো ট্রেন থেকে নামা জনস্রোতের দিকে।

মোটরের একটা তীব্র আলো এসে পড়লো তাদের মুখে। বিস্মিত ছেলের দল লক্ষ্য করলে গাড়ীটা তাদের সামনে এসে থেমেছে।

গাড়ী থেকে নেমে এলেন একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ও একটি স্ত্রীলোক!

তাদের কানে এলো—জ্যাঠামশায়! মিনটুদা নিশ্চয়!

আশায় ভোরে উঠলো ছেলেদের মন। ভদ্রলোককে ছাড়িয়ে মেয়েটি এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লো অমিতাভর দিকে, আর্তস্বরে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, মিনটুদা মিনটুদা, জ্যাঠামশায়।

ভাল করে দেখে ভদ্রলোক বললেন, তাই তো হারাধনের ছেলেই তো বটে! ছেলেদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ এখানে এলো কি করে? অজ্ঞান হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

সত্যাগ্রহীদের একজন কাঁথি জেল থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বলে গেল।

রুনু তখন অমিতাভর বুকে হাত দিয়ে ডাকছে, মিনটুদা মিনটুদা।

তার ডাকটা যেন করুণ কান্নার মত শোনাচ্ছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে দুটো মুখে, একটা মুখ নিজ.ব ফ্যাকাসে, আর একটা মুখে শঙ্কিত ব্যাকুলতা, চোখের কোণে মুক্তার মত দুফোঁটা জল টলটল করছে।

একজন ছেলে শিবকালীবাবুর দিকে চেয়ে বললে, আমরা নিজেদের জন্যে ভাবি না, অমিতাভকে নিয়ে যাবো কোথায় ঠিক করতে পারছি না।

ওকে তোমরা আমার গাড়ীতে তুলে দাও, আর তোমাদের একটা ঠিকানা লিখে দিচ্ছি সেখানে গেলে মেদিনীপুর কংগ্রেস· থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবে, টাকা পয়সা কিছুই তো নেই তোমাদের কাছে, কলকাতায় ফিরতে হলেও তো তোমাদের এখন ফেরা সম্ভব নয়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছেলের দল গিয়ে দাঁড়ালো অমিতাভর কাছে, অচৈতন্য অমিতাভর কপালে গালে হাত বুলিয়ে তারা বিদায় নিলে; ধীরে ধীরে তুলে দিলে তাকে পেছনের সিটে।

কার্ডের ওপর একটা ঠিকানা লিখে শিবকালীবাবু ছেলেদের হাতে দিলেন।

মোটরটা স্টার্ট দেবার সময় নেচে উঠলো; ছেলেরা কতকটা নিশ্চিন্ত হলো মোটরের গতিপথের দিকে চেয়ে।

॥ ৮ ॥

শিবকালীবাবুর বাড়ি মেদিনীপুরে শহরতলীর মধ্যে। বাইরের দিকে একটা ঘরে শোয়ানো হয়েছে অমিতাভকে। শিবকালীবাবু বসে আছেন ডাক্তারের অপেক্ষায়।

রুনু অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অমিতাভর ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে।

শিবকালীবাবুর বড়ছেলের সঙ্গে ডাক্তার এসে ঘরে ঢুকলেন। কোন কথা না বলে তিনি প্রথমে পরীক্ষা করলেন অমিতাভকে।

শিবকালীবাবু প্রশ্ন করলেন, কি রকম দেখছেন?

হার্টের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল, এখুনি ইন্‌জেক্‌শন দিতে হবে।

যা দরকার করুন, ছেলেটি আমার বিশেষ আত্মীয়।

রক্তক্ষয় খুব বেশি হয়েছে, দেখি—

ডাক্তার গম্ভীরভাবে ব্যাগ থেকে ইন্‌জেক্‌শন বার করে দিতে দিতে বললেন, একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, আনিয়ে রাখুন, জ্ঞান হলেই খাইয়ে দেবেন। দু এক ঘণ্টার মধ্যে যদি জ্ঞান না হয়, আমায় ডেকে পাঠাবেন।

ইন্‌জেক্‌শন সেরে ডাক্তার বিদায় নেবার পর শিবকালীবাবু বললেন, খোকা না হয় বসুক, তুমি একটু বিশ্রাম করোগে রুনু!

না জ্যাঠামশায়। আমার কোন কষ্ট হবে না, জ্ঞান হলেই যাব—তাড়াতাড়ি বললে রুনু।

শিবকালীবাবু আরাম চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। খোকা মানে, তাঁর বড়ছেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি; চাঁদের আলোর এক ঝলক এসে

পড়েছে অমিতাভর মোমের মত মুখে, রুনুর ব্যগ্র চোখের দৃষ্টি, স্থির হয়ে পড়ে আছে সেখানে।

শিবকালীবাবু নিদ্রিত। চাঁদের আলো সরে গেছে অমিতাভর বুকে, বেতের ঘায়ে ফাটা ফাটা দাগগুলো চকচক করছে। তার রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে যাচ্ছে রুনু।

হঠাৎ অমিতাভর বুকটা ফুলে উঠলো। সে চোখ খুলে চাইলে, ঝুকে পড়লো রুনু তার মুখের দিকে, উৎফুল্ল স্বরে ডাকলে, মিনটুদা। মিনটুদা।

অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অমিতাভ তার মুখের দিকে।

আমি। আমি মিনটুদা। চিনতে পাচ্ছ না?

একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ভেসে গেল তার ঠোঁটে।

জ্যাঠামশায়, জ্যাঠামশায়। মিনটুদার জ্ঞান হয়েছে!

শিবকালীবাবু ধড়মড়িয়ে উঠে গেলাসে ওষুধ ঢেলে বললেন, এটা তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাও মা।

গেলাসটা মুখের কাছে ধরে রুনু বললে, ওষুধ খেয়ে নাও মিনটুদা, অমন করে চেয়ে আছ কেন?

অমিতাভ কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। হাঁ করে ওষুধ খেলে স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার ভয়ে কোনো কথা বললে না।

তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্যাকুলভাবে বললে রুনু, অমন করে চেয়ে থেকো না, কথা বলো মিনটুদা।

আমি কোথায়? দুর্বলকণ্ঠে বললে অমিতাভ।

জ্যাঠামশায় তোমাকে আমাদের বাড়িতে তুলে এনেছেন।

রুনু!

হ্যাঁ আমি মিনটুদা।

শিবকালীবাবু উঠে এসে বললেন, গরম দুধ একটু খাইয়ে দিলে হয় না?

হ্যাঁ এই যে নিয়ে আসি, বেরিয়ে গেল রুনু ঘর থেকে।

দুধ এনে আস্তে আস্তে ডাকলে রুনু, একটু দুধ খেয়ে নাও মিনটুদা।

চোখ না খুলেই অমিতাভ হুঁ করলে; রুনু তাকে দুধ খাইয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দিলে মুখটা; তারপর বসলো মাথার কাছে।

মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে রুনুও যখন ঘুমে ঢলে পড়লো পুবের আকাশে তখন রংয়ের খেলা শুরু হয়েছে।

॥ ৯ ॥
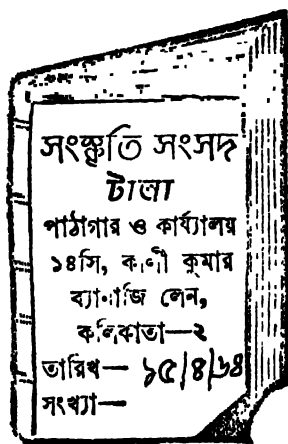
সম্পূর্ণ অসংযত অবস্থায় বসে ব্রজবিহারীবাবু। ঘরে এসে ঢুকলো সুরেশ। তাকে দেখে জড়িতকণ্ঠে বললেন, এই যে সুরেশ, তোমার যে পাত্তাই মেলে না আজকাল!

নানা কাজের ভিড়ে এদিকে আসতে পারিনি, তাচ্ছিল্যের সুরে বললে সুরেশ। তার কাছে উঠে গিয়ে একটু হেসে বললেন ব্রজবিহারীবাবু, দাও দিকি গোটা কতক টাকা।

সুরেশ খুশিমনে পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট তাঁর হাতে গুঁজে দিলে। ব্রজবিহারীবাবু বললেন তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে, তুমি বেশ লোক মাইরি! আমি বেরোব। জামা না পরেই ব্রজবিহারীবাবু বেরিয়ে গেলেন; সুরেশ ভেতরে গেল।

মালতী একমনে বই পড়ছে, সুরেশ পা টিপে গিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরলে। হেসে বললে মালতী, যাও তোমার সঙ্গে কথা বলবো না, আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ।

তার গা ঘেঁসে বসে পড়ে বললে সুরেশ, তুমি তো চাও না আমার আসা।

কৌতুকভরা চোখে তাকাল মালতী তার দিকে, দেখলে সুরেশ চেয়ে আছে, তার বুকের খসে যাওয়া কাপড়টার ফাঁকে।

সঙ্কুচিত হয়ে সে কাপড়টা ঠিক করে নিলে।

মালতীকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বললে সুরেশ, এখনও আমার কাছে এত লজ্জা কেন মালতী?

তার কাঁধে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে মালতী চুপ করে রইল।

দু হাতে তার মুখখানা তুলে ধরে বললে সুরেশ, তোমায় আজ উত্তর দিতেই হবে মালতী!

লজ্জা করে যে। জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিল মালতী।

তুমি আমায় আজকাল এড়িয়ে চলো মানে অবজ্ঞা করো।

তার কণ্ঠস্বরে ভীত হয়ে পড়লো মালতী, সে তার মাথাটা সুরেশের বুকে চেপে ধরে বললে, না না ভুল।

সুরেশ তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো মালতীর সমস্ত শরীরটা, সেও নিজেকে যেন আলগা করে ছেড়ে দিলে।

সুরেশ তার মুখখানা তুলে ধরে লোভী ঠোঁট দুটো চেপে ধরলে তার কম্পিত ঠোঁটে।

মুহূর্তের মধ্যে মালতীর চোখের সামনে থেকে সব কিছু মিলিয়ে গেল, এলিয়ে পড়লো সে।

মালতী অনুভব করলে, সুরেশের সাপের মত পাঁচটা আঙ্গুল নেবে যাচ্ছে তার শরীরের ওপর দিয়ে।

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করে, চাইল সুরেশের দিকে : দেখলে সুরেশের চোখে অদ্ভুত মিনতিভরা দৃষ্টি। সে আবার হাত বাড়ালো তাকে ধরবার জন্যে। বেদনাতুর কণ্ঠে বললে মালতী, না, না, সুরেশ।

উন্মত্তের মত সুরেশ তাকে চেপে ধরলে বুকের মধ্যে ; তার ক্ষিপ্ত শরীরটাকে দু হাতে সরিয়ে এক ঝটকা মেরে উঠে গেল মালতী। দুরে দাঁড়িয়ে শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইলে সুরেশের দিকে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

ক্রুর একটা হাসি ফুটে উঠলো সুরেশের মুখে ; সে বললে কঠিন স্বরে, সতীপণা। টাকা নেবার সময় এ জ্ঞানটা থাকে কোথায়।

ভু-দোল লেগেছে মালতীর পায়ের তলায়, সে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লো। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সুরেশ আরো বীভৎস ভাবে বললে, ন্যাকামির শেষ করো নয় তো পেটে ভাত জুটবে না।

আমি না তোমার ভাবী স্ত্রী! অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো মালতী।

মুখে একটা কুৎসিত শব্দ করে সুরেশ বললে, ভাবী স্ত্রী! ব্যবসা মন্দ কাঁদনি।

মালতীর চোখ দুটো যে অন্ধ হয়ে গেল, কথা বলার শক্তি পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেললে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সুরেশ আবার তাকে চেপে ধরলে জোর করে।

ঘরে এসে ঢুকলো ললিত। তাকে দেখে একলাফে সুরেশ দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত ললিত চাইল মালতীর দিকে, সে তখন দু হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। তীব্রকণ্ঠে সে ডাকলে, দিদি।

না না আমি না আমাকে জোর করে, ভীতকণ্ঠে উত্তর দিলে মালতী।

অনুযোগের সুরে বললে ললিত, আর একটা মাস......

কথা শেষ করার আগেই উত্তেজিত মালতী বলে উঠলো, ভুল ভুল! ও আমাকে বিয়ে করতে চায়নি, বাবাকে টাকা দিয়ে আমাকে কিনতে চেয়েছে। নিজে মুখে বলে গেল—এটা নাকি আমাদের ভাল ব্যবসা।

শেষের দিকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মালতী। দাঁতে দাঁত টিপে বললে ললিত, তাই বুঝি তোমার ওপর জোর করতে সাহস পায়।

ওটা লম্পট লম্পট। রুদ্ধকণ্ঠে বললে মালতী।

মাথার মধ্যে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো ললিতের। সে চেঁচিয়ে উঠলো, আচ্ছা দেখে নিচ্ছি। তারপর ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কান্নায় ফুলে ফুলে মালতীর শরীর গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

॥ ১০ ॥

রুনুর সেবায় ও শিবকালীবাবুর ঐকান্তিক সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যেই অমিতাভ পুর্বের স্বাস্থ্য ফিরে পেল।

প্রথম প্রথম তার দারুণ সংকোচ লাগতো এখানে কিন্তু সে যখন আবিষ্কার করলে, শুধু পুর্ব পরিচিত হিসাবেই নয়, শিবকালী বাবু তাকে যথেষ্ট স্নেহের চোখেই দেখেন তখন তার সংকোচ কেটে গেল অনেকটা।

গান্ধীজি ও খদ্দরের ওপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা অমিতাভ লক্ষ্য করেছে; এমন কি বে-আইনী কংগ্রেসের সঙ্গে তার সংযোগ আছে মনে হয়; রুনু তো প্রকাশ্যেই শহরের চরকা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। এতটা অমিতাভ কোন দিনই আশা করেনি। তার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শিবকালীবাবু পঞ্চমুখ; প্রশংসার ঠেলায় মাঝে মাঝে অমিতাভ নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে, শিবকালীবাবুর বন্ধুদের কাছে কাঁথির গল্প বলতে বলতে সে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেছে।

একটা আরাম চেয়ারে বসে অমিতাভ, বাগানে ঝাপালো ঝাউ গাছটার দিকে চেয়ে নানা কথা ভাবছে। রুনু এসে জিজ্ঞেস করলে, চা দেবো মিনটুদা? কি ভাবছো?

অমিতাভ চাইলে রুনুর দিকে: একটা নিশ্বাস নিয়ে বললে, ভাবছি এইবার কবে বিদায় নেব।

রুনুর হাসিভরা মুখখানা কাল হয়ে এলো, অভিমানের সুরে বললে, এখুনি ও কথাটা নাই-বা ভাবলে!

স্বপ্নালু চোখে সে চাইল রুনুর দিকে: কি যেন নতুন জিনিস দেখতে পেলে তার সাদা থানে ঢাকা মূর্তিটার মধ্যে। ছোটবেলায়

যাকে মেরে কাঁদানো যেত না, সে আজ সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে। অনির্বচনীয় আকর্ষণে অমিতাভর মনটা ব্যথাতুর হয়ে উঠলো, সে রুনুর একটা হাত টেনে নিয়ে বসালে পাশের চেয়ারে, মৃদুভাবে বললে, রুনু মনে পড়ে আমাদের সেই দিনগুলো ?

পড়ে মিনটুদা—জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলে রুনু।

আবার কি ফিরিয়ে আনা যায় না সেই দিনগুলো ?

খুশিতে ভরে উঠলো রুনুর মন, সে মাথাটা ঘুরিয়ে বললে, কি জানি।

অমিতাভর মনের কোণে তুফান এলো। স্বপ্নজড়িত কণ্ঠে সে বললে, জান রুনু এটা কার দেশ ?

বিস্মিত রুনুর চোখ তার ওপর সোজা এসে পড়লো, সে বললে জোর দিয়ে বিদ্যাসাগরের। প্রশ্নের আসল অর্থ বুঝে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো রুনু, তার গাল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

চমকে উঠলো অমিতাভ, সে বুঝি এই কথায় রুনুর মনে ব্যথা দিয়েছে। অনুশোচনার সুরে বললে সে, আমায় ক্ষমা করো রুনু—আমায় ক্ষমা করো।

ক্ষীণ হেসে রুনু তার হাতদুটো ধরে বললে, পাগলের মত কি বোকছো। চলো তোমাকে চরকা কাটতে শিখিয়ে দি।

লজ্জিত অমিতাভ তার পেছনে পেছনে গিয়ে ঢুকলো অন্য ঘরে। মেজেতে অনেকগুলো চরকা সাজানো, একটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে রুনু, ওইটেতে তুমি বসো, সহজে শিখতে পারবে।

অমিতাভ মাথা নিচু করে গিয়ে বসলো চরকার সামনে ; একটা লম্বা তুলোর পাঁজ তার হাতে ধরিয়ে বললে রুনু, এই রকম ভাবে ধরো—তারপর ডান হাতে চাকা ঘোরাও বাঁ হাতে পাঁজ টেনে যাও। যন্ত্রচালিতের মত সে রুনুর কথা অনুযায়ী চেষ্টা করতে লাগলো ; দুটো হাত কিছুতেই সমানে চালাতে পারছে না ; একটা হাত

থেমে যায় আর একটা চলে। সুঁচের মুখে সুতোর পাক বার বার গুটিয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

অসহায় দৃষ্টিতে সে তাকালো রুনুর দিকে, ঝরনার মত উচ্ছল হাসি হেসে উঠলো রুনু।

ঘরে এসে ঢুকলেন শিবকালীবাবু। রুনুর এত দিনের ম্লান মুখখানা হাসি ভরে উঠেছে দেখে তিনি বিস্মিত ভাবে চাইলেন তার দিকে। তাঁকে দেখে হাসির সুরেই বললে রুনু, দেখ জ্যাঠাবাবু তোমার সেরা গান্ধীভক্তর চরকা কাটতে গিয়ে কি ফ্যাসাদ।

শিবকালীবাবু হেসে বললেন অমিতাভর দিকে চেয়ে, তাই নাকি হে ? শিখে নাও শিখে নাও, লজ্জার কথা।

তিনি চলে গেলেন। রুনু অমিতাভর পেছনে বসে তার দুটো হাত ধরে বললে, এই রকম করে চালাও বুঝেছ ? আবার চললো কিছুক্ষণ অক্ষম চেষ্টা ; রুনু আবার হেসে উঠলো।

অমিতাভ গম্ভীর ভাবে বললে, কেন আমায় ভোলাতে চেষ্টা করছো রুনু ? আমার কথায় ব্যথা না পেলে চোখ দিয়ে তোমার জল গড়ায়। তার হাতদুটো জোরে চেপে ধরে রুনু বললে জলভরা গলায়, আমায় বিশ্বাস করো অমিতাভ, ব্যথা আমি পাইনি।

॥ ১১ ॥

মহানগরীর বুকে শ্রাবণের ঘন বর্ষণ শুরু হলো। সৃষ্টির রহস্য শূন্য নিষ্ফল বর্ষণ বিষাদাচ্ছন্ন করেছে সমগ্র পরিবেশ। ধারার প্রবাহে নগরীর কৃত্রিম সৌন্দর্য মুছে যায়, কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে সুগঠিত রাজপথ। কিন্তু এই বর্ষণই নগরীর অলক্ষ্যে ধরণীর বুক ভরে তোলে নব সৃষ্টির দৌলতে, এই অভিজানা কথা বুঝি অজানা রয়েছে রামকালীবাবুর।

ক্রমান্বয়ে দুদিন অবিশ্রান্ত বারিপাত হয়ে চলেছে; বিরক্তিতে অবসাদে ক্রমেই তাঁর দৃষ্টিপথ হয়ে আসছে ঘোলাটে, একটানা নিঃসঙ্গতার মধ্যে চিন্তার জটিলতা পাকের পর পাক ঘুরে চলেছে, বুঝি বর্ষণ বন্ধ হলেই চিন্তার বন্ধন আলগা হয়ে আসবে।

ঐতিহাসিক বোধি বৃক্ষের মূল কাণ্ডের তাগিদে নিরাশ রামকালী বাবু দেখতে পান না যে অমর-বৃক্ষ, প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে সহস্র বাহু বাড়িয়ে মাটির বুক থেকে রস সংগ্রহ করে চলেছে।

তাঁর সুপরিচিত যাত্রাপথ যখন কালের গতিমুখে সর্পিল হয়ে ওঠে, তখন তিনি অন্ধমায়ার অব্যক্ত বেদনায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন: স্নেহান্ধ অভিমানের কুয়াশায় জীবনের মানে খুঁজে পান না।

ইদানীং নানা সমস্যা উপর্যুপরি দেখা দিয়েছে: আজ দুদিন হলো খবর পেয়েছেন মেদিনীপুরে বে-আইনী কংগ্রেসের সংযোগ সূত্রে শিবকালীবাবু, রুনু, মিনটু গ্রেপ্তার হয়েছে; তাদের বিচারের দিন আজ। অমিয়কান্তি জেলে; ললিত আজ তিন দিন হলো নিরুদ্দেশ, জনরব সে নাকি খুন করে ফেরার হয়েছে।

যারাই তাঁর প্রিয়জন, আপনার পক্ষপুটে যাদেরই নিরাপদে আশ্রয় দিতে চেয়েছেন—কোন অসতর্ক মুহূর্তে শ্যেনের সুতীক্ষ্ণ চঞ্চু একে একে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রামকালীবাবু যেন মহাসমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন; তার স্ফীত উত্তাল তরঙ্গ কে রোধ করবে—কে রোধ করবে এই অনিবার্য তরঙ্গের রুদ্রগতি।

বিরক্ত কুঞ্চিত মুখে ঘরে ঢুকলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। চিন্তাকুল রামকালীবাবুর পাশে বসে ডাকলেন, দাদা।

কি? বললেন রামকালীবাবু তাঁর দিকে চেয়ে।

ওই ছোঁড়াটা সত্যিই সুরেশ ডাক্তারকে খুঁন করেছে।

কি করে জানলে?

ওই যে পুলিশ এসেছে তার খোঁজ করতে।

পুলিশ এসেছে।—চমকে উঠে পড়লেন তিনি—এ আমি বিশ্বাস করি না, এ হতে পারে না চলো আমার সঙ্গে পুলিশের কাছে, ললিত খুন করতে পারে না।

ললিতদের দরজায় দাঁড়ানো দারোগাকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন রামকালীবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে, কি ব্যাপার, কিসের জন্যে এসেছেন এখানে?

তিনদিন পুর্বে এক ডাক্তার খুন হয়েছে, ললিত নামে এই বাড়ির একটি ছেলেকে দেখা গেছলো খুনের পরেই, তার ডিসপেনসারির থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে, সন্দেহ আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে সে সেইদিন থেকে ফেরার হওয়ায়—বললে দারোগা।

মিথ্যা। এ আমি বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস আপনি না করুন, আদালত বিশ্বাস করবে।

খানাতল্লাসী শেষ করে পুলিশদল ফিরে গেল। ঘরের মধ্যে থেকে একটা চাপা কান্না ভেসে এলো রামকালাবাবুর কানে, তিনি ভেতরে গেলেন।

বালিশে মুখগুঁজে মালতী কাঁদছে দেখে সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, মালতী মা কি হয়েছে আমায় সত্যি বলো।

পাগলের মত মুখ গুঁজেই বলে উঠলো মালতী। আমি দায়ী। আমি দায়ী। জ্যাঠাবাবু আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

এ হেঁয়ালী বুঝতে না পেরে রামকালীবাবু অসহায় ভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বৈঠখানায় এসে ব্রজেন্দ্রনাথ বললে, যত ঝঞ্ঝাট কি আমাদের বাড়িতেই এসে জোটে। ভাড়াটেগুলো তুলে দিয়ে নতুন ভাড়াটে বসাতে হবে দাদা।

দার্শনিকভঙ্গীতে বললেন রামকালীবাবু, তাতেই কি কুল পাবে ব্রজ, এ যে মহাসমুদ্রের বান। সব তচনচ করে দিয়ে যাবে।

আবার নিজের জায়গায় বসলেন রামকালীবাবু; সহস্র চিন্তার দ্বন্দ্ব তাঁর বনেদি মুখে বাঙ্ময় হয়ে উঠলো।

॥ ১২ ॥
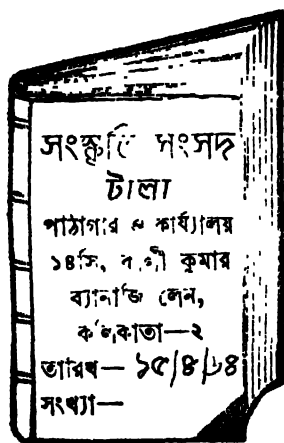
মেদিনীপুরের আদালত লোকে লোকারণ্য। সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শিবকালী মিত্র, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী, ও অমিতাভর বিচার হবে।

একটা রেলিংঘেরা জায়গার মধ্যে এক ধারে বসে শিবকালীবাবু, অন্যদিকে একটা বেঞ্চিতে বসে রুনু ও অমিতাভ।

গুরুগম্ভীর স্বরে সরকারী উকিলকে বললেন বিচারক, ওঁদের আইনজ্ঞের দ্বারা বিচার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করছি।

আদালত পিওন হাঁকলো, অমিতাভ রায় হাজির।

বুকটাকে চিতিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো অমিতাভ। বিচারক তার দিকে চেয়ে বললেন, আমার মনে হয় সুবিচারের জন্যে তোমার আত্মপক্ষ সমর্থন করা উচিত—এখনও করতে পারো।

চকিতে কাঁথিব দৃশ্যগুলো ভেসে উঠলো অমিতাভর চোখে, সে রূঢ়কণ্ঠে বললে, অবিচারের রাজ্যে সুবিচার প্রত্যাশা করি না, বিচারের ন্যায় দণ্ড অত্যাচারীর জন্যে নয়।

রক্তজবার মত লাল হয়ে উঠলো বিচারকের মুখমণ্ডল; কাগজে খানিকটা লিখে, ইসারায় সরে যেতে বললে অমিতাভকে, পিওন হাঁকলো, সুমিত্রা দেবী হাজির।

রুনু উঠে দাঁড়ালো, বিচারক নম্রভাবে বললেন, আমার অনুরোধ আপনি মুচলেকা দিন। আপনারা স্ত্রীলোক, একি আপনাদের সাজে।

স্ত্রীলোক কি স্বাধীনতা চায় না, চিরদিন মুচলেকা দিয়েই ক্ষান্ত হবে। এ কিছুতেই সম্ভব নয়।

উত্তেজিত হবেন না, ভেবে দেখুন।

ভাববার কিছু নেই, আপনার বিচার শেষ করুন।

বিচারক লেখা শেষ করলেন, পিওন হাঁকলো, শিবকালী মিত্র।

শিবকালীবাবু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

বিচারক বললেন, আপনি সম্ভ্রান্ত লোক, আপনি নিজে দায়িত্ব নিলে আমি আপনাদের খালাস দিতে পারি।

স্মিত হাসি ফুটে উঠলো শিবকালীবাবুর মুখে, শান্ত স্বরে তিনি বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা আমার নেই, আপনি আপনার কর্তব্য পালন করুন।

বিচারক লিখে গেলেন তাঁর রায়। আদলত কক্ষে তখন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে দরদী জনতা।

গম্ভীরভাবে বিচারক রায় পড়তে আরম্ভ করলেন, বাদী ভারতেশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলের কানে গেল শুধু কটি কথা, অমিতাভ রায় সাজা এক বৎসর, সুমিত্রা দেবী সাজা ছয় মাস, শিবকালী মিত্র সাজা ছয় মাস। পুলিশের আদেশে তিনজনে বেরিয়ে এলো কোর্ট প্রাঙ্গনে; শতকণ্ঠে চিৎকার উঠলো, বন্দেমাতরম্। বারান্দায় দাঁড়িয়ে খান সাহেব নামে পরিচিত শাসনকর্তা, ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন জনতার দিকে।

শিবকালীবাবু, রুনু, অমিতাভ গাড়ী থেকে নামলো মেদিনীপুর জেলগেটের একটু দূরে। পুলিশে ঘেরাও করে নিয়ে চললো তাদের: সামনে শিবকালীবাবু, পাশাপাশি অমিতাভ, রুনু; যেতে, যেতে অকারণে কাঁধে কাঁধে ঠেকে যাচ্ছে; খুশির বান আসছে তাদের মনে, মুচকি হেসে পরস্পরের দিকে চাইছে।

এ যেন তাদের চিরদিনের যাত্রাপথ, এ পথ যেন শেষ না হয়; বাধার ওই প্রকাণ্ড লৌহদ্বার, ওটা তো পথরোধ করতে পারে না, ওটা অচলায়তনের দারিদ্র্যে পঙ্গু, গতির ঐশ্বর্যে তারা অপরাজেয়।

পঞ্চম সর্গ

॥ ১ ॥

গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে চলেছে ট্রেন ঃ ললিতের মনে হচ্ছে একটা নিরবচ্ছিন্ন অমানুষী অট্টহাসির ছন্দে কাল পিরাণ ঢাকা তমস্বিনীর দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যাচ্ছে। এর যেন শেষ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এই একই জায়গায় বসে ; কামরার অন্য যাত্রীদের দিকে ভাল করে চাইতে ভরসা পায়নি ; অদ্ভুত একটা ভীতির শিরশিরানি মাঝে-মাঝে বয়ে চলেছে তার মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে, ভেতরটা বুঝি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

জানালার বাইরে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে চাইল ললিত : চাবুকের মত হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগলো মুখে ; সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে আদিম সরীসৃপের মত এঁকে বেঁকে চলেছে ট্রেনখানা।

হঠাৎ তার মনে হলো, এ গতির কোন মানে নেই, কোন লক্ষ্য নেই। এই সর্বগ্রাসী তমিস্রা বুঝি অজেয়। এর দম্ভ সে চূর্ণ করবে : শরীরটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে শুধু একটা পায়ের ঝাঁকুনি। কথাটা ভাবতেও একটা আরামের নিশ্বাস বেরিয়ে এলো, শরীরটাকে জানলার বাইরে আরো খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ললিত চোখ বুজলে।

পাশে বসা বাঙ্গালী ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে ও মশায়, পড়ে যাবেন যে।

নিজেকে তাড়াতাড়ি সংযত করে নিলে ললিত, বুকের ভেতরটা ধকধক করে নেচে উঠলো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে সে বললে, আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারেন দয়া করে ?

বেঞ্চির তলায় কুঁজো থেকে এক গেলাস গড়িয়ে দিয়ে বললেন ভদ্রলোকটি, আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, শরীরটা ভাল নেই।—অজানা আশঙ্কায় ললিতের

মুখখানা কাল হয়ে উঠলো ; তার মনে হলো কোণে বসা হিন্দুস্থানীটি তাকে লক্ষ্য করছে—একটা হিমরেখা ব'য়ে গেল মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে, চট করে মাথাটা ঘুরিয়ে নিলে জানালার দিকে।

স্টেশনের কোলাহলে ললিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল ; জানালায় মাথা রেখে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুঃস্বপ্নের মত রাত্রি কোথায় মিলিয়ে গেছে ; সেডের ফাঁকে একফালি রোদ এসে পড়েছে কামরার মধ্যে। ললিতের মনে হলো পেছনে-ফেলে-আসা সব কিছু মিথ্যা ; আশায় ভরে উঠলো বুকটা--সে ভাল করে চাইলে চারিদিকে : নানা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, যুক্তপ্রদেশের মুসলিম সভ্যতার ছাপ তাদের চাল চলনে পোশাকে পরিচ্ছদে ; চেহারার মধ্যে বৈদেশিক নুতনত্ব। ললিত ভাবলে, এখানে তার অতীত ভোলা সোজা হবে, নুতন করে গড়ে তুলবে জীবনের পরিখা ; ফাঁসির দড়িতে মরতে পারবে না। এখানেই তাকে গাড়ী বদল করতে হবে আগ্রার পথে, সুটকেশটা হাতে নিয়ে সে নেমে পড়লো।

আগ্রা লাইনের গাড়ীতে এসে যখন সে উঠলো, বেলা তখন বেশ বেড়ে গেছে ; ফাঁকা কামরার মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে পা ছড়িয়ে বসলো, ট্রেনটা ছেড়ে দিল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে। মন্থর গতিতে চললো দুপাশের গমের ক্ষেত চিরে।

ছোট ছোট পল্লী স্টেশনে যাত্রীদলকে স্নেহময়ী মাতার মত কোলে তুলে নিয়ে ট্রেনখানা এসে পৌঁছুলো আগ্রার কাছাকাছি : দূরে যমুনার তীরে যেন নীল আকাশের গায়ে তুষারশুভ্র মেঘে আঁকা মর্মর স্বপ্ন, বিস্ফারিত চোখে চাইল ললিত—তাজমহল, তাজমহল।

আগ্রার ফোর্ট স্টেশনের সুড়ঙ্গে এসে ট্রেন থামলো। বুকটা যতদূর সম্ভব ফুলিয়ে মুখে প্রফুল্লতা টেনে এনে ললিত নেমে পড়লো প্লাটফর্মে, তারপর সোজা চললো বেরোবার গেটের দিকে।

অপরিচয়ের সংকোচ কাটিয়ে চারিদিকে চাইতে চেষ্টা করলো

ললিত স্টেশনের বাইরে, তার চোখে পড়লো যেন সেই সন্দেহজনক হিন্দুস্থানীটার মত একজন লোক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার একটা হিমরেখা বয়ে গেল শরীরে, দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে গেল টাঙ্গার দিকে।

সারি সারি টাঙ্গার একটাতে ত্বরিতপদে চেপে আদেশের সুরে বললে, চলো।

টাঙ্গাওয়ালার মুখের শব্দে চুকচুকে কাল ঘোড়াটা ছুটলো সদর রাস্তার দিকে। মোড়ের কাছে এসে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে টাঙ্গাওয়ালা চাইল ঘুরে ললিতের দিকে।

সে বললে, হোটেলমে চলো।

অদ্ভুত জোড়ালো গলায় টাঙ্গাওয়ালা উর্দুতে খানিকটা বলে গেল যার সব কথা না বুঝেও ললিত বুঝলে, আগ্রায় অনেক রকম হোটেল আছে কোথায় যাবে সে?

ছোট হোটেল। বলে চাইল তার দিকে।

সোজা হয়ে বসে টাঙ্গাওয়ালা ঘোড়াটাকে জোরে চালিয়ে দিলে চাবুকের ইঙ্গিতে।

যমুনার ধারে ধারে পাথরের বাঁধান বাদশাহী সড়কের ওপর দিয়ে চললো টাঙ্গাখানা: ক্ষয়ে যাওয়া এবড়ো খেবড়ো রাস্তার ঝাঁকুনিতে টাঙ্গা চাপায় অনভ্যস্ত ললিতের মনে হলো একটু অসাবধান হলেই সে বুঝি পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে।

শহরের জনবহুল রাস্তার গতিবেগ কমে এলো, দু পাশে সারি সারি দোকান, নানা বর্ণের পাগড়ি টুপি পায়জামা ঘাঘরা পরা কর্মব্যস্ত স্ত্রীপুরুষের ভিড়। সবই নূতন লাগছে ললিতের, তবু এই বিদেশী জনতা, এই রাস্তার ধারে সাবেকি ধরনের দোকানপাট, এই অপরিচিত গন্ধ, এই ঐতিহাসিক সড়ক, তার অতি পরিচিত অতিপ্রিয় মনে হচ্ছে।

টাঙ্গাটা একটা ছোট্ট গলির মুখে ঘুরে গেল, দু ধারের চাকা বুঝি লেগে যাবে দুদিকের দেওয়ালে।

টাঙ্গাওয়ালা দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়াটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে থামলো একটা পাথরের বাড়ির সামনে।

উর্দু ও ইংরাজিতে লেখা হিন্দু হোটেলের সাইন বোর্ড দেখে ললিত সুটকেশ হাতে নেমে পড়লো।

টাঙ্গাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে চারিদিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে পাথরের দরজা দিয়ে গলে গেল সে ভেতরে।

॥ ২ ॥

বিগত যৌবনা যমুনার পশ্চিমতীরে পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে শত শত বিস্মৃত অতীত কাহিনী-গর্বিত ও কলঙ্কিত আগ্রা দুর্গ। প্রকাণ্ড লাল পাথরের প্রাচীরের দিকে চেয়ে ঘাড়টা ধরে এলো ললিতের, সে মাথাটা নিচু করে মাটির দিকে চাইলে, কানে এলো, বাবুজী গাইড? পায়জামা পরা ছিপছিপে লপেটা মার্কা একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো সামনে।

ললিত তার মুখের দিকে চেয়ে চিন্তা করে অনিচ্ছার সুরে বললে, চলো! এগিয়ে চললো দুজনে। পকেট থেকে একটা আধপোড়া সিগারেট বার করে ধবিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে নানা কথা বলতে বলতে ছেলেটি চললো ললিতের পাশে পাশে,— প্রথমে সেলিম শাহ সুর এ দুর্গের গোড়াপত্তন করেন, পরে ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ আট বৎসর ধরে এই দুর্গ নির্মাণ করেন; এই দুর্গের নানা কাহিনী তার জানা: এখনও নাকি গভীর রাত্রে এর কোন কোন মহলে মানুষের কান্না শোনা যায়! তার বাবা একদিন শুনেছিলেন, ললিতকেও শুনিয়ে দিতে পারতো সে, কিন্তু ভেতরে রাত্রে দু একজন লোক মারা যাওয়াতে আজকাল বড় কড়াকড়ি হয়ে গেছে, রাত্রে ভেতরে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না।

তাই নাকি? তাহলে আজ আমি কোনো রকমে লুকিয়ে থাকবো রাত্রে, হাসতে হাসতে বললে ললিত। তার কথায় ব্যস্ত হয়ে ছোকরাটি বললে তাড়াতাড়ি, না না বাবুজী বিপদের কথা! আপনারা লেখাপড়া জানা লোক বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমরা জানি ওই হাতী গেটের মধ্যে দু-দুটো গোরা সৈন্য মারা গেছলো বলে

গোরা সৈন্যরা যারা এখানে থাকে তারাও ওদিকে যেতে সাহস করে না।

একটু হেসে চুপ করে গেল ললিত। গাইড ক্ষুণ্ণ মনে অমর সিংহের গেটের দিকে বড় বড় পা ফেলে চললো।

আরো জনকতক নরনারী দুর্গ দেখবার জন্যে এসেছে; তাদের মধ্যে একটি বাঙ্গালী পরিবারও রয়েছে। বাঙ্গালীর মুখ দেখলেই ললিতের সব মনে পড়ে, আশঙ্কায় তালু শুকিয়ে আসে। সবাইকে পাশ কাটিয়ে সে ভেতরে ঢুকে গেল; স্যাৎসেতে অন্ধকার রাস্তার দু-পাশে পাষাণ কক্ষ থেকে কেমন যেন একটা পরিচিত গন্ধ ভেসে এলো তার নাকে, মনে পড়লো, মিত্তির বাড়ির সদর দরজার দুপাশের রোয়াক : দিদির কাতর চিৎকার : ওটা লম্পট! ওটা লম্পট! তারপর জনবহুল রাস্তা, সুরেশ ডাক্তারের ডিসপেনসারি, উন্মত্তভাবে সুরেশকে আক্রমণ, সুরেশের অসাড় দেহ মেজেতে লুটিয়ে পড়া।

ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো ললিতের। গাইড ছোকরা একটু হেসে বললে, এই সামান্য সিঁড়ি উঠতেই হাঁপাচ্ছেন বাবুজী, এখনও যে অনেক বাকী।

উদ্‌গত নিঃশ্বাসটা চেপে চাইল সে গাইডের দিকে।

জাহাঙ্গীর মহলে যাবেন? বললে গাইড।

চলো।

জাহাঙ্গীর মহল : বিরাট লাল পাথরে গড়া ভারতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। ললিত লক্ষ্য করলে মুসলমানী স্থাপত্যের সঙ্গে হিন্দু কারু-শিল্পের সার্থক শিল্পমিলন। পাথরের বুকে স্বর্ণাঙ্কিত চিত্রগুলির বেশির ভাগই আগুনে ঝলসানো। গাইড সেই দিকে চেয়ে বললে, জাঠরা ওগুলো নষ্ট করে দিয়েছে।

ইতিহাসের কতকগুলো পাতা উল্টে গেল ললিতের মনে, শুধু জাঠ নয় স্বয়ং ঔরঙ্গজেবও এই ধ্বংসযজ্ঞের পুরোহিত হয়েছিলেন

একদিন : দরিদ্র জাঠদের বাদ্‌শাহী বিলাসিতার ওপর স্বাভাবিক আক্রোশ বোধগম্য, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের তরফে কোন যুক্তি ললিতের মাথায় এলো না। হাতের স্কেচ্ খাতাটা খুলে ক্ষিপ্রগতিতে কতকগুলো পেনসিলের রেখা টানতে লেগে গেল সে। গাইড একটু অবাক হয়ে চাইল খাতার দিকে।

জাহাঙ্গীর মহল সেরে ললিত এসে দাঁড়ালো চারিপাশে লাল পাথরের প্রাসাদ ঘেরা একটা ময়দানে। একটা কাল পাথরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে গাইড বললে, ওইখানে ওই পাথরের ওপর হাতীর পায়ের তলায় মানুষকে পিষে মারা হতো।

চকিতে ললিত সেটা দেখে নিয়ে বললে, চলো অন্য দিকে।

দেওয়ান-ই-খাস, মতি-মস্‌জিদ, মীনা মস্‌জিদ, ইত্যাদি দেখতে ললিতের প্রায় আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল ; হাতের খাতাটা ভরে উঠেছে স্কেচে ; সে গিয়ে বসলো আঙুরীবাগের মাঝখানে ফোয়ারার শ্বেতপাথরের বাঁধানো পাড়ে।

বাদশাহী ব্যাপার বটে! মনে মনে বললে ললিত। শ্বেত পাথরের খাস-মহলের সাম্‌নে এই বাগ ; এর মাটি নাকি কাশ্মীর থেকে আনা হয়েছিল, অত্যন্ত উর্বরা। শ্বেত পাথরে বাঁধানো পায়ে চলা পথ দিয়ে আঙুরীবাগ চার ভাগে ভাগ করা, মাঝখানে পাঁচটি ফোয়ারাযুক্ত চৌবাচ্চা।

আপনার থেকে হাতের পেনসিলটা খাতার ওপর আঁচড় কাটতে শুরু করেছে ললিতের ; তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো আঙুরীবাগের লতান গাছের ফাঁকে ফাঁকে থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে ; কোথাও বা রাশি রাশি পাপড়ি মেলা বস্‌রা গোলাপ, পাঁচটা নহর থেকে ফিন্‌কি দেওয়া জলের ধারা চাঁদের আলোর ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ছে শ্বেত পাথরের পাড়ে।

খাস-মহলের বাঁধানো চত্তর, সবুজ জমির ওপর রূপোর কাজ করা

ফারসী কার্পেট দিয়ে মোড়া, মধ্যিখানে টকটকে লাল সোনার পাড় দেওয়া জাজিম্ পাতা তাকিয়ায় হেলে পড়া বাদ্‌শা ; ঝুলে পড়া ছোট্ট একটু চুকচুকে কাল দাড়ির ওপর গোলাপী মুখখানি, হাতে সোনার আলবোলার নল ; চারিপাশে রূপোর থালায় সাজানো গোলাপ গুচ্ছ, কস্তুরীভরা তাম্বুলদান, আতরদান ; একটু পেছন দিকে এক কোণে রূপোর থালার ওপর সোনার বকমুখো সুরাপাত্র আর এক জোড়া সাএগ্যর।

চারিপাশে নানা রঙের ওড়না-গায়ে বাঁদী, কনিজদের চলাফেরা ; স্বচ্ছ মশলিনের আড়ালে তাদের যৌবনস্ফীত দেহরেখা, আর তার অন্তরালে একটি ভীতত্রস্ত হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুকানি।

বাদশার সম্মুখে বসে মণিমানিক্যে মোড়া মদিরনয়না বেগম সাহেবা, চোখা নাকের ডগায় মুক্তোর মত ঘর্মবিন্দু ; তাম্বুলরঞ্জিত ক্ষীণ ওষ্ঠের একপ্রান্তে একটু হাসির বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে।

বাবুজি! গাইডের কণ্ঠস্বরে ললিতের হাতের পেনসিল থম্‌কে থামলো। সে তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে বললে, এই যে চলো।

সরু একটা স্যাঁৎসেঁতে সিঁড়ি দিয়ে ললিত নেমে চললো গাইডের পেছনে, মাটির নিচে ; এসে থামলো একটা অন্ধকার ঘরের সামনে। কতকগুলো বাদুড় চাম্‌চিকে সশব্দে বেরিয়ে গেল সেটার ভেতর থেকে ; মাটির অনেক নিচে এমন একটা ঘর খাসমহলের কাছে, মানে কি?

একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে গাইড বললে, ওই দেখুন বাবুজী কুয়া রয়েছে একটা, ওর তলা দিয়ে যমুনার স্রোত বইতো ; ওপরে দেখুন, একটা মোটা কড়িকাঠ রয়েছে ওটা ফাঁসিকাঠ, ওটাতে মানুষকে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো, তারপর ফাঁসির দড়ি কেটে দিলেই লাস যমুনার জলে ভেসে যেত।

ললিতের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল; খাসমহল শিসমহল কোথায় গুলিয়ে যাচ্ছে, মনে পড়লো একটা বিকৃত মুখ হাওয়া গিলতে চাইছে। সে তাড়াতাড়ি বললে, চলো ওপরে।

ওপরে গিয়ে গাইড গল্প শুরু করলে, ললিত শান্ত হয়ে এলো। জানেন বাবু অন্দর মহলের পাশে এ রকম জায়গা, শুধু গুপ্তহত্যার জন্যে; বোধ হয় দরবারে যাদের বিচার করা চলবে না তাদের ফাঁসি এখানে হতো, তা ছাড়া বাঁদীদের শাস্তি বেগমরা নিজেরাই দিতেন কিনা।

ললিতের মনে হলো শুধু বাঁদী কেন? বহু হতভাগ্য বান্দার বলিষ্ঠ অসাড় দেহ এই কুপের মধ্য দিয়ে যমুনার স্রোতে ভেসে গেছে; এই পাষাণের আড়ালে কত করুণ কাহিনী, কত বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাব মুখ দিয়ে, ভেসে উঠলো *দৃশ্যের* পর *দৃশ্য*,—প্রশস্ত বক্ষ উন্নত ললাট মুসলমান যুবক, কোমরে বাঁধা বাঁকা শমশের, মাথায় অভিজাত আনামা, এসে নামলো প্রাসাদ দ্বারে তাব চঞ্চল শ্বেত অশ্ব থেকে, বিজয়ীর হাসি নিয়ে প্রবেশ করলো ভেতরে, কিন্তু আর ফিরলো না। তার নিস্পন্দ দেহ ভেসে গেল যমুনার স্রোতে।

সুচতুর সরকারী আদেশে চারিদিকে লোক ছুটলো সন্ধানে, ফিরে এলো নত মস্তকে। প্রাসাদদ্বারে শ্বেত অশ্ব প্রভুর প্রতীক্ষায় মাটির বুকে খুরের আঘাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

পারস্য থেকে ধরে আনা তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণের যুবতী বাঁদী, চোখে বিদ্যুৎ, দেহে সংজ্ঞাহীন আকর্ষণী। বিজয়িনীর গর্বিত মরাল গ্রীবায় এসে পড়লো নিষ্ঠুর কঠিন রজ্জু, একটা নিরর্থক আর্তনাদ, তারপর যমুনার কোলে আশ্রয়। বাদ্‌শার ব্যাকুল প্রশ্ন, কোথায় সে গেল, নিয়ে এসো তাকে। সারা মহলে সন্ধান মিললো না; বেগম হেসে উত্তর দিলেন, সে বোধ হয় ওই কোনো বান্দার সঙ্গে

পাড়ি দিয়েছে রাত্রে ; জনাবের অভাব কি, আদেশ করুণ লক্ষ বাঁদী এনে দেবো।......

এত কি ভাবছেন বাবুজী ? গাইড বললে হেসে।

কিছু না, চলো। লজ্জিত হয়ে ললিত পা চালিয়ে দিলে দেওয়ান-ই-আমএর দিকে।

ওই কবরটি বাবুজী লাটবাহাদুর জে, আর, কোলভিন্ সাহেবের ! একটা কবরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে গাইড।

তা এখানে কেন ? জিজ্ঞেস করলে ললিত।

উনি এখানে লাট সাহেব ছিলেন, সিপাই বিদ্রোহের সময় ওকে তারা মেরে ফেলে এই দুর্গে।

ললিতের মনে পড়ে গেল, সিপাই-বিদ্রোহ, ভারতের প্রথম আত্মচেতনা যার ফলে বেচারা কোলভিন সাহেবকে এখানে মাটি নিতে হলো, কিন্তু এখানে মানায়নি বড় বেমানান। সে ক্লান্ত ভাবে বললে, চলো গাইড এবার ফিরতে হবে।

খুশি মনে গাইড বেরোবার রাস্তার দিকে এগিয়ে চললো।

॥ ৩ ॥

মেদিনীপুর জেলের সাত নম্বর ওয়ার্ড। এক মানুষ প্রাচীর ঘেরার মধ্যে একটা লম্বা ঘর, চিড়িয়াখানার বাঘের খাঁচার মত মোটা মোটা গরাদে দেওয়া বড় বড় দরজা জানালা। ঘরের সামনে বাঁধানো চত্বরে গোটা কতক জলের নালা। সেখানে স্নান সারতে হয় বন্দীদের। সূর্য ডুবে গেছে; সেই বাঁধানো চত্বরের ওপর বসে পঞ্চাশ ষাটজন নানা বয়সের বন্দী। ডোরাকাটা ফতুয়া আর ইজের পরা, দেখাচ্ছে প্রায় একই রকম সবাইকে।

তাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলে, বন্ধুগণ! আমরা পশু নই, মানুষ! আমরা চোর নই, সত্যাগ্রহী। আমরা ডাকাত নই, অহিংস সৈনিক। তবু আমাদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের এই সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে লক্‌আপ হবার আদেশ বর্বরোচিত। এখানের অন্য সহস্ররকম অবিচারের আমরা কোন প্রতিবাদ জানাইনি। কিন্তু এই একটা জিনিস নির্বিচারে মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে, গরমের দিনে ওই ঘরের মধ্যে পঞ্চাশ ষাট জন ছেলেকে পুরে রাখা হবে পুরো বারো ঘণ্টা, সে ঘরে স্বাভাবিক স্থান সঙ্কুলান হয় মাত্র তিরিশ জনের। আমরা সত্যাগ্রহী, পালাবার মতলব থাকলে মাত্র একজন লাঠিধারী পুলিশ আমাদের মত কুড়ি পঁচিশ জন সত্যাগ্রহীকে অনায়াসে গ্রেপ্তার করে আনতে পারতো না, কাজেই রাত্রি ন'টার পর লক্‌আপ হলে জেলের কোনই ক্ষতি হতে পারে না, সত্যাগ্রহী উপায়ে এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো, আমরা নটার আগে লক্‌আপ হবো না। বন্দেমাতরম্।

সাত নম্বর গেটের সামনে গুমটি ঘরের চারিদিকে এই

রকমের নানা ওয়ার্ড। সব ওয়ার্ডেই রাজনৈতিক বন্দীদের একই সভা বসেছে।

গুমটি ঘরে ঘণ্টা বাঁধা; তার তলায় জনকয়েক জেল-রক্ষী সভাগুলো লক্ষ্য করছে। সাত নম্বর ওয়ার্ডের সামনে একজন রক্ষী দেওয়ালে রাইফেল ঠেসিয়ে রেখে নিবিষ্ট মনে হাতের তালুতে খইনি মাড়ছে।

অনেকদিন পরে অমিতাভর মুখে প্রফুল্লতা ফুটে উঠলো।

জেলগেটের বিরাট গহ্বরের মধ্যে অফিস-কক্ষে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন জেল-কর্তারা। সুপার সাহেব টেবিলে একটা মুষ্টাঘাত করে বললেন, আউট ল বে-আইনি। এ হতেই পারে না সাতটার মধ্যে লক্‌আপ চাই।

কিন্তু স্যার, ওরা বাইরে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। ব্যস্তভাবে বললেন ডেপুটি-জেলারবাবু।

তা জানি না, আপনি যান দেখুন কি করতে পারেন।

আমি এই মাত্র ওখান থেকে আসছি স্যার, কোন কথাই শুনতে চাচ্ছে না।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী এতে যোগ দিয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আপনি একবার গেলে ভাল হয়।

আমি। তাই যাই, ওঃ বিরক্তিকর। ভুরু কুঁচকে দশাসই সুপার সাহেব উঠে গেলেন। অফিসে সবায়ের মধ্যে আঁখি বিনিময় হয়ে গেল, মানেটা—যত ঝক্কি আমাদের ওপর, নিজে একবার দেখে আসুন না।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে; বিরাট বিরাট দৈত্যের মত ওয়ার্ড-গুলো থেকে শত শত কণ্ঠে চিৎকার উঠছে, বন্দেমাতরম্, রাত্রি ন'টার পর লক্‌আপ চাই। ব্যতিব্যস্ত কর্মচারীর দল এদিক ওদিক ছোটা ছুটি করে বেড়াচ্ছে।

অফিস ঘরে থমথমে ভাব। ঘর্মাক্ত কলেবরে সুপার সাহেব অফিসে ঢুকে উত্তেজিত ভাবে বললেন, আউট ল। বেটারা বেহেড, কোন কথার জবাব দেয় না, এটা জেলের মধ্যে বিদ্রোহ। পাগলা ঘন্টি বাজাতে বলুন আর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে খবর দিন—জেলে আইন ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র চলছে।

ঢং ঢং ঢং ঢং পাগলের মত ঘণ্টা বেজে চললো। চারিদিকে সাজ সাজ রব ; রাইফেল বেয়নেট চাপিয়ে জেলরক্ষীদল এসে জড়ো হলো অফিসের সামনে। ঘণ্টাধ্বনি ছাপিয়ে সহস্র কণ্ঠের চিৎকার উঠলো, বন্দেমাতরম্।

সশস্ত্র পলটন নিয়ে হাজির হলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর, প্রশ্ন করলেন সুপার সাহেবকে ইংরাজিতে, ব্যাপার কি ?

সামরিক কায়দায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম ঠুকে উত্তর দিলেন সুপার সাহেব, রাজনৈতিক কয়েদীরা লক আপ হতে চাইছে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের লাল মুখ, ঘোর লাল হয়ে উঠলো, হাতের বেতটা নিজের পায়ে একবার ঠুকে বললেন ধমক দিয়ে, টেররিষ্ট। আউট ল। কনস্পিরেটর। রিবেল্‌স্। এক একটা শব্দের ঝোঁকে সুপার সাহেব চমকে চমকে উঠলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আদেশ দিলেন, ফলো মি।

কাঁধের ওপর রাইফেল তুলে নিয়ে সেপাই ও জেলরক্ষীদল মার্চ করে চললো তাঁর পেছনে। জমাট বাঁধা সহস্র কণ্ঠে রণোল্লাস ধ্বনিত হলো, বন্দেমাতরম্।

সাত নম্বর ওয়ার্ডের সামনে অমিতাভ সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললে, নিজেদের নিরেট করে সাজিয়ে নাও ভাই পরস্পরের হাত ধরে, বেত চললে শুয়ে পড়বে। ওরা আসছে।

ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল ; জেল প্রাঙ্গণ ভরে উঠলো চটাচট বেতের শব্দে। একটা করুণ চিৎকার উঠলো, উঃ বাবা গো।

দাঁতে দাঁত চিপে তিন নম্বর ওয়ার্ডের দিকে চেয়ে অমিতাভ বললে, ভীরু আর্তনাদ করছে। মুখের মধ্যে হাত পুরে বন্ধ করতে পারে না। নিজেদের দিকে লক্ষ্য করে বললে, সাবধান ভাই কোন আওয়াজ যেন মুখ থেকে না বেরোয়, যারা দুর্বল তারা ভেতরে যেতে পারো।

আশঙ্কায় শীর্ণ গোটা পাঁচেক মুখ অমিতাভর চোখে পড়ে গেল। তাদের দিকে চেয়ে বললে সে, তোমরা ভেতরে যাও ভাই, তোমরা পারবে না। তাদের মধ্যে একজনের চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো, সে নত মস্তকে উঠে চলে গেল ওয়ার্ডের দিকে, পেছনে আরো জন তিনেক উঠে গেল।

অমিতাভ নিঃশ্বাস নিয়ে বললে, এ ভাল। কিন্তু আর্তনাদ অসহ্য।

ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে এলো সাত নম্বর ওয়ার্ডের দিকে। সেপাই সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে ঢুকলেন। তাকে দেখে সত্যাগ্রহীরা সম্বর্ধনা জানালো, বন্দেমাতরম্।

ক্রুদ্ধস্বরে তিনি হাঁকলেন, শালালোক শুয়ারকা বাচ্ছা।

অমিতাভ চিনতে পারলো এই তো খান সাহেব, মেদিনীপুর জেলার হর্তাকর্তা। কাঁথির শেষপ্রান্ত থেকে চন্দ্রকোণা পর্যন্ত যার শাসন সুপরিচিত। সে দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করলো—বন্দেমাতরম্।

হিংস্র গরিলার মত সাহেবের লাল চোখ দুটো গোল হয়ে বেরিয়ে এলো; কপাল থেকে ঘাম ঝেড়ে নিয়ে সজোরে চালালেন চাবুকের বাড়ি অমিতাভর ওপর। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, বল বেটা বন্দেমাতরম্।

শত শত কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো, বন্দেমাতরম্।

ক্রোধে উন্মত্ত সাহেব তাঁর সবুট লাথি চালালেন ছেলেদের মধ্যে। গোটা দুই ছেলে শ্বাসরুদ্ধ আওয়াজ করে গড়িয়ে পড়লো।

শালালোক পাক্কা টেররিষ্ট। চালাও বেত। বেত হাতে জন আষ্টেক সেপাই ছেলেদের গাদার মধ্যে বেত চালাতে শুরু করলো। সত্যাগ্রহীরা মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল, একবার ফিরে চাইল না কেউ, যদি সে চাহনিতে প্রতিবাদের ভাষা ফুটে ওঠে এই ভয়ে।

খান সাহেবের হাতের বেত শিস্ দিতে শুরু করেছে; লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি তা চালিয়ে যাচ্ছেন নিঃসাড়ে পড়ে থাকা দেহগুলোর ওপর, ঠিক যেন মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে গরিলার বিস্ময়-নৃত্য।

সেপাইদের হাত ধরে এলো, বেত ঝুলে পড়লো ক্লান্তিতে, তারা আদেশের আশায় সাহেবের মুখের দিকে চাইলে।

অসহায়ভাবে, ভাঙ্গাগলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন সাহেব, সবকো উঠাকে লে যাও অন্দর। দুজন করে সেপাই এক একজন সত্যাগ্রহীকে হাতে পায়ে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো সাত নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে। সবাইকে কক্ষটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার পর একজন লোহার বড় দরজাটায় তালা লাগিয়ে দিলে।

খান সাহেব গরাদের ফাঁকে অগ্নিদৃষ্টিতে সত্যাগ্রহীদের দিকে চেয়ে ফিরলেন রুমালে মুখ মুছতে মুছতে। পেছনে চললো ক্লান্ত শিকারী কুকুরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে সেপাইদল।

ওয়ার্ড কক্ষের মধ্যে একজন ক্ষতবিক্ষত তরুণ বহু কষ্টে তার মাথাটা একটু তুলে চেঁচিয়ে উঠলো, দেখে নেবো শয়তানকে। মেদিনীপুরে আমার জন্ম।

॥ ৪ ॥

মিত্তির বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে নানা ছন্দে।

হারাধনবাবু নিয়মিত আফিস যাতায়াত করেন আর সকালে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে মিটমাটের সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন। গোলমাল চুকে গেছে। অমিতাভ ফিরে আসবে এই কথার প্রত্যাশায় মৃণ্ময়ী দেবী রোজই স্বামীর মুখ চেয়ে থাকেন।

ব্রজবিহারীবাবুর লিভারের ব্যথাটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আরো উপসর্গ এসে জুটেছে ; ব্রজেন্দ্রনাথের কিছু কিছু সাহায্যে আর মালতীর অক্লান্ত সেবায় কোনমতে তার অনিবার্য মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।

মালতী দিনে দিনে নিজেকে তৈরী করে নিচ্ছে ; জীবনের স্বপ্নালু মুহূর্তগুলোর ওপর থাকে থাকে বিদ্বেষ জমা হয়ে উঠছে, এখন প্রিয়-বচনও তার কাছে অসহ্য ! ব্রজেন্দ্রনাথের সাহায্য তাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে শুধু বাবার অসহায় অবস্থা দেখে, যদিও এই অতি কৃপণ স্বার্থপর লোকটির মিষ্টি কথাগুলো তার নির্লজ্জ ন্যাকামীর মত লাগে।

কলতলার পাশের ভাড়াটেরা উঠে গেছে আরো কম ভাড়ার বাড়িতে। মনোহরের সামান্য রোজগারই এখন তাদের সম্বল। ঘর দুটো খালি পড়ে আছে।

সামনের দিকে নিতাই ঘড়িওয়ালা চালিয়ে যাচ্ছে ভালই। সুরেন সিংহ আছে, তবে তার ভালমন্দ বোঝা শক্ত। দিনে রাতে খুব কম সময়ের জন্যে তাকে ঘরে থাকতে দেখা যায়।

নিবারণ জানার দাম্পত্য কলহ আজকাল কদাচিৎ শোনা যায় ; তাঁর স্ত্রী নাকি আসন্নপ্রসবা। এ সম্বন্ধে মিত্তিরবাড়ির বাসিন্দাগোষ্ঠী বেশ কৌতূহলী ; এত বয়সে বন্ধ্যা নারীর সন্তানসম্ভাবনা দেখে

অনেকে অনেককিছু কল্পনার খোরাক যোগাচ্ছেন ; তবে নিবারণ জানা জোর গলায় প্রচার করেন, এটা নাকি একজন সিদ্ধ-পুরুষের মাদুলি ধারণে সম্ভব হয়েছে, মোটের ওপর তাঁদের দাম্পত্য জীবনে শান্তি এনে দিয়েছে এই সম্ভাবনা।

বাড়ির পেছন দিকের গাড়োয়ানদের খবর এবাড়ির বাসিন্দাদের কাছে অপ্রায়োজনীয় হলেও মাঝে মাঝে একটি রমণীর আর্ত ক্রন্দনে বাসিন্দাদের অনেকেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন। এই গাড়োয়ান-রমণীর একমাত্র সন্তান নাকি হাওড়ায় গাড়োয়ানদের হাঙ্গামায় পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে।

রামকালীবাবুর চেহারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এসেছে, গড়গড়ার নল হাতে বৈঠকখানায় বসে থাকার সময়ও আজকাল বেড়ে গেছে। অমিয়কান্তি কিছুদিন হলো জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, আজ তাকে পাঠিয়েছেন পুনরায় কলেজে ভর্তি হবার জন্যে। অমিয় আবার কলেজে ভর্তি হলে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হন।

মাথা নিচু করে বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুকলো অমিয়কান্তি, তাকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন রামকালীবাবু।

কলেজে ভর্তি হওয়া গেল না বাবা !—বললে অমিয়কান্তি।

কেন ?—গম্ভীরভাবে বললেন রামকালীবাবু।

কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজী নয় জেল ফেরৎ ছেলেদের ভর্তি করতে !

অন্য কলেজে চেষ্টা করো !

এরা আবার কিরকম সার্টিফিকেট দেন !—অমিয়কান্তি চিন্তিতভাবে বললে।

রামকালীবাবু স্বভাবসুলভ জলদগম্ভীর গলায় শুরু করলেন, হু ! কি লাভ হলো তোমার ? নিজের ভবিষ্যৎ খুইয়ে কি বা করতে পারলে ? সেইতো আবার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিটমাট করতে হবে, তারপর যে যার বাগিয়ে নেবে, আর তোমরা মূর্খ ছেলের দল লেখাপড়া,

ভবিষ্যৎ খুইয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে, কেউ একবার মুখ তুলে চাইবেও না তোমাদের দিকে!

উত্তর দেবার ইচ্ছা হলো না অমিয়কান্তির, চুপ করে বসে রইল মাটির দিকে চেয়ে। কলেজ কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে নিজেকে আজ সত্যি অপমানিত মনে হচ্ছে।

এখন যা ভাল বোঝ করো, আমি আর কি বলবো। নিজের মূর্খামির শাস্তি পাওয়া চাই।—ক্ষোভের সঙ্গে বললেন রামকালীবাবু।

অমিয়কান্তি অপরাধীর মত নিঃশব্দে উঠে চলে গেল।

বাড়ির সবাইকে এড়িয়ে অমিয়কান্তি গিয়ে দাঁড়ালো দোতলার বারান্দায়। তার মাথার মধ্যে নানা কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে, গান্ধীজি মিটমাটের শর্ত দিয়েছেন বড়লাটকে, সংগ্রাম কি সত্যই শেষ হতে চললো? কলেজের ছেলেদের মধ্যে উৎসাহহীন ঢিলেমি। একটা অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততা! সন্ধি যে সাময়িক এ কথা তো কারুই মনের মধ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

বাবা অমিয়! অমিতাভর কোন খবর জানো?—পাশের বারান্দা থেকে জিজ্ঞেস করলেন মৃন্ময়ী দেবী।

আর কি মাসিমা, এবারে অমিতাভ ছাড়া পেয়ে যাবে, আপনার শরীর অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে?

আমার আবার শরীর, ও কিছু নয় বাবা। মিটমাট কি সত্যি হবে?

সেইরকমই মনে হচ্ছে। চিন্তিতভাবে বললে অমিয়কান্তি।

হলেই ভাল, তবে উনি বলছিলেন কংগ্রেসের সবাই নাকি রাজি নন মিটমাটে। আমি আসছি বাবা, খুকীটা আবার কাঁদছে, দেখি কি হলো।

মৃন্ময়ী দেবী চলে গেলেন ভেতরদিকে। অমিয়কান্তি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ভবিষ্যৎ যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। সে আর কত হাতড়াবে!

॥ ৫ ॥

তাজমহলের মার্বেল ট্যাঙ্কের পাড়ে উঠে পা আটকে গেল ললিতের। তার মনে হলো, আর না আর কাছে যাবো না, ওই তো মর্মরস্বপ্ন! সে বসে পড়লো জলাশয়ের পাড়ে; খাতার পাতায় পেনসিলের রেখা টেনেই আপন মনে বলে উঠলো, পেনসিলের কাজ নয়। শুভ্র অঙ্গে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন রয়ে যাবে। পেনসিলেব স্নেহস্পর্শ দিতে লাগলো অতি সাবধানে ধীরে ধীরে।

নারী কণ্ঠের প্রশংসা তার কানে এলো, বাঃ চমৎকার।

ঘাড না-তুলে ললিতও বলে ফেললে, সত্যি চমৎকার, অপূর্ব অতুলনীয়।

আমরা কিন্তু আপনার ছবিটার কথাই বলছিলাম।

ললিত লজ্জিতভাবে ঘাড় তুলে চাইলো। একটি ভদ্রলোকের ওপর চোখ পড়তেই সে তাড়াতাড়ি বললে, ছি ছি, আমি ভাবছিলাম আপনারা তাজের প্রশংসা করছেন।

আপনার খাতাটা দয়া করে দেখাবেন, মহিলাটি হাত বাড়িয়ে দিলেন ললিতের দিকে। তাঁর হাতে খাতাটা তুলে দিয়ে নীরবে চাইল ললিত আগন্তুকদের দিকে। ভদ্রলোকটি দামী স্যুটপরা, সুদর্শন, সম্ভবত বেড়াতে এসেছেন বাংলা দেশ থেকে; ভদ্রমহিলাটি গাঢ় সবুজ রঙের শাড়ী জড়িয়ে পরেছেন, ঈষৎ স্থূল দেহ; মুখের সৌন্দর্য দৈহিক সৌন্দর্যের তুলনায় কম।

আপনি তো সুন্দর ছবি আঁকেন। বললেন তিনি মৃদু হেসে।

আপনার কি দেখা হয়ে গেছে? চলুন না আমাদের সঙ্গে, তবু একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে কথা বলতে পারা যাবে।

আপনার মত শিল্পীর সঙ্গে দেখলে হয়তো কিছু বেশি দেখতে পাবো, চলুন না আমাদের সঙ্গে। মহিলাটি বললেন মিষ্টিভাবে।

বহুদিন পরে এই আত্মীয়তার আহ্বানে ললিত রাজী হয়ে গেল। সে খুশি মনে বললে, চলুন আমার আপত্তি নেই।

তিনজনে এগিয়ে চললো তাজের দিকে ঝাউ গাছের তলা দিয়ে।

তাজের শ্বেত চত্বরে উঠে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সবাই দেখতে দেখতে ঘুরে চললো চারিপাশ। যেন ভাষাহীন হয়ে পড়েছে তিনজনেই।

তাজের পশ্চাৎ দিকে এসে ভদ্রলোকটি বললেন, আসুন এইখানে একটু বসা যাক। তারা বসে পড়লো বাঁধানো চত্বরের ধারে; যমুনার ক্ষীণ জলরেখা দুরে বয়ে চলেছে, ললিতের মনে হলো তুষার-শুভ্র-স্মৃতির পাদদেশ স্পর্শ করে বয়ে চলেছে হতগর্ব কালস্রোত, পাষাণের প্রতি স্তরে যেন যুগ যুগ ধরে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে কবির সেই কথা—ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।

দেখো পরের কথা ধার করে আমি বলছি, আমি এখুনি মরতে প্রস্তুত যদি তুমি এমনি একটা স্মৃতিমন্দির তৈরি করো, উঁচু সুরেলা গলায় মহিলাটি বললেন স্বামীর দিকে চেয়ে।

তৈরি করতে পারতুম যদি আমার অধীনে বিশ সহস্র দাস থাকতো, আর রাজকোষ থাকতো।

কেন তোমার কারখানা কি কম?

কারখানার টাকায় এ সব করা চলে না, সে টাকা কারখানারই প্রাপ্য, তার তাগিদ অনেক বেশি।

তা হলে আর কি হবে। আমার মরা হলো না। ছদ্ম নিরাশায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মহিলাটি।

ললিত চাইল তাঁর মুখের দিকে। একটু কটাক্ষ করে তিনি আবার শুরু করলেন, দেখছো তখন নারীর মূল্য কি ছিলো?

তা দেখছি, কিন্তু ফতেপুর সিকরীতে দেখা সেই পাশা খেলার ছক সেই রঙ-বেরঙের কাপড় পরা জীবন্ত নারী ঘুঁটিগুলোর কথা তুমি

যে এত শিগ্রি ভুলে যাবে তা তো জানা ছিল না। হাসতে হাসতে বললেন ভদ্রলোকটি।

সে তো দাসীদের নিয়ে খেলা।

এটা রাণীদের নিয়ে এই না?

যাও তুমি ভারি নিন্দুক। রাগের ভান করে ফিরে তাকালেন মহিলাটি ললিতের দিকে, আচ্ছা আপনি বলুন তো তাজ দেখে আপনার কি মনে হয়?

এই সব আলোচনা ললিতের মোটেই ভাল লাগছিল না তবু ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দিতে হলো, ইতিহাসের এখানে নীরব থাকাই ভাল, আর যদি তার আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়ে তা হলে এই কথাই বলবো, সমাজের যে সৃষ্টিশক্তির অপব্যয় হতো অন্য তুচ্ছ কারণে, সেই শক্তি সার্থক হয়েছে এখানে, এইটেই শুধু বারে বারে মনে হচ্ছে। সাজাহান-মমতাজ উপলক্ষ্য মাত্র, সে যুগের এটা সার্থক শিল্পসৃষ্টি, এই সৃষ্টির গৌরবে সাজাহানের প্রেম অমর হলো।

ঠিক ঠিক, শিল্পীর মত কথা বটে, ভদ্রলোকটি বললেন হেসে।

মহিলাটি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন শুনে যে মমতাজ উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি থেমে বললেন, আমার কিন্তু মনে হয় মমতাজই এর প্রাণবন্ত প্রেরণা। যেমন কবিতার ভাব আর প্রকাশভঙ্গী তেমনি মমতাজ আর তাঁর স্মৃতি সৌধ একই সূত্রে গাঁথা।

ললিত এর উত্তর চেপে গেল। ভদ্রলোকটি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন, বাঃ বাঃ তুমি তো বেশ কথা বলেছ। আমার একটা ইংরেজি কবিতা মনে পড়ছে।

কবিতা, থাক চলো এইবার ভেতরটা দেখে আসি—বললেন মহিলাটি। তিন জনেই উঠে দাঁড়িয়ে এগোলো সামনের দিকে।

তাজের অন্দরে প্রবেশ করতেই, ধুপ গুগ্‌গুলের গন্ধে আনমনা হয়ে গেল ললিত, একজন ফকির সমাধির পাশে বসে কোরাণ থেকে

পাঠ করে চলেছেন, আলোছায়ার মধ্যে রহস্যময় সমাধি-কক্ষ, অনির্বচনীয় মধুর বিষাদে ভরা। নিজের অজ্ঞাতে ললিতের চোখের পাতা সরস হয়ে এলো ; তিনজনেই বাক্যহীন, কারণ, সমালোচনা এখানে অসহ্য, কথা এখানে দেউলিয়া, হৃদয়ের মূকভাষা এখানে সম্রাট। শ্বেত-পাথরের জাফরি দিয়ে ক্ষীণ আলোর রশ্মি এসে পড়েছে কারুকার্য খচিত সমাধিগাত্রে ; মমতাজের হাসি যেন ছড়িয়ে আছে চারিদিকে পাষাণ গাত্রে রঙ বেরঙের গোলাপে অমরত্বের দাবী নিয়ে।

দেখা শেষ করে ভারী মন নিয়ে ফিরলো তারা জলাশয়ের দিকে। সেখানে পেঁাছে ললিত বললে, এবারে আমি বিদায় নেব, নমস্কার।

ওঃ আপনার ছবিটা শেষ হয়নি বুঝি ? বললেন মহিলাটি।

আপনার নামটা তো জানা হলো না, বললেন ভদ্রলোকটি।

একটু ইতস্তত করে ললিত উত্তর দিলে, অনিল গুপ্ত।

ওঃ ! যাবেন আমাদের বাড়িতে, আমরা আগ্রায় মাসখানেক থাকবো !

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে ঠিকানা লিখে দিলেন মহিলাটি। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও বোধ হয় বেড়াতে এসেছেন ? কি করেন ?

আমি এখানেই থাকি, আর ছবি আঁকাই পেশা। একটা দোকানের অর্ডারি কাজ করি।

মুহূর্তে ভদ্রলোকের মুখের ভাব পরিবর্তিত হলো। তিনি ললিতের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে বললেন, তাড়াতাড়ি চলো দেরী হয়ে গেছে। তা হলে আসি অনিলবাবু! একটা নমস্কার সেরে মহিলাটি এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে।

ললিতের মনে হলো অজ্ঞাতে সে কোন অপরাধ করে ফেলেছে ; ওদের কণ্ঠস্বর কেমন যেন বেসুরো বললো শেষের দিকে। সে বসে পড়ে খাতায় চলন্ত নারীদেহের রেখাগুলোকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করলে।

॥ ৬ ॥

মেদিনীপুর জেল হাসপাতাল। খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে একজন কয়েদী তদবিরকার ডাকলে, উঠুন বাবু অনেক বেলা হয়ে গেছে।

চোখ মুছে আড় ভেঙ্গে উঠে বসলো অমিতাভ। আজ তার শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে আজ ফিরতে পারবে ওয়ার্ডে। সঙ্গীদের ছেড়ে এই সাত আট দিন হাসপাতালে থাকা তার বিরক্তিকর লাগছে। হাই তুলে খাটিয়া থেকে নামতে নামতে বললে সে, রতন আমি তো আজ যাচ্ছি সাত নম্বরে।

ভালই তো বাবু হাসপাতাল কি থাকার জায়গা?

আচ্ছা রতন আর কতদিন পরে তুমি বাড়ি যাবে?

কথাটায় রতন যেন একটু খুশি হয়ে উঠলো সে বললে হিসাব করে, তা প্রায় শেষ করে এনেছি আর বছর সাত পরেই ছুটি পাবো।

অবাক হয়ে চাইল অমিতাভ তার দিকে। সে আবার বললে, মোটামুটি আঠারো বছরের মধ্যে বছর তিনেক রেমিশন পাবো বাবু।

কি করেছিলে?

ডাকাতি করেছিলুম বাবু খুন করার ইচ্ছে ছিল না হয়ে পড়লো।

তোমাদের কষ্ট হয় না এখানে এতদিন থাকতে?

হয় বইকি বাবু কিন্তু উপায় কি, তবে চোরেদের কষ্ট আমাদের চেয়ে বেশি হয়। টাকার জোরে আমরা কিছুটা সুবিধা করে নি।

তাই নাকি এখানেও টাকা?

তা ছাড়া কি। থাক বাবু সে সব কথা, মুখটা ধুয়ে নেবেন চলুন।

বারান্দায় বেরিয়ে অমিতাভ দাঁতন করতে শুরু করলে। রতন তাকে রোজ একটা টাটকা নিমের দাঁতন জোগাড় করে এনে দেয়। সে বললে, যেন শুনছিলাম বাবু আপনারা আজ ছাড়া পাবেন।

তাই নাকি জানি না তো—নির্লিপ্ত স্বরে বললে অমিতাভ, তারপর অন্যমনস্ক ভাবে মুখ ধুতে লাগলো।

দূরে একজন রাজবন্দী যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন অমিতাভকে, এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সামনে ; অমিতাভ তাঁর মুখের দিকে চাইতেই কেমন যেন চেনা চেনা লাগলো। তিনি দ্বিধাজড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

তোমার নাম কি ভাই ?

অমিতাভ রায়।

কোথায় গ্রেপ্তার করেছে ?

মেদনীপুরে।

ওঃ ! একটু হতাশ ভাবে তিনি যেন ফিরতে যাচ্ছিলেন খানিকক্ষণ থেমে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বাগবাজারে তোমরা কখনও ছিলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?

মিত্তির বাড়িতে ?

হ্যাঁ—অমিতাভর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো।

আমায় চিনতে পাচ্ছ না মিনটু ?

বহুদিনের বিস্মৃত একটা *দৃশ্য* অমিতাভর চোখে ফুটে উঠলো, সুজিৎদা আপনি।

হ্যাঁ আমি, অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হলো।

সুজাতাদি কোথায় ?

জানি না ভাই, পাঁচ বছর আগে শেষ চিঠি পেয়েছি।

আপনি সেই থেকেই জেলে আছেন ?

হ্যাঁ।

কষ্ট হয় না ?

তাঁর মুখে একটুকরো হাসি এসে মিলিয়ে গেল বললেন, অভ্যাস হয়ে গেছে।

আমার এই কমাসেই কষ্টকর লাগছে।

আজই তোমরা ছাড়া পাবে। গান্ধীজির দিল্লী চুক্তি অনুযায়ী।

সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে?

তা জানি না, তবে তোমরা ছাড়া পাবে।

আর আপনারা?

বোধ হয় নয়—তাঁর মুখখানা ভারী হয়ে উঠলো।

এ অন্যায়। এ অন্যায়। উত্তেজিত ভাবে বললে অমিতাভ।

সুজিৎবাবু তাঁর কাঁধে হাত রেখে মৃদু স্বরে বললেন, লোকচক্ষুর আড়ালে আমাদের রাজনৈতিক মর্যাদাও যে ঢাকা পড়ে গেছে মিনটু। খানিকক্ষণ থেমে তিনি আবার বললেন—আমি এখন আসি ভাই, যাবার সময় গেটে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

জেলরক্ষীর আদেশে সাতনম্বর ওয়াড থেকে কম্বল থালা-বাটী গুছিয়ে নিয়ে বন্দীর দল গেটের দিকে চললো। তাদের মুখে আসন্ন মুক্তির আনন্দ ফুটে উঠেছে। অমিতাভ মনটাকে হালকা করার অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না, বারে বারে দীর্ঘদিনের কারাবাসে রেখাঙ্কিত একটা মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে; আজও রাজনৈতিক মর্যাদা না পেয়ে অভিমানে যাঁর চোখ জলে ভরে এসেছিল। মুক্তির আনন্দ যেন বিষিয়ে উঠেছে সে কথা ভেবে।

অফিস ঘরে যন্ত্রচালিতের মত করণীয় যা কিছু শেষ করে অমিতাভ চাইল চারিদিকে পরিচিত মুখের আশায়।

সুজিৎবাবু অপরিচিতের নিখুঁৎ অভিনয়ে তার চার পাশে ঘুরতে ঘুরতে হাতে গুঁজে দিলেন একটা কাগজের মোড়ক।

ডেপুটি জেলার বললেন অমিতাভকে, আপনি যেতে পারেন।

সে শেষবারের মত চাইল সুজিৎবাবুর দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

জেল গেটের বাইরে বহুলোক তাদের প্রিয়জনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে; অমিতাভ একটা পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেলে।

দাদা দাদা ওই যে। শিবকালীবাবুর বড় ছেলে আর রুনু এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

আদিগন্ত নীল আকাশের নিচে বিসর্পিত সবুজ মাঠের দিকে চেয়ে খুশিতে ভরে উঠলো অমিতাভর মন।

উচ্ছলকণ্ঠে রুনু বললে, চলো। সামনে গাড়ী দাঁড়িয়ে।

॥ ৭ ॥
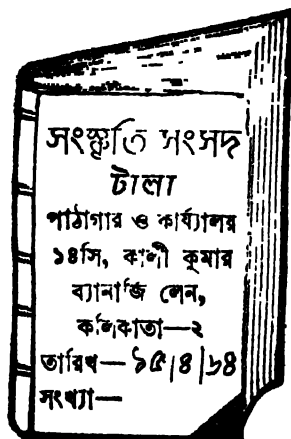
শিবকালীবাবুর বাড়িতে ধুমধাম পড়ে গেছে। অমিতাভ একটা ঘরে ইজিচেয়ারে বসে লক্ষ্য করছে বারান্দায় কর্মব্যস্ততা। পাশের কেদারায় রুনু বসে; তার চোখের দৃষ্টি ফিরে ফিরে পড়ছে অমিতাভর মুখে।

আজ তোমার না গেলেই নয় অমিতাভ?

আজই যেতে হবে, মা বড় ভাবছেন।

জ্যাঠামশায় শহরের সমস্ত কংগ্রেসকর্মীদের আজ খাওয়াবেন।

হঠাৎ এত খাওয়াবার ধুমধাম? হেসে বললে অমিতাভ।

অনেকদিন পরে একটু মিলেমিশে আনন্দ করা।

আমি কিন্তু আনন্দের নাগাল পাচ্ছি না রুনু।

তা জানি গো জানি, মায়ের আদরের ছেলে মায়ের জন্যে মন কেমন করছে।

না না ঠিক তা নয়।

তুমি একটা পেশাদার সৈনিক, কেবল লড়াই ভালবাস। কটাক্ষ্য করে বললে রুনু। অমিতাভ চঞ্চল হয়ে একটা নিঃশ্বাস নিলে।

শিবকালীবাবুর আওয়াজ পেয়ে সোজা হয়ে বসলো দুজনে। শিবকালীবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, তুমি এই রাত্রের ট্রেনেই তাহলে যাবে অমিতাভ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনেকদিন বাড়ি ছাড়া, তোমাকে আর আটকাবো না। তাই যাও, আমি তোমার জন্যে ড্রাইভারকে বলে রেখেছি, ঘণ্টাখানেক পরেই গাড়ী নিয়ে আসবে। কথা শেষ করে তিনি চলে গেলেন। অমিতাভ রুনুর দিকে চেয়ে বললে, তোমার আমাব এই ঘনিষ্ঠ মেলামেশা জ্যাঠামশায় কি চোখে দেখেন সুচিত্রা?

আমি ঠিক কিছু বলতে পারবো না।

আমার কিন্তু মনে হয় উনি তোমার মুখ চেয়েই—

হবে! জানো অমিতাভ উনি একদিন আমাকে বিধবা-বিবাহ নিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি এড়িয়ে যাচ্ছি দেখে আর সে সম্বন্ধে কথা পাড়েননি।

ক্ষণিকের জন্যে অমিতাভর মন আনন্দে ভরে উঠলো; সে সঙ্কোচের সুরে বললে, কেন তুমি আবার বিয়ে করবে না রুনু? বাল্যকালের একটা ঘটনাকে এ ভাবে মর্যদা দেবার কোন যুক্তি নেই।

তুমি ভুল বুঝছো। প্রায় মনে মনে বললে রুনু।

মোটেই না, তুমি যদি বলো আমি নিজে গিয়ে কথা পাড়বো জ্যাঠামশায়ের কাছে।

না না তুমি ঠিক বোঝনি, ও কথা থাক।

রুদ্ধকণ্ঠে অমিতাভ বললে, বোঝাটা যেন তোমারই একচেটিয়া?

জ্যাঠামশায় ছাড়া, বাবার কথাটা ভেবে দেখ দয়া করে।

চোখের সামনে পর্দাটা সরে গেল অমিতাভর; একটা মুখ, কোথায় শিবকালীবাবু কোথায় ব্রজেন্দ্রনাথ। একই মাতৃগর্ভে জন্ম-গ্রহণ করে ও দুজনের মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান। সে ফিরে চাইল; রুনুর ফ্যাকাশে গাল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো অমিতাভর হাতে। ক্রন্দনবেগে ঘোলাটে মুখখানা তুলে ধরলো অমিতাভ দুহাত দিয়ে; চোখ বন্ধ করে রুনু তার হাতদুটো চেপে ধরে ফুলে ফুলে উঠলো।

নিরেট নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলোর মধ্যে শিবকালীবাবুর কণ্ঠস্বর চেতনা এনে দিলে; তারা দুজনেই নিজেদের সামলে নিলে।

তিনি এসে বললেন, তোমার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে অমিতাভ। রণজিৎ আর রুনু, তোমরা গিয়ে ট্রেণে তুলে দিয়ে এসো।

তাঁকে নমস্কার করে অমিতাভ মোটরে গিয়ে বসলো, তারপর রুনু; গাড়ী চালাবার জন্যে রণজিৎ গিয়ে বসলো সামনে।

জনহীন লাল রাস্তার ওপর দিয়ে মোটর ছুটে চললো, পেছনের পথটা ধুলোর পর্দায় ঢেকে। গাড়ীর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ায় রুনুর চুলগুলো মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছে অমিতাভর গাল। তারা পাশাপাশি চেপে বসেছে; পরস্পরের দেহের উত্তাপ অনুভব করলেও পরস্পরের মনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না।

স্টেশনের কাছে এসে রুনু বললে নিম্নস্বরে, তোমাকে ওই গাছতলা থেকে তুলে নিয়ে গেছলাম। অমিতাভ ভাল করে চাইল সেইদিকে। স্মৃতির তুফানে দোল খেয়ে উঠলো রুনুর মন; তার মনে হলো আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় ভরা সেই রহস্যময়ী রাত্রি আজকের চেয়ে যেন অনেকগুণে ভাল। গাড়ী এসে থামলো স্টেশনের ধারে।

রণজিৎ গাড়ী থেকে নেমে ডাকলো, নেবে পড়ো তাড়াতাড়ি গাড়ীর আর দেরী নেই। আস্তে আস্তে অমিতাভ নেমে পড়লো, তারপর রুনু।

স্টেশনের ভেতর দিকে এগিয়ে চললো তিনজনে নীরবে; সপ্তমীর চাঁদ তখন ম্লান হয়ে এসেছে; বিদায়ী চাঁদের আলো এসে পড়েছে বড় বড় গাছগুলোর ওপর দিকে, নিচের দিকটা অন্ধকার। সেই আলোছায়ার দিকে চেয়ে অমিতাভর মনটা কেমন যেন মধুর বিষাদে ভরে উঠলো।

ঘণ্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণখানা দৈত্যের মত চারিদিক কাঁপিয়ে এসে থামলো।

ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগেই অমিতাভ গিয়ে উঠে বসলো কামরায় জানলার ধারে। রুনু প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে চাইল তার দিকে; অমিতাভ দেখলে তার চোখের কোণ চক্‌চক্ করছে চাঁদের আলোয়। রণজিৎ চেঁচিয়ে বললে দূর থেকে, পেঁ ৗছে একটা চিঠি দিও অমিতাভ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ট্রেনটা চলা শুরু করলো; জানালার ওপর দুটো হাতের মধ্যে মাথাটা গুঁজে বসলো অমিতাভ।

॥ ৮ ॥

মিত্তির বাড়ির ভেতরের দিকে তখনও রোদ আসেনি ; রামকালীবাবু সবেমাত্র প্রাতঃভ্রমণ সেরে বৈঠকখানার দরজায় পা বাড়িয়েছেন ; দোতলার বারান্দা থেকে ব্রজেন্দ্রনাথের স্বর শোনা গেল, অমিয় দেখতো কে একটা ছোকরা সরাসরি ভেতরে ঢুকে এসেছে।

তার কথায় ফিরে দাঁড়িয়ে বললে অমিতাভ, ছোকরা নয়, আমি কাকাবাবু।

পরিচিত স্বরে রামকালীবাবু বেরিয়ে এলেন উঠোনে ; তাঁকে দেখে প্রণাম করবার জন্যে এগিয়ে গেল অমিতাভ। অমিয়, ব্রজেন্দ্রনাথ, নিবারণ জানা, আরো দু একজন অপরিচিত লোক এসে জড়ো হলো তার চারিপাশে। বিচলিত কণ্ঠে রামকালীবাবু বললেন, এ তোর কি চেহারা হয়েছে মিনটু দেখে যে চেনাই যায় না।

দোতলার এককোণ থেকে একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এলো, 'ওগো শুনছো, উঠে দেখ' বোধ হয় মিনটু এসেছে !

অমিতাভর মুখের ওপর যে দুটো বেতের দাগ তখনও মিলিয়ে যায়নি সেই দিকে চাইতেই অমিয়কান্তির হাসিভরা মুখখানার কে যেন একপোঁচ কালি লেপে দিলে।

রামকালীবাবু বললেন, যাও বাবা আগে বাড়িতে দেখা করোগে।

সে এগিয়ে চললো নিজেদের অংশের দিকে, পেছনে পেছনে চললো অমিয়কান্তি।

দরজার গোড়ায় যেতেই হারাধনবাবু বেরিয়ে এলেন ; তাঁকে প্রণাম করতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কবে ছাড়া পেয়েছ ?

কাল।

অসুখ করেছিল নাকি, শরীর খুব খারাপ দেখছি ?

না তেমন কিছু না।

ভেতরে চলো তোমার মা দাঁড়িয়ে আছেন।

রান্নাঘরের সামনে মাকে প্রণাম করে দাঁড়ালো অমিতাভ, তাঁর মুখের দিকে না চেয়েই। তিনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। নিজের অজ্ঞাতে অমিতাভর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো, হারাধনবাবু চলে গেলেন সেখান থেকে।

মৃন্ময়ী দেবীর এতদিনের জমাট কান্না যেন তুষারের মত গলতে শুরু করেছে; অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, তোরা ঘরে বসগে আমি চা আনছি।

তিনি তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন রান্নাঘরে; অমিতাভ এগিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে।

দেড় বছরের মধ্যে তার নিজের ঘরের কোন পরিবর্তন চোখে পড়লো না। যেমন অবস্থায় রেখে সে চলে গিয়েছিলো সেই অবস্থাতেই আছে। এমনকি বইগুলো যেমনভাবে ছড়ানো ছিলো টেবিলে, সেগুলো সেইভাবেই রয়েছে। তার অতি প্রিয় পুরানো চটিটা একই জায়গায় মেজেতে পড়ে আছে। কিন্তু কোথাও ধুলোর চিহ্ন নেই। কে যেন নিপুণ হাতে সব ঝেড়ে-পুঁছে রেখেছে। আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে সে একেবারে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়লো। অমিয়কান্তি তার পাশে বসে দুষ্টুমিভরা গলায় বললে, ঠিক হয়েছে যেমন চেহারার গর্ব ছিলো, সেটা চূর্ণ হয়েছে। নিজের মুখখানা অনেকদিন বোধ হয় দেখিসনি? দেখলে মূর্চ্ছা যাবি।

নিয়ে আয় তো আয়নাটা, আজ দেড় বছর মুখটা দেখিনি।

দেয়াল থেকে আয়নাটা, পেড়ে তার হাতে দিয়ে বললে অমিয়কান্তি, এই নে দেখ আমি স্মেলিং সল্ট-এর শিশিটা খুঁজে রাখি।

নিজের চেহারা দেখে অমিতাভ যেন দুর্বল হয়ে পড়লো; হাতটা

তুলে আয়নাটা ফেরৎ দিতেও যেন তার ক্লান্তি লাগছে। অমিয়কান্তি হেসে বললে, জানিস মিনটু আমিও জেল খেটে এসেছি।

কি বললি জেল খেটে এসেছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ বীরপুরুষ। তার কথা শেষ হবার পুর্বেই অমিতাভ তাকে জড়িয়ে ধরলে, টাল সামলাতে না পেরে অমিয়কান্তি গড়িয়ে পড়লো বিছানায়; ঠিক সেই সময় মৃন্ময়ী দেবী ঘরে ঢুকে বললেন, স্নান করা নেই, কাপড় ছাড়া নেই, তুজনে বিছানায় গড়াতে শুরু করেছিস। নে ওঠ চা খেয়ে নে।

তুজনে উঠে হাসতে হাসতে চায়ের কাপ তুলে নিলে। মৃন্ময়ী দেবী বলে গেলেন, চা খাওয়া সেরে স্নান করতে যাবে মিনটু।

চা খাওয়া শেষ হতে অমিয়কান্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তুই যা স্নান করতে, আমি এখন যাই পরে আসবো।

সে চলে গেল; অমিতাভ এগোলো কলতলার দিকে।

কলতলায় সবগুলো বালতিতে গরম জল ঠাণ্ডা জল মিশিযে রাখা হয়েছে; সে গিয়ে বসলো একটা টুলে। মৃন্ময়ী দেবী কাপড় সেঁটে একটা গামছা হাতে এসে বললেন, বসদিকি তোর পিটটিট্‌গুলো ঘসে দি, গায়ে যেন এক ইঞ্চি ময়লা বসে আছে।

ব্যাপার বুঝতে পেরে হতাশভাবে চাইল অমিতাভ; তার মুখেব চেহারা দেখে ছোট বোনটা বলে উঠলো, দেখো মা, দাদা আমার মত রেগে যাচ্ছে চান করতে।

আসলে অমিতাভর রাগ মোটেই হয়নি, ছোট বোনটার সামনে বুড়ো বয়সে মায়ের সেবা নেওয়ার সঙ্কোচ কাটাতে পারছে না। গা, মাথা, পিঠ, এমন কি কানের গোড়া পর্যন্ত সাবান দিয়ে ঘসতে ঘসতে বললেন মৃন্ময়ী দেবী ক্ষুব্ধ স্বরে, পিঠে এতো বেতের দাগ।

কোন উত্তর না দিয়ে চোখ বুজে বসে রইল অমিতাভ। রাজ্যের ঘুম যেন তার তু চোখে নেমে এসেছে।

ষষ্ঠ সর্গ

॥ ১ ॥

পাথরের দেওয়ালে চুণকাম করা ছোট ঘরটার মধ্যে ললিত একটা অর্ধ সমাপ্ত ছবির ওপর তুলি বোলাচ্ছে। এ ছবিটা আজ তাকে শেষ করতেই হবে, কিন্তু কোন মতে মন বসাতে পারছে না। সৃষ্টির বাসনা যেন মরীচিকার মত নাগালের বাইরে তাকে হাতছানি দিয়ে চলেছে; মিলনাতুর পঙ্গু মন বারে বারে অক্ষম চেষ্টায় নির্জীব হয়ে পড়ছে। মাধুর্যহীন এই দাসত্ব সে কি করে করবে? হাতের তুলি থামিয়ে পায়চারি শুরু করলে ললিত: একি নিরুদ্দেশ যাত্রা। সমগ্র চেতনা রাজ্যের ওপর একটা কলঙ্কিত মুহূর্তের বেদনাদায়ক আধিপত্য; প্রেতাত্মার মত ভয়াল অতীতের অবিচ্ছেদ্য অনুসরণ। সম্মুখে অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের অপরিসীম শূন্যতা। হতাশভাবে বসে পড়লো সে খাটের ওপর। বেদনায় ভরে উঠলো তার মন; সেকি আর ছবি আঁকতে পারবে না? না না তা হলে কি নিয়ে থাকবে! এ দুর্বলতা তাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে। শিল্পীজীবনের পথে তাকে যিনি এগিয়ে দিয়েছেন, মনে পড়ে গেল তাঁর কথা; মনে পড়ে গেল এই অখ্যাত অজ্ঞাত সাধকের দুঃখদৈন্য ভরা জীবনসংগ্রাম। কলকাতার এই অবজ্ঞাত শিল্পপ্রতিভা। অভাবক্লিষ্ট পারিবারিক সমস্যার মধ্যে তাঁর অমরত্ব অভিলাষের সমাধি। ক্রেতার আদেশে বৈষয়িক শিল্পসৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রতিভার অপমৃত্যু। তাঁর একদিনের স্বীকারোক্তি: ললিত, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি পেটের তাগিদে জুতোর কালির প্রচারশিল্পী হবো।

অবসাদে যেন ভেঙে পড়লো ললিত। অনেক কষ্টে সে পূর্বাচার্যদের কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করলে; শিল্পীর জীবনে সংগ্রাম নূতন নয়।

তার চোখে ভেসে উঠলো : জগতের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী প্যারিসের পথে পথে তাঁর শিল্পসৃষ্টির পারিশ্রমিক চেয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু বিচক্ষণ বুদ্ধিমান প্যারিসিয়ানরা তা দিতে প্রস্তুত নয় আর্থিক অপব্যয়ের ভয়ে। শেষে সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাঁর প্রিয়তম ক্যানভাসটি কোন অনিচ্ছুক হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে তাঁর পরিবারের অনিবার্য দাবী পুরণ করতে হলো। এই তো শিল্পীজীবনের সংগ্রাম। ভাবতে ভাবতে নিজের সমস্যা যেন ম্লান হয়ে এলো ললিতের কাছে। তার সমস্যা এঁদের তুলনায় কত তুচ্ছ, তার স্নেহের সন্তান সামান্য রুটির জন্যে এখনও ক্রন্দন শুরু করেনি। তবে কেন সে পারবে না?

ক্ষিপ্রগতিতে তুলি আবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে চললো ছবির ওপর।

ঘণ্টাখানেক পরে ছবিটা শেষ করে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাইল সেই দিকে, ঠোটের কোণে একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো। এই ছবিটা নিয়ে গিয়ে দোকানদারের কাছে সে টাকা আনবে, হোটেলের ম্যানেজারকে বিল মিটিয়ে দেবে। আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো খাটের ওপব।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে জামাটা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ললিত ছবিটা বগলে করে।

পরিচিত বাদশাহী সড়কটা আজ অন্যদিনের তুলনায় জনহীন; চারিদিক ভাল করে চেয়ে দেখলে সে, দুপাশের দোকানপাট বন্ধ, মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় লোক দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে জটলা করছে; কেমন যেন অস্বাভাবিক আবহাওয়া। কিছুদুর গিয়ে ললিত দেখলে দুটো দোকান খোলা : একজন দোকানদার বসে তার মেহেদি মাখানো দাড়িতে হাত বুলোচ্ছে আর একজন জর্দার শিশিগুলো ময়ুর পালকের ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়ছে। মুহুর্তের মধ্যে একদল ছেলে সেই খোলা দোকান দুটোর সামনে এসে চিৎকার

করে উঠলো, ভকৎ সিং জিন্দাবাদ ; হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্লিকান আর্মি জিন্দাবাদ। ছেলেদের সঙ্গে দোকানদারদের কথা কাটাকাটি হলো সামান্য—ছেলেরা আবার জয়ধ্বনি করে তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেলো সরু গলির মধ্যে। ললিত ব্যাপারটা ঠাওর করতে না পেরে পা চালিয়ে দিলে গন্তব্যস্থানের দিকে। সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলে রাস্তায় যে-কটা দোকান খোলা সবগুলোই মুসলমানদের ; হিন্দুর দোকান হিসাবে ছবির দোকান যদি বন্ধ থাকে তা হলে সে যে বড় মুস্কিলে পড়বে।

নিজের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে ললিত দেখলে যা ভয় করেছিল তাই, ছবির দোকানটা তালাবন্ধ। নিরাশ হয়ে ফিরতে যাচ্ছিলো, পেছন থেকে স্থানীয় ভাষায় ডাক শুনতে পেলে, অনিলবাবু খবর কি ? কিছু দরকার আছে ?

ঘুরে দাঁড়িয়ে ললিত দেখলে তার পরিচিত দোকানদার দোকানের পেছনে দাঁড়িয়ে। সে ফিরে চললো সেই দিকে। তার কাছাকাছি এসে ললিত বললে, আপনার অর্ডারি ছবিটা এনেছি।

কই দেখি—ছবিখানা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে দোকানদারের মুখে প্রশংসার ভাব ফুটে উঠছিলো, সে সেটা সংযত করে নিয়ে বললে, আজ যে হরতাল।

চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করলে ললিত, কিসের হরতাল ?

কেন জানেন না আপনি ? ভকৎ সিং-এর ফাঁসি হয়েছে।

কিন্তু কতকগুলো দোকান খোলা রয়েছে ?

মুসলমানরা হরতালে যোগ দেয়নি।

আজ যদি ছবির টাকাটা দেন বড় উপকার হয়। সঙ্কোচের সঙ্গে বললে ললিত।

তাইতো বাবু দোকান তো আজ খোলা চলবে না, আচ্ছা কিছু টাকা পকেট থেকে আপনাকে দিচ্ছি।

খুশি মনে টাকাগুলো গুণে নিয়ে ললিত হোটেলে ফিরলো। ক্ষীণ আশার আলো উঁকি মারছে তার মনে; নূতন নামে, নূতন পরিবেশে, সৃষ্টির গৌরবে হয়তো তার নবজন্ম হবে। নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন বর্তমান, অজানা ভবিষ্যৎ হয়তো সে জয় করতে পারবে।

॥ ২ ॥

গান্ধী দি সেভিয়ার অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার। আকাশে একটা হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে বললে ভুতনাথ ওরফে ভুতো।

এটা আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার একটা অছিলা মাত্র—ক্রুদ্ধভাবে বললে অমিয়কান্তি তাকে কটাক্ষ্য করে।

মিত্তির বাড়ির ছাতের ওপর দারুণ জটলা পাকিয়ে উঠেছে রাজনীতি নিয়ে। অমিতাভ আলসেতে ভর দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে বয়াটার দোলানি লক্ষ্য করছে। অমিয়কান্তি ভারিক্কী ভাবে তর্ক করে চলেছে ভুতোর সঙ্গে। নির্মল, শান্তিরাম, শরৎ ইত্যাদি প্রধানত শ্রোতা হলেও মাঝে মাঝে ফোড়ন দিচ্ছে সুবিধা মতন। সম্ভ করাচী কংগ্রেস ফেরত ভুতনাথ তথাকার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে তর্কের জালে জড়িয়ে পড়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপর একদল লোক যে আস্থা হারিয়েছে, এই কথা অমিয়কান্তি মানতে চায় না আর ভুতনাথ বোঝাবেই।

সংগ্রামের চরম মুহূর্তে সংগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া নওজোয়ান সমিতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল মনে করে, তাই তারা কালো ফুলের মালা পরিয়েছে নেতাদের গলায়, তাদের গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে, তাদের বক্তৃতার সময় অপমান করে নিজেদের বিক্ষোভ জানিয়েছে এ আমি নিজের চোখে দেখেছি, বললে ভুতনাথ একদমে।

এটা নিছক গুণ্ডামী, বললে শরৎ।

গুণ্ডামী হতে পারে কিন্তু হাওয়া কোনদিকে বইছে বোঝা যায়।

নিছক উগ্রপন্থা। স্বাধীনতা সংগ্রামের শত্রুতা করা—বললে অমিয়কান্তি।

মোটেই তা নয়, মধ্যপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ।

রোমান্টিক কর্মপন্থার অগভীরতায় এই প্রতিবাদ কেবল ফাঁকা আওয়াজের মত হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

ভুল কথা, নওজোয়ানের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক আদর্শে গঠিত, হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্লিকান পার্টি এর সমর্থক।

করাচী প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসও বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান হতে চলেছে—তাদের লক্ষ্যও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে।

ওটা ধাপ্পাবাজী। জনসাধারণকে ঠকাবার একটা অপকৌশল।

ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যারা ও কথা বলে তারা দেশদ্রোহী, প্রায় চিৎকার করে বললে অমিয়কান্তি। উত্তেজিত ভূতনাথ কি একটা রূঢ় কথা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলো, অমিতাভ ক্ষোভের সঙ্গে দুজনকেই থামিয়ে দিয়ে বললে, যত বাজে তর্ক, দুজনেই শুধু গালাগালি দিয়ে চলেছো।

মানে—একসঙ্গে বললে অমিয়কান্তি ও ভূতনাথ।

মানে নওজোয়ানদের বিক্ষোভের স্বাভাবিক কারণ তাদের প্রিয় নেতাদের ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিতে হয়েছে, কংগ্রেসের এই আপোসের মধ্যে তাদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি; কংগ্রেস নেতৃত্ব বৈপ্লবিক না হলেও প্রগতিশীল কাজেই প্রতিক্রিয়াশীল বলে গালাগালি করারও কোন মানে হয় না।

টেররিস্টদের বাঁচানোর দায়িত্ব কংগ্রেসের নয়, বললে অমিয়কান্তি।

হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্লিকান আর্মি টেররিষ্ট দল নয়, ভকৎ সিং বটুকেশ্বর দত্ত যখন কমিউনিষ্টবিরোধী বিলের প্রতিবাদে পরিষদ গৃহে সামান্য পটকার আওয়াজ করে দাঁড়ালো তখন তাদের দুহাতে ভরা রিভলভার থেকে একটা গুলিও বেরোয় নি, হয়তো তারা পালাতেও পারতো বুলেটের সাহায্যে; তাছাড়া তাদের লেখা চিঠি আর কর্মপন্থা থেকে জানা গেছে, তারা বৈপ্লবিক মতবাদে বিশ্বাসী

সাম্যবাদী দল। তবে তাদের বাঁচাতে পারেনি বলে কংগ্রেস নেতৃত্বকে শুধু দায়ী করা যায় না।

অমিয়কান্তি চুপ করে গেল, ভুতনাথ দমাগলায় বললে, কিন্তু অমিতাভ কংগ্রেস নেতৃত্ব যে বেশিদুর এগোতে পারে না এটা তুমি স্বীকার করছো না কেন ?

ও সব কথা এখন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নই প্রধান, এখনও পর্যন্ত কংগ্রেসেরই জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করার দক্ষতা আছে, তাকে দুর্বল করা আত্মহত্যা করার সামিল। অমিতাভ ফিরে চাইল গঙ্গার দিকে।

ছেলেরদল একসঙ্গে বলে উঠলো, ঠিক ঠিক।

আলোচনার মোড় ঘুরলো অন্যদিকে। অমিতাভ বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে নিচে নেমে গেল।

ঘরে এসে ইজিচেয়ারে বসে পড়লো অমিতাভ। একটা দারুণ অবসাদ তাকে পেয়ে বসেছে ; যেন কিছু করার নেই, কিছু ভাববার নেই শুধু চোখবুজে পড়ে থাকা। একি অলসতা।

প্রায় অন্ধকাব হয়ে এলো। অমিতাভ তখনও চোখ বুজে শুয়ে ; ঘরে এসে ঢুকলেন মৃন্ময়ী দেবী, ভর সন্ধ্যে বেলা শুয়ে আছিস, শরীর খারাপ নয় তো মিনটু।

তিনি এসে কপালে হাত দিলেন। আলস্যভরে উত্তর দিলে সে, কিছু না এমনি।

তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন মৃন্ময়ী দেবী, কর্তাদের শিবকালীবাবু তোর জন্যে খুব করেছিল না রে মিনটু ?

হ্যাঁ মা। তিনি আর রুনু না থাকলে আমার যে সেদিন কি হতো কে জানে।

আহা লোকটি বড় ভাল, পোড়াকপালী রুনুর কথা আর কি বলবো। শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর কান্নার মত শোনালো।

আচ্ছা মা, রুনুর তো আবার বিয়ে দিলেই পারে?

সেকি হয়, হিন্দু ঘরের বিধবা।

কেন আইন পাশ করা আছে, বিয়েও তো আজকাল হচ্ছে।

সে কি আর সবাই পারে।

অমিতাভ চুপ করে গেল; তার মুখের দিকে চেয়ে চিন্তিত ভাবে বললেন মৃন্ময়ী দেবী, তোরা একসঙ্গে জেলের মধ্যে ছিলি?

মায়ের প্রশ্নে হেসে ফেললো সে।

তিনি বললেন, হাসছিস যে?

তোমার কথায়। একসঙ্গে মেয়ে পুরুষ কি জেলের মধ্যে থাকে, আলাদা আলাদা রাখা হয়।

অত জানি না বাপু, মিত্তিরদের ছোটকর্তা সেদিন তোকে দোষ দিয়ে কি সব বলছিল তাই—

কি বলছিল?

বলছিল, ওই মিনটুর সঙ্গে মিশে রুনু স্বদেশী করছে, জেলে যাচ্ছে, তুই নাকি এ সবের জন্য দায়ী।

ওঃ এই কথা।

তুই আর ওদের কোন কথায় থাকিসনি মিনটু, রুনুকে চিঠিপত্তর লেখা ছেড়ে দে, ওই ব্রজেনবাবুটি লোক মোটেই সুবিধের নয়, কখন কি বলে বসবে।

আচ্ছা আচ্ছা আমি আর চিঠি লিখবো না।

তোকে একবার মালতার ওখানে যেতে হবে, ওর বাবা হাস-পাতালে কেমন আছেন জেনে আয়।

অমিতাভর একটা মুখ মনে পড়ে গেল, ললিত, তার আবাল্য সাথী আজ খুনী, ফেরারী আসামী। সৌম্য, সুকান্তি, নিরীহ ললিত যে খুন

করতে পারে এ-কথা কে কবে কল্পনা করেছিল। সে বেদনাতুর গলায় বললে, আচ্ছা মা ললিত কি সত্যিই সুরেশ ডাক্তারকে খুন করেছে।

কি জানি বাপু।

মালতীদি কি বলে?

ও আবার কি বলবে? আমার কিন্তু ভাল লাগতো না ওই সুরেশ ডাক্তারের আসা যাওয়া। অত কথা তোর জেনে দরকার নেই—যা তাড়াতাড়ি খবরটা নিয়ে আয়।

মা কথাটা চেপে যাচ্ছেন দেখে প্রশ্ন না করে অমিতাভ উঠে চলে গেল।

উঠোন পেরিয়ে মালতীদের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তেই অমিতাভর কানে এলো কর্কশ কণ্ঠে মালতী কাকে বলছে—আপনি চলে যান বলছি চলে যান। পরক্ষণেই একটা বেহায়ার মত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, আহা রাগ করো কেন গো, আমি না হয় যাচ্ছি, টাকাটা তুমি নাও লক্ষ্মীটি। তারপর চিৎকার করে উঠলো মালতী, ও টাকা চাই না, আমি উপোস করে মরবো, আপনি বেরিয়ে যান বলছি নয়তো লোক ডাকবো। ভেতর থেকে পদশব্দ শুনে অমিতাভ দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো; ব্রজেন্দ্রনাথ অস্ফুটকণ্ঠে কি সব বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। সে ভেতরে চলে গেল।

তাকে দেখে প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে উঠলো মালতী, তুই আবার কি করতে এলি, চলে যা আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

থতমত খেয়ে অমিতাভ বললে আস্তে আস্তে, মা, মা পাঠালেন মেশোমশায় কেমন আছেন জানতে।

মালতী প্রায় আপন মনে বললে, ডাক্তারেরা বলেছেন কোন আশা নেই।

এরপর কি কথা বলবে খুঁজে না পেয়ে অমিতাভ মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো। মালতী কাছে এসে তার গালে কাল বেতের দাগ

ছুটোর দিকে চেয়ে বললে, তোকে ওরা এই রকম করে মেরেছে ভাই।

এতক্ষণ যে প্রশ্নটা পেটের মধ্যে গজগজ করছিল সাহস পেয়ে অমিতাভ সেটা বলে ফেললে; ছোটকর্তার ওপর তুমি এতো রাগারাগি করছিলে কেন মালতীদি ?

আমি বলি আর তুমি ছুটে গিয়ে খুন করে ফেরার হও। তোমরা সব পারো, তোমরা সব পারো।

তার চোখে অদ্ভুৎ অর্থহীন দৃষ্টি দেখে অমিতাভ ভয় পেয়ে গেল, মালতীদির মাথার গোলমাল হলো নাকি। সে তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালে। তাকে চলে যেতে দেখে রুদ্ধকণ্ঠে বললে মালতী, ওরে মিনটু ললিত কি আর ফিরে আসবে না ? তোরা পারবি না তাকে বাঁচাতে, সে যে কোনো দোষ করেনি।

কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে ভারী মনে বেরিয়ে গেল অমিতাভ ঘর থেকে।

॥ ৩ ॥
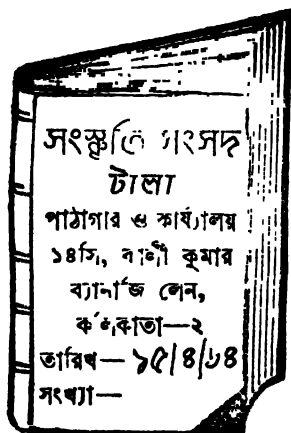
মিত্তির বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পশ্চিম দিকের ওপর নিচে পাঁচখানা ঘর ভাড়া নিয়েছেন একটি চাকুরে ভদ্রলোক, নাম নিশিকান্ত চৌধুরী। অবস্থা তাঁর ভালই বলা চলে, দেশে বাড়িঘর জমিজায়গা আছে এই সংবাদটা তিনি ইতিমধ্যে নিজেই কথায় কথায় এবাড়ির বাসিন্দাদের কাছে প্রচার করে ফেলেছেন। এতে ফলও ভাল হয়েছে সবাই তাঁকে বেশ সমীহ করে চলে। তাঁর পারিবারিক পরিস্থিতিও মন্দ নয়, স্ত্রী, চারটি সন্তান, দুটি কন্যা ও বিধবা বোন। ওপরে সুজাতা দেবীর ঘর দুটি ও নিচে সুজিৎ ঘোষের আর সুরেন সিংহের ঘর দুটি তাদেরই দখলে গেছে; অবশ্য সুরেন সিংহ এর পরিবর্তে পুর্বদিকে ব্রজবিহারী বাবুর অংশের একখানা ঘর পেয়েছে; ব্রজবিহারীবাবুর হাসপাতালে মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর ব্রজেন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থাটা করে ফেলেছেন। মালতীর আপত্তির প্রশ্ন নিরর্থক কারণ একখানা ঘরের ভাড়া দেওয়াই তার পক্ষে অসম্ভব।

সুরেন সিংহের নতুন ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে তার যৎসামান্য জিনিসপত্তর। একপাশে একটা টেবিলের ওপর কাগজপত্তরের স্তুপ আর তার পাশেই একটা ছোট তক্তপোশ, প্রয়োজন মাফিক চেয়ারের কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। ঘরের এককোণে একটা স্টোবের ওপর ভাত ফুটছে; কতকগুলো আনাজের টুকরো মেজেতে ছড়িয়ে।

তক্তপোশের ওপর অর্ধশায়িত অবস্থায় সুরেন কাগজ পড়ছে আর মাঝে মাঝে আড়চোখে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির দিকে লক্ষ্য করছে।

ভাতের জল কমে আসতেই সে উঠে গিয়ে ভাতটা নামিয়ে দিলে, তারপর কড়া চাপিয়ে মেজেতে ছড়ানো আনাজগুলো তাতে ছেড়ে

দিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করে জল ঢেলে ফের এসে বসলো কাগজ পড়তে।

কাগজ পড়তে পড়তে এক সময় তার কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ওরা খুন করবে কমরেডদের। এত দেশ থাকতে মিরাটে নিয়ে গিয়ে তারই ষড়যন্ত্র চলেছে।

অমিতাভ এসে দরজায় উঁকি মারলো; সুরেনকে দেখে ঘরে ঢুকে বিস্মিত হয়ে বললে, আরে তুমি এখানে সুরেনদা? এ ঘরে এলে কবে?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললে সুরেন, এসেছি এই কদিন, ওদিকে এক বড়লোক এসে আমায় ঘরছাড়া করেছে।

মালতীদি কোথায় গেলেন?

মালতী-ফালতী জানি না।

অমিতাভ লক্ষ্য করলে মালতীদির ওঘরে যাবার দরজার সামনে একটা ভাঙ্গা র‍্যাক দাঁড় করানো আর তাতে নানা রকম আজে বাজে জিনিস জমা করা।

সুরেনের কাছাকাছি গিয়ে বললে সে, সুরেনদা আপনার কাছে একটা ক্ষমা চাইবার আছে—এতদিন সুযোগ পাইনি।

সুরেন তার দিকে চেয়ে নির্লিপ্তভাবে বললে, কারণ?

আপনার মনে আছে সেই যে আমি বস্তিতে গেছলাম?

কথাটা শুনেই সোজা হয়ে বসলো সুরেন। তারপর কাগজটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে রূঢ়ভাবে বললে, এই নাও দেশভক্ত পড়ে দেখো, তুমি যাকে অশ্রদ্ধা করে সেদিন ক্লাইবের সঙ্গে তুলনা করেছিলে, সেই ইংরেজ তোমার চেয়ে তোমার দেশের জন্যে কত পরিষ্কারভাবে চিন্তা করেন। তোমার দেশের জন্যে কতখানি দুঃখকষ্ট বরণ করে নিয়েছেন।

লজ্জিত অমিতাভ সঙ্কুচিত ভাবে বললে, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার

খবর আমি প্রতিদিন পড়ি সুরেনদা, সেদিনের সেই ব্যবহারে আমি অনুতপ্ত।

সুরেনের মুখ হাসিতে ভরে উঠলো, সে অমিতাভকে তক্তপোশে টেনে বসিয়ে বললে, আমি জানতুম তুমি একদিন ভুল বুঝতে পারবে।

দেখ সুরেনদা এর থেকে আমি একটা শিক্ষা পেয়েছি, অনেক ক্ষেত্রে মতের পার্থক্য থাকলেও অসহিষ্ণু হওয়া অপরাধ।

সুরেন উঠে একবার তরকারিটা নাড়াচাড়া করে এলো, তারপর হেসে বললে, তোমরা সংস্কারপন্থীরা আমাদের ঠিক মত না বুঝলেও অন্তত ওইটুকু ভদ্রসুলভ ব্যবহার আমরা আশা করতে পারি।

আমি সংস্কারপন্থী নই সুরেনদা। তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করলে অমিতাভ।

আপত্তি থাকলে কথাটা ঘুরিয়ে নিচ্ছি গান্ধীপন্থী বলে।

তোমার খুশি বলতে পারো, তবে আমি—অমিতাভ কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সুরেন উঠে তরকারিটা নামিয়ে একটা পাতায় ঢেলে ফেলে বললে, কিছু মনে করো না ভাই, আমি খাওয়াটা এইবার সেরে নেবো।

এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছেন ?

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আজ অধিবেশন আছে, যে চটকলে আমি কাজ করি সেখানের মজুরদের একটা শোভাযাত্রা নিয়ে আমাকে অধিবেশনের আগে পৌঁছুতে হবে।

অধিবেশন কোথায় হবে ? আমায় নিয়ে চলুন না।

সম্ভব হবে না মিনটু।

কোথায় হবে, আমি একা যেতে পারবো না ?

এলবার্ট হলে, তোমার না যাওমাই ভাল, হাঙ্গামা হতে পারে।

তার মানে ? বিস্ফারিত নেত্রে চাইল অমিতাভ।

মানে কতগুলি প্রতিক্রিয়াশীল নেতা আমাদের শ্রেণী-সংগ্রামকে

দুর্বল করে দিতে চায়, আমরা তা হতে দেব না, সুবিধাবাদী নেতৃত্বের স্বরূপ প্রকাশ করবো।

এখানেও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ?

উপায় কি ভাই, প্রথমেই সাবধান হওয়া ভাল। আমাদের আন্দোলন শৈশব অবস্থায়, মুখে রক্ত তুলে নিজেদের সঙ্ঘ গড়ে তুলেছি তা কি বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বের হাতে তুলে দেবার জন্যে ?

বিচারে তোমাদের ভুল হতে পারে তো ?

ভুল যদি হয় তার মধ্যে শ্রমিকরা অভিজ্ঞতা লাভ করবে, নিজেদের শক্তির পরিচয় পাবে, নির্ভুল জড়ত্বের চেয়ে সেটা লক্ষগুণে ভাল। কথা শেষ করে সুরেন খেতে বসে গেল।

অমিতাভ একটু চুপ করে থেকে বললে, আমি একাই যাবো, তোমাদের আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হতে আমার বড় ইচ্ছে করছে।

যেও ভাই, গেলে আমরা খুশিই হবো, কিন্তু আমাদের ব্যবহার হয়তো তোমার ভদ্ররুচিতে বাধবে। শুধু এইটুকু অনুরোধ, আমরা শ্রমিক, আমাদের সঙ্গে তোমাদের স্বভাবের যে অনেক পার্থক্য আছে সেটা স্মরণ রেখো।

সুরেনদা তুমি নিজেকে শ্রমিক ভাবো কি করে ?

সুরেন একটু নড়ে চড়ে বসে একটু জল খেয়ে শুরু করলে. কাজের মধ্যে দিয়ে যে-কেউ শ্রমিক শ্রেণীতে আসতে পাবে, তবে আমার তা দরকার হয়নি। আজকের এই সামান্য অবস্থার উন্নতি দেখে তোমার সন্দেহ হতে পারে মিনটু। আসলে আমি একজন সাধারণ ক্লিনার ছিলুম, চেষ্টা করে কোনরকমে ফিটার হয়েছি, ভবিষ্যতে হয়তো ইন্‌জিনিয়রও হতে পারতুম সুযোগ পেলে ; এই শ্রমিক সঙ্ঘের দৌলতে লেখাপড়া শিখেছি, দুনিয়াকে দেখতে শিখেছি, নিজেদের অবস্থা বুঝতে শিখেছি। বালক সুরেন সিংহকে দেখলে তোমরা হয়তো চোখ ঘুরিয়ে নিতে—আজকে তোমার সঙ্গে কথা

বলার সুযোগ পাচ্ছি শুধু শ্রমিক সঙ্ঘের দৌলতে। তোমারি মত ভদ্র মানবপ্রেমিক মহৎ লোক যাঁরা প্রথমে ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদেরই চেষ্টায় আমার এই অবস্থার উন্নতি।

শেষের দিকে সুরেনের গলার স্বর ভারী হয়ে উঠলো; বাল্যের সেই অসহায় দিনগুলো বুঝি স্মৃতির সমুদ্রে চঞ্চল হয়ে উঠেছে; সে একটু সামলে নিয়ে বললে, তুমি যেও মিনটু তবে কোন হাঙ্গামা হলে সরে যেও। তোমাদের কংগ্রেসী নেতার পক্ষ নিয়ে শ্রমিকদের বিপক্ষে দাঁড়িও না, সেটা আমি সইতে পারবো না।

ঠিক বুঝতে পারলুম না।

একজন কংগ্রেসী নেতা আজ সভাপতি, আর তার সঙ্গেই যত মতবিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে শ্রমিক সঙ্ঘের।

দারুণ অস্বস্তিতে অমিতাভ ছটফট করে উঠলো; মুখের মধ্যে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটে বেরিয়ে এলো।

তারদিকে চেয়ে একটু হেসে বললে সুরেন, আমি জানি তুমি এ সহ্য করতে পারবে না। তুমি যেও না আমার অনুরোধ, এতে তোমাদের কংগ্রেসের কোন ক্ষতি হবে না। এটা আমাদের নিজেদের সমস্যা।

সেই ভাল আমি যাবো না সুরেনদা। চিন্তিতভাবে উঠে অমিতাভ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

সুরেন তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে জামা পরে খালি পায়ে বেরিয়ে গেল, ঘরের দরজায় কুলুপটা টিপে দিয়ে।

॥ ৪ ॥

এলবার্ট হলের সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়ালো সুরেন। চারদিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার দেখে নিলে। দুরে গোটা কতক সন্দেহজনক লোক লাঠি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ছুটো পেশোয়ারী গুণ্ডা একপাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে আর ওপরের দিকে চাইছে; পাগড়ী বাঁধা জন চারেক দারোয়ান গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে হলের দিকে চেয়ে আছে।

রাস্তায় নেমে সুরেন ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট-এর দিকে এগিয়ে চললো; গতিক তার মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না, শ্রমিকদের সাবধান করে দিতে হবে। যেতে যেতে তার কানে এলো একজন আর একজনকে বলছে, ব্যপার সেই পুরনো, সুভাষ-সেনগুপ্ত বুঝছো? তাই এত ব্যবস্থা। চট করে মাথা ঘুয়িয়ে একবার দেখে নিলে সুরেন লোক ছুটোকে। গলির মোড় ঘুরতেই মজুরদলের সামনে এসে পড়লো। সহস্র সহস্র মজুর মিটিং-এর জন্যে অপেক্ষা করছে।

সুরেন প্রথমে তাদের সামনের দলকে বলতে শুরু করলে, মিটিং এর অবস্থা সুবিধের নয়; সভাপতি নতুন এফিলিয়েসন দিতে রাজি নন, এই নিয়ে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে, কমরেড রণজিৎ অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন সভাপতির রিরুদ্ধে, কিন্তু সভাপতি মশায় নিজের মান বাঁচিয়েছেন। সাধারণ অধিবেশন সম্বন্ধে সভাপতি বলেছেন, শ্রমিকেরা আজ ফিরে যাক, কাল কাজে হরতাল করে সভায় যোগ দেবে।

বটে, আমরা এই জন্যে এতো লোক কষ্ট করে রোদে দাঁড়িয়ে আছি? বেইমান কাঁহাকা। আমরা এখুনি মিটিং-এ যাব, ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ—ক্রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো একটি কুলি। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে চিৎকার উঠলো—ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ।

একজন এগিয়ে যেতে যেতে বলছে, ভাই সব আমার সঙ্গে এসো। এর কৈফিয়ৎ চাই। এর বিচার চাই।

হুড়মুড় করে দলে দলে শ্রমিক ছুটে চললো এলবার্ট হলের দিকে। সুরেন আপ্রাণ চিৎকার করে বললে, বন্ধুগণ থামো, আগে ভেবে নাও।

সহস্রকণ্ঠের জিন্দাবাদধ্বনিতে তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। পেছনে পেছনে সেও ছুটে চললো।

হলের সামনে দরজার গোড়ায় পেশোয়ারীগুলো এত লোক দেখে সরে পড়লো দরজা ছেড়ে। ঠিক সেই সময় দ্বিধাগ্রস্থ অমিতাভ ভিড়ের চাপে ভেতরে ঢুকে গেল। ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত মজুরদের মুখের দিকে সে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। অনেক চেষ্টা করেও সে এখানে না এসে থাকতে পারেনি। সুরেনদার নিষেধই যেন তাকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে এলো।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ। গান্ধীবাদ বরখলাপ, মজদুর কিসান জিন্দাবাদ—সহস্রকণ্ঠের বীরদর্পে বুঝি হলের ভিৎ কেঁপে যাবে।

বন্যার মত মজুররা হলের মধ্যে ঢুকে পড়লো; তাদের আওয়াজে পদভরে কেঁপে উঠলো কাউন্সিল বৈঠক। দেখতে দেখতে সভাপতির আসন শুন্য হয়ে গেল; নতমস্তকে একদল নেতৃস্থানীয় লোক হলের পেছন দিকের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রুক্ষ চেহারার একজন শ্রমিকনেতা টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন; সহ-সভাপতি কমরেড মুখার্জির নাম সভাপতি হিসাবে প্রস্তাব করা হলো। শুরু হলো নিয়মিত সাধারণ অধিবেশন। পুর্বসভাপতির ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করা হলো সমবেতভাবে।

এসব যেন হেঁয়ালি ঠেকছে অমিতাভর কাছে; সুরেনদা ঠিকই

বলেছিল, তুমি বুঝবেনা আমাদের—ভাবলে সে। অধিবেশন শেষে মজুরদের মুখের দিকে চাইতে চাইতে হল থেকে বেরিয়ে গেল ; মজুররা যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় দাঁড়াতেই একটা বলিষ্ঠ হাত তার কাঁধে চাপলো, উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, তুমি যে আসবে না বলেছিলে মিনটু ?

না এসে পারলুম না সুরেনদা, ক্লান্তভাবে উত্তর দিলে সে।

কেমন দেখলে ?

ভাল বুঝতে পারলুম না, তোমরা জয়ী হয়েছো ?

জয় অবশ্য আমাদেরই, কিন্তু এই অনৈক্যের কুফল কিছুদিন ভোগ করতে হবে শ্রমিকদের ; অন্য উপায় অবশ্য ছিল না। চিন্তিতভাবে সুরেন বললে অমিতাভকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে।

আচ্ছা সুরেনদা তোমাদের ধ্বনির মধ্যে জাতীয়তাবাদী নেতাদের অশ্রদ্ধা করা হয়, এর ফল কি ভাল ?

সুরেন কোন উত্তর না দিয়ে হাসলে, এ-নিয়ে কথা না তোলাই এখন ভাল, কারণ আমরা দুজনেই ক্লান্ত, চলো ওই ট্রামটায় উঠে পড়ি।

একটু হেসে বললে অমিতাভ, খালি পা না হলে বুঝি বিপ্লব করা যায় না সুরেনদা ?

না না আজ তাড়াতাড়ি জুতো পরতে ভুলে গেছি। লজ্জিত ভাবে বললে সুরেন।

॥ ৫ ॥

কোথায় ছিলি মিনটু কাল ? বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলো অমিয়-কান্তি। অমিতাভ একমনে একখানা বই পড়ছে, চোখ না তুলেই বললে, ট্রেড ইউনিয়ন-কংগ্রেস দেখতে গেছলুম।

কথাটা বিশ্বাস করতে না পেরে, চোখ ছানাবড়া করে বললে অমিয়কান্তি, ওখানে কি জন্যে ?

এমনি জানতে গেছলুম ওরা কি বলতে চায়।

ওদের আবার বলার কি আছে গুণ্ডামি ছাড়া ? যত সব রাশিয়ার পয়সা খাওয়া এজেণ্ট !

আমি কিন্তু গুণ্ডামির প্রমাণ পাইনি, প্রমাণ পেয়েছি সেখানেও নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ, সারা বাংলাদেশের মত।

বিরোধ নয়, শ্রমিক আন্দোলনের গতিকে ঠিকপথে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল।

অন্যদিকের যুক্তি কিন্তু আলাদা তাঁরা বলেন সেখানে ভাঙ্গন ধরাবাব চেষ্টা হয়েছিল।

ভাড়াটে লোকরা সবই বলতে পারে, জোরে বললে অমিয়কান্তি।

ভাল কবে না জেনেই ও-কথায় অতটা জোর দিওনা।

কেন ? প্রফুল্লদাতো সব জানেন, তিনিই ওকথা বলেছেন।

তোমার মত বিশ্বাসী মন পেলে শান্তি পেতাম অমিয় ! হেসে ফেলে বললে অমিতাভ।

যাক্ গে। ওদিকে ইউ, পি-তে গণ্ডগোল আবার ঘনিয়ে এসেছে, গোলটেবিলের খবর কি ?

জানি না। গোলটেবিবের ওপর এখনও আস্থা আছে দেখছি ; গান্ধীজি যদি শুধু হাতে ফিরে আসেন কি হবে ?

সংগ্রাম শুরু হবে। কিন্তু, চিন্তিতভাবে বললে অমিয়কান্তি।

কিন্তুটা খুব সত্যি, বিশেষ বাংলার পক্ষে ; একদিকে সুভাষপন্থী অন্যদিকে সেনগুপ্তপন্থী, একদিকে গান্ধীপন্থী অন্যদিকে বিপ্লবপন্থী, তা ছাড়া সাধারণ হিন্দু-মুসলমান। স্বাধীনতা আমরা সবাই চাই, কিন্তু কি করে পাবো সেই হদিসটারই অভাব।

কংগ্রেসকে শক্তিশালী করাই একমাত্র উপায়।

কিন্তু করে কে ?

জানিস মিনটু আমাদের ওই নূতন ভাড়াটের দুটো ছেলে খুব বড় বড় কথা বলে, ওদের বৈঠকখানায় একটা মস্ত আড্ডা জমে। বুর্জোয়া, ক্যাপিটালিস্ট, প্রোলিটারিয়েট, ইত্যাদি কতকথা বলে যার মানেই বুঝতে পারিনা ; ওদের মতে নাকি কংগ্রেস বড়লোকদের দালাল।

মিত্তিরবাড়ির উঠোনে শশব্যস্ত ব্রজেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ওরে ও মেধো, গাড়ী থেকে জিনিসপত্তরগুলো নাবিয়ে নিয়ে আয়! অমিয়কান্তি, অমিতাভ দুজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শিবকালীবাবু রুনু উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। অমিয়কান্তি, অমিতাভ প্রণাম করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো হাসিমুখে। শিবকালীবাবু বললেন অমিতাভর দিকে চেয়ে, সব ভাল তো, মা-বাবা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমিয় কলেজে ভর্তি হতে পেরেছো ?

অনেক চেষ্টা করে বঙ্গবাসীতে ভর্তি হয়েছি।

বেশ বেশ। রুনুকেও কলেজে ভর্তি করে দিতে হবে, তুমি একবার কাল আমার সঙ্গে বেরোবে।

মাথা হেলিয়ে অমিয়কান্তি সায় দিলে, ইতিমধ্যে রুনু অমিতাভর আঁখি বিনিময় হয়ে গেল ; খুশির বান উপছে পড়ছে যেন দুজনের

চোখ দিয়ে। রামকালীবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, চলো ভেতরে, গাড়ীতে কি রকম ভিড় ছিলো ?

সবাই ভেতরে চলে যাবার পর অমিতাভ বললে, তুই যা অমি, আমি একটু কাজ সেরে আসি শ্যামবাজারে।

অমিয়কান্তিকে প্রায় একরকম ঠেলে দিয়ে অমিতাভ সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে ফিরে অমিতাভ যখন বাড়ি ফিরলো তখন হারাধনবাবুও রবিবারের দিনে খেতে বসে গেছেন। তাকে দেখে মৃন্ময়ী দেবী বললেন, এতো বেলা পর্যন্ত কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াস ?

তার মুখের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে হারাধনবাবু বললেন, মিনটু কি করবে কিছু ঠিক করতে পারলে ?

না, কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

যা হোক একটা ঠিক করা উচিৎ, লেখাপড়া না করো একটা চাকরীর না হয় চেষ্টা কবতে পারি, আমাদেব অফিসে যদি করো।

আমায় আর কিছুদিন সময় দিন।

ভাল, তবে আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি ঠিক করে নেওয়া ভাল।

অমিতাভর হাসি পেল বাবার কথায়। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সংগ্রামের ডাক আসবে আর সে তখন টুলে বসে ছককাটা খাতায় বড় বড় টাকার অঙ্ক বসিয়ে যাবে একথা যে কি করে বাবা ভাবতেও পারেন।

হারাধনবাবু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, মিনটু আমি জানি তুমি কি ভাবছো। কিন্তু তোমার মায়ের মুখ চেয়ে আর আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিৎ নয়।

এ সময়ে কথাটা চেপে যাওয়াই অমিতাভর কাছে সহজ মনে হলো। শুধু মা কেন, বাবাও আজকাল কেমন যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। তাকে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে

মৃন্ময়ী দেবী বললেন, দাঁড়িয়ে কেন ? বেলা কি হয়নি, স্নান সেরে খেয়ে নে।

অমিতাভ বেরিয়ে গেল ধীরপদে। মৃন্ময়ী দেবী স্বামীকে বললেন, ছেলেটা আজকাল দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে।

হবারই কথা। কলেজে ভর্তি হলেই পারে, তাও হবে না। চাকরী করারও ইচ্ছে নেই।

আমার কিন্তু মনে হয় অন্যরকম। চারদিক চেয়ে বললেন মৃন্ময়ী দেবী।

কি ?

ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও, বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা শুনে হেসে চাইলেন হারাধনবাবু তাঁর দিকে, তারপর বললেন ঠাট্টার সুরে, একই কৌশল প্রয়োগ পিতা পুত্রের ওপর !

মৃন্ময়ী দেবীর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো ; ক্রোধের ভান করে বললেন, তা বইকি ? নিজে ক্ষেপে গেছলেন এখন আমার দোষ ? কে তোমায় সেধেছিলো ?

দেখো চেষ্টা করে, মিনটুকে রাজী করাতে পারো যদি, আমার আপত্তি নেই। খাওয়া শেষ করে উঠে গেলেন তিনি।

॥ ৬ ॥
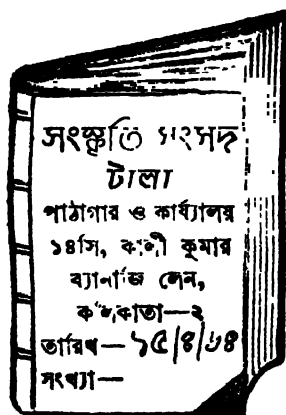
মিত্তিরবাড়ির সীমানায়, নানা জনের নানা সমস্যাসঙ্কুল ঘূর্ণাবর্তে একটি অসহায় জীবন প্রায় তলিয়ে যাচ্ছে, সেটা লোকচক্ষুর অগোচরেই রয়ে যায় বুঝি! প্রশ্বিল জীবন নিয়ে অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম যাদের করতে হয় অন্যের কথা চিন্তা করবার অবসর কই তাদের। তবু তার মধ্যে মৃন্ময়ী দেবী অমিতাভকে দিয়ে মালতীর খবর নিয়েছেন; কিন্তু মালতী আর তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিতে প্রস্তুত নয়; বার বার এই অযাচিত সাহায্য তাকে সঙ্কুচিত করে তুলেছে। সে এই উঞ্ছবৃত্তির শেষ করতে চায়; সে মরবে, শুয়ে শুয়ে সসম্মানে মরবে, তবু দয়ার দান আর গিলতে পারবে না। একবার তার মনে হয়েছিল দাসীগিরি করে একটা পেট চালিয়ে নেবে, কিন্তু আজন্মসঞ্চিত সংস্কার তাতে বাদ সেধেছে; পরের বাড়িতে দাসীগিরি করার চেয়ে ব্রজেন্দ্র নাথের সাহায্য গ্রহণ, তাঁর মনোরঞ্জন তার কাছে অনেক সহজ অনেক সম্মানজনক মনে হয়। কিন্তু তাও অসম্ভব। তাই শেষ পন্থা বেছে নিয়েছে আত্মহত্যা। দুদিন জলগ্রহণ না করে সে ভাবছে, এইভাবে অবাঞ্ছিত জীবনটা নষ্ট করবে। গলায় দড়ি দিতে ভয় হয়, কাপড়ে আগুন জ্বালাবার কথাও ভাবতে পারে না। বিষ খেতে পারে, কিন্তু পাবে কোথায়? আইনের বাধা! আইনের কোন অধিকার নেই তাকে মরার সহজ উপায় থেকে বঞ্চিত করার। জীবনধারণ যেখানে অসম্ভব সেখানে আত্মহত্যা আইনের সাহায্যে বন্ধ করতে যাওয়া তার কাছে হাস্যকর মনে হয়! সে মরবেই! তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এই তো দুদিন না খেয়ে মাথাটা ভাল করে তুলতে পারছে না আর কিছুদিন দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকলেই তার মুক্তি!

মালতীদি! ও মালতীদি!

বাইরের দরজায় আঘাত শুরু হয়েছে ; অমিতাভর গলা মালতী স্পষ্ট বুঝতে পেরেও মুখটা গুঁজে শুয়ে রইল। সে কিছুতেই দরজা খুলবে না।

কিছুক্ষণ পরে আঘাত থেমে গেল ; স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে মালতী পাশ ফিরলো।

হঠাৎ পাশের দিকের দরজায় মড়মড় শব্দ হতেই মালতী ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। সেই দরজাটা খুলে সামনে দাঁড়ালো অমিতাভ আর তার পেছনে সুরেন।

পরুষকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো মালতী, কেন এ দরজা খুললে ? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।

তোমার কি মাথা খারাপ হলো মালতীদি ? অনুযোগের সুরে বললে অমিতাভ।

বেশ করছি ! মাথা খারাপই হয়েছে, তোমার কি ?

আমার আর কি ! মা খবর নিতে পাঠালেন। আজ দুদিন হলো তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছ, ব্যাপার কি ?

আমার দরজা আমার খুশি বন্ধ রাখবো, তোমাদের কি ? তোমরা চলে যাও ! উত্তেজিত মালতী কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বসে পড়লো ; অমিতাভ তার দিকে এগিয়ে যেতেই সুরেন তাকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেল নিজের ঘরে।

মালতীর ঘরের দিকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে চুপি চুপি বললে, এখন আর ঘাঁটিও না মিনটু। আমি লক্ষ্য রাখবো, তোমাকে ভাবতে হবে না, যাও।

কিন্তু—

আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, ওঁর অনিষ্ট হতে দেবো না, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।

ওকে খাওয়াতে পারবেন সুরেনদা ?

যতদুর সম্ভব চেষ্টা করবো।

আচ্ছা আমি কাল সকালে খবর নেব, এখন যাই।

অমিতাভ চলে যাবার পর সুরেন ষ্টোভ জেলে রান্না করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

একঘণ্টার মধ্যে সে একটা থালায় গরম ভাতে দুধ আর চিনি মিশিয়ে মালতীর দরজাটা খুলে ফেললে। নিঃশব্দে থালাটা নামিয়ে রেখে আদেশের সুরে বললে, উঠুন এগুলো খেয়ে নিন।

অপরিচিত কণ্ঠস্বরে ত্রস্ত মালতী সোজা হয়ে উঠে বসলো, শরীরের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে অগ্নিদৃষ্টিতে চাইলো সে।

কঠিনভাবে বললে সুরেন, খেয়ে নিন, ঢের হয়েছে।

তার মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন ভয় হলো মালতীর। সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলে, চোখে পড়লো দুধমাখা গরম ভাত, তখনও ভাপ উঠছে; মিষ্টিগন্ধে ভরে গেছে ঘরটা। তার পেটের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

দেরী করছেন কেন, খেতে বসুন।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মালতী থালার দিকে; সুরেন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললে; মালতী চেঁচিয়ে উঠলো, কে তুমি? আমার ঘরে কেন ঢুকলে?

বেশি চেঁচামেচি করলে ভাল হবে না বলছি—সাবধান! ধমকের সুরে চোখ পাকিয়ে বলতে বলতে এগিয়ে গেল সুরেন মালতীর দিকে। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে মালতার গা ছম্‌ছম্ করে উঠলো, সে একমুঠো ভাত তুলে নিয়ে গিলে ফেললে তাড়াতাড়ি।

সুরেন দূরে সরে দাঁড়ালো, মালতী নতমস্তকে খেয়ে চললো; সুরেনের কথা বলার ধরন মালতীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন! খোসামুদীর রেশ নেই, আছে বজ্রকঠোর আদেশ; চোখের দিকে চাইলে বুক কেঁপে ওঠে। লোকটা যেন কি!

খাওয়া শেষ হতে একঘটি জল এনে নামিয়ে দিয়ে বললে সুরেন, আমি এখন যাচ্ছি,—এই পাশের ঘরেই থাকি। দরকার হলে ডাকবেন, কোন দ্বিধা করবেন না।

ব্যবহারে কণ্ঠস্বরে বিস্মিত মালতী চাইল সুরেনকে দেখবার জন্যে, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে ; সে টলতে টলতে গিয়ে ভেতর দিকের শেকলটা লাগিয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগলো।

॥ ৭ ॥
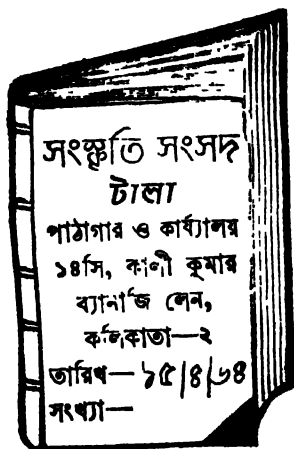
সকাল ন'টার সময় অমিতাভ সুরেনের দরজার কড়া ধরে বারকতক নাড়া দিতেই দরজা খুলে ঘুমজড়ানো চোখে এসে দাঁড়ালো সুরেন।

ভেতরে ঢুকে তক্তপোশের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে অমিতাভ জিজ্ঞেস করলে, খবর কি? এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিলে যে?

নর্দমার ধারে মুখ ধুয়ে নিতে নিতে বললে সুরেন, আর খবর। কাল সারা রাত ভুগিয়েছে।

কেন কি হলো?

হবে আবার কি, সারা রাত ওই গর্তের মধ্য দিয়ে তোমার দিদির তদবির করতে হয়েছে।

কি করছিল মালতীদি? বিস্মিত স্বরে বললে অমিতাভ।

রাত্রি একটার পর উঠে কি মতলবে যেন দড়ি যোগাড় করে আনলে রান্নাঘর থেকে—

শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে অমিতাভ, তারপর?

বেগতিক দেখে গলাখাক্‌রানি দিয়ে জানিয়ে দিলাম আমি জেগে আছি। আমার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি দড়ি ফেলে আবার শুয়ে পড়লো মাহুরে, তারপর থেকে আমাকে মাঝে মাঝে গলাখাক্‌রানি দিতে হয়েছে। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

খাওয়াতে পেরেছো?

হ্যাঁ তা পেরেছি।

এখন কি করা যায় বলো তো।

একমাত্র উপায় ওঁকে কোন কাজে লাগিয়ে দেওয়া, নয় তো কোন একটা গোলমাল করে বসবে।

কি কাজই বা করবে। আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।

তা বটে। ভদ্রলোকের লেবেল আছে, কাজের স্তরভেদ চাই।

ঠিক তা নয় সুরেনদা, মেয়েদের কাজ করা আমাদের দেশে স্বাভাবিক নয় নিরাপদও নয়।

বুঝলুম, কিন্তু এখন তিনটের মধ্যে বেছে নিতে হবে, স্বাধীন কাজ, দেহ বিক্রয়, নয় অনশনে মৃত্যু।

আমার চিন্তায় তো আসছে না, তুমি পারো কিছু করতে?

কোন রকমে জীবনধারণ করা চলে এই রকম একটা কিছু জোগাড় করে দিতে পারি।

ঝিগিরি নয়তো?

না, ধরো তার চেয়ে কিছু ভাল কুলীগিরি।

মানে?

মানে প্রভুর শুধু পরিশ্রমের ওপরই দাবী থাকবে, দেহের ওপর নয়, সে সম্বন্ধে উনি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

না না সে হয় না। লক্ষিতের দিদি কুলীগিরি করবে এ কি করে বলবো সুরেনদা। ছটফট করে উঠলো অমিতাভ।

ও অভিমান নিষ্ফল। দেখ যদি আর কিছু পারো।

লেখাপড়া জানা থাকলে হয়তো হোতো। কিন্তু—

কিন্তুই থেকে যাবে, মাঝখান থেকে একটা জীবহত্যা হবে।

ভেবে দেখি সুরেনদা।

দেখ, আমাকে রান্না চাপাতে হবে, আমি উঠছি।

অমিতাভ চলে গেল ঘর থেকে। সুরেন তার রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অমিতাভ আবার যখন ফিরলো তখন সুরেন রান্না সেরে দুটো থালায় ভাত তরকারি সাজিয়ে ফেলেছে। থালা দুটোর দিকে চেয়ে অমিতাভ বললে, তুমি একটা পাকা রাঁধুনী সুরেনদা।

নিশ্চয়, কতদিনের অভ্যাস। তাছাড়া লোকে বলে তরকারি আমি ভালই রাঁধতে পারি, খেয়ে দেখবে নাকি?

আজ দুটো থালা যে ?

কাজ আমার বাড়িয়ে দিয়েছো, একটি তোমার দিদিকে দিয়ে এসো।

আমার একা যেতে ভরসা হয় না।

বেশ তুমি দরজাটা খোলাও, আমি থালাটা বয়ে দিয়ে আসবো।

তুমি একাই যাও না সুরেনদা।

না একা যাবো না, আমাকে আর ফাঁসিও না ভাই, যা তোমাদের ছোটকর্তা আছেন।

কথাটার মানে বুঝে অমিতাভ হেসে বেরিয়ে গেল; সুরেন কান পেতে রইল পাশের দরজার দিকে।

একটু পরেই মালতী অমিতাভর কথাবার্তা শোনা গেল।

কাল একটা বদলোককে কেন আমার ঘরে এনেছিলি মিনটু ?

বদলোক কেন হবে ?

নয়তো কি ? আমাকে যেন মারতে এলো রাতে।

যাক। এখন তোমাকে খেতে হবে।

কি খাবো ?

ব্যবস্থা করেছি। কথার শেষে চট করে সুরেনের ঘরের শেকলটা খুলে দিলে।

মালতী সেই দিকে চাইতেই দেখলে একহাতে থালা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো রাত্রের লোকটা, পেশীবহুল দেহ, কোমরে একটা কাপড় জড়ানো। তার মন্তব্য হয়তো শুনতে পেয়েছে ভেবে মালতী লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলে।

সুরেন থালাটা সামনে নামিয়ে সোজা চেয়ে বললে, নিন, আমাদের কৃতার্থ করুন আজকের মত। মানুষ হয়ে জন্মেছেন অথচ সে-জন্মের মর্যাদা রাখতে শেখেননি। আত্মহত্যায় বাহাদুরি নেই।

আমি খাব না, আমি খাব না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মালতী।

অমিতাভ সান্ত্বনা দেবার ছলে বললে, মালতীদি তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা করেছি, আজকের মত খেয়ে নাও তারপর সব ঠিক করে দিচ্ছি।

তুই জানিস না মিনটু সবাই ফন্দি এঁটে সাহায্য করে, আমি অনেক দেখলুম, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, আপনার প্রলাপ শোনবার সময় নেই—কড়া সুরে সুরেন বললে।

অনুরোধ করলে অমিতাভ, খেয়ে নাও মালতীদি তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।

অমিতাভর দিকে চেয়ে সুরেন বললে, আমি চললুম এখন, কাজ করার ইচ্ছা থাকলে জেনে নিও—একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। তবে আর আমি ভাত রেঁধে খাওয়াতে পারবো না বলে দিচ্ছি। নিজের ঘরে ঢুকে একটা মুখের শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে সুরেন।

খাওয়া শেষ করে জামা গলিয়ে সুরেন যখন বেরোতে যাবে, অমিতাভ এসে ফেরৎ দিলে ধোয়া থালা দুটো। সুরেন বললে, কি ঠিক হলো?

কাজ করতে রাজী আছেন শুধু ঝিগিরি ছাড়া।

ভাল কথা, আমার এক দূর সম্পর্কের মাসি আমাদের চটকলের কাছে তেলেভাজা ছোলা মুড়ির দোকান করে, সেখানে কোন একটা ব্যবস্থা করে দেবো, পেশা স্বাধীন হবে, কুলীগিরিও করতে হবে না, দেখবারও একজন হবেন।

তাই করে দাও সুরেনদা, নয়তো ও ঠিক আত্মহত্যা করে বসবে।

আচ্ছা আচ্ছা এখন যাই আমার অনেক দেরী হয়ে গেল। দরজার কুলুপটা টিপে দিয়ে হনহন করে চলে গেল সুরেন। অমিতাভ বাড়ি ফিরলো।

॥ ৮ ॥

বৈঠকখানায় একান্তে বসে রামকালীবাবু গড়গড়ায় টান দিচ্ছিলেন, সেখানে দেখা দিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শিবকালীবাবু আর রুনু। মনে হলো তাঁদের মধ্যে একটা অমীমাংসিত আলোচনা চলেছে যার শেষ পর্যায় যেতে হলে রামকালীবাবুর সাহায্য অন্তত শিবকালীবাবু ও রুনুর কাছে অত্যাবশ্যক।

দাদা, ব্রজ বলছে রুনুর আর পড়াশুনার দরকার নেই।

কথাটা প্রায় শেষ হওয়ার আগেই ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, কলেজে পড়াটা আমার ইচ্ছে নয়, আমাদের বাড়ির মেয়েরা কলেজে পড়তে যাবে, লোকে বলবে কি ?

না জ্যাঠামশায়। আমি ভর্তি যখন হয়েছি তখন পড়বো, রামকালীবাবুর কাছ ঘেঁষে আবদারের স্বরে বললে রুনু।

তাই তো সমস্যা বটে। হাসতে হাসতে বললেন রামকালীবাবু।

দেখো দাদা কলেজে পডিয়ে মেয়েদের ধিঙ্গি করা আমি পছন্দ করি না। ওই বেম্ম মেয়েদের কাণ্ডতো দেখেছো ? বললেন ব্রজেন্দ্রনাথ বিরক্তভাবে।

বাবার যত কথা। শুধু বেম্ম মেয়েরাই বুঝি পড়ে কলেজে ?

ব্রজেন্দ্রনাথ খিঁচিয়ে উঠলেন, তুই তো সব জানিস। হয় বেম্ম, নয় বাঙ্গাল, কলকাতার বনেদী বংশের একটা মেয়ে দেখা দেখি কলেজে পড়ছে।

রুনু কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, তাকে থামিয়ে দিয়ে খাদপঞ্চমে বললেন রামকালীবাবু, পড়ে ব্রজ পড়ে। আর নাই যদি পড়ে, তাতেই বা কি ? নিজেদের কথা, নজির না দেখে নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হবে।

অনেক তো হলো, আর পড়ার দরকার কি ?

শিবকালীবাবু উত্তর দিলেন, পড়া ছাড়া আর ওর কাজই বা কি ? সে দিকটাও তো ভাবতে হবে।

যেমন তুমি ভাবলে মেজদা, শেষ পর্যন্ত জেল খাটিয়ে ছাড়লে।

জেল আমি নিজে গেছলাম, জ্যাঠামশায়ের কি দোষ, অবরুদ্ধ ক্রোধের সুরে বললে রুনু।

রামকালীবাবু গড়গড়ার নল রেখে ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি একটা দিকই ভাবছো ব্রজ। রুনুমার কলেজে পড়ায় রাজী হতে হবে, পড়াশুনাই এখন ওর সম্বল।

ক্ষুণ্ণ মনে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, যা পারো করো তোমরা, আমি কিন্তু পড়ার ঝামেলা নিতে পারবো না বলে দিচ্ছি। কথা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

রুনু শিবকালীবাবুব দিকে চেয়ে বললে, জ্যাঠামশায়, যাবার আগে আপনি আমার বইগুলো কিনে দিয়ে যাবেন, বাবার কথা তো শুনলেন। আমি এখন ওপরে যাই।

আচ্ছা যাও তুমি।

বৈঠকখানা ঘর থেকে রুনু এলো সোজা নিজের ঘরে ; ছোটগিন্নি একমনে রুনুর একটা ব্লাউজ সেলাই করছিলেন, তাঁকে এসে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে রুনু মাথাটা হেলিয়ে দিলে তাঁর কাঁধে। হকচকিয়ে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ কি করিস, লজ্জাও করে না বুড়ো মাগী।

মা মা, বাবা আজ খুব জব্দ হয়েছেন জ্যাঠাবাবুর কাছে।

কেন কি হলো ?

জ্যাঠাবাবু বলে দিয়েছেন আমি পড়বো।

তাই নাকি ?—হাসি মুখে বললেন ছোটগিন্নি, মনে হলো তার মুখের ওপর থেকে একটা দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল।

তোমাকে আর আমি চিনতেই পারবো না, দাঁড়াও না, বি-এটা পাশ করতে দাও।—খিলখিল করে হেসে উঠলো রুনু।

ওই মতলবই হচ্ছে পোড়ারমুখী। রুনুর গালে একটা মৃদু আঘাত করলেন তিনি।

যাই মা অমিদাকে খবরটা দিয়ে আসি—প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল রুনু ; খুশি মনে তার গতির দিকে চেয়ে ভাবলেন ছোটগিন্নি,—এ মেয়ের মুখে হাসি ফুটবে একথা কে কবে ভেবেছিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে রুনু সোজা উঠে গেল ছাদে অমিয়কান্তির সন্ধানে ; তার জানা আছে এই সময় অমিতাভ আর অমিদা ছাদের পশ্চিম কোণটায় বসে গল্প করে।

ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে অমিতাভ একা। অমিয়কান্তিকে দেখতে পেলো না রুনু। যাওয়া না যাওয়ার নীরব দ্বন্দ্বের মধ্যে রুনু ধীরে এগিয়ে গেল অমিতাভর দিকে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অমিতাভ তখন গঙ্গার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছে। রুনু যে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে সে দিকে খেয়াল নেই। আকাশভরা সিন্দুরে মেঘের রাজ্যে একটা বেদনাতুর সন্ধ্যাকে অবচেতন থেকে চেতনায় ঠেলে দিচ্ছে। মধুর কম্পিত কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো সে।

অমিতাভ কি ভাবছো ?

কিছু না কিছু না। কণ্ঠস্বর যেন ধরা পড়ে যাওয়ার সঙ্কোচে ভরা।

রুনু তার ডান হাতখানা তুলে নিয়ে বললে, আমি কলেজে পড়বো, বাবার বাধা টিকলো না অমিতাভ।

অমিতাভ ফিরে চাইল। তার বিষাদাচ্ছন্ন মুখের দিকে চেয়ে বললে রুনু, এতে তুমি সুখী হয়েছো ?

নিশ্চয়। তুমি?

খুব! যেন একটা পথ খুঁজে পাচ্ছি। হয়তো—কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল রুনু।

অমিতাভ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

থাক সে কথা। অমিদা কোথায়?

ওই নতুন ভাড়াটের ছেলেরা ধরে নিয়ে গেল।

তুমি গেলে না?

না।

অমিদাকে ওদের সঙ্গে মিশতে বারণ করো না কেন?

কেন বলো তো, একটু অবাক হয়ে বললে অমিতাভ।

ওদের আমার বেশ ভালো লাগে না, তা ছাড়া দুটো চালিয়াৎ মেয়ে আছে বড় পুরুষ ঘেঁষা।

হো হো করে হেসে উঠলো অমিতাভ; ক্ষুণ্ণ রুনুর মুখখানা টলটল করে উঠলো। অমিতাভ তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, অমনি রাগ হয়ে গেল। অমি কি আমার ছাত্র যে বারণ করলেই সে শুনবে?

যাও আমাকে ভোলাতে হবে না। কাঁধের থেকে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলে রুনু।

স্মৃতির ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অমিতাভর মন: বয়স হলেই কিছু আর মনটা পালটায় না। দুর্বল মুহূর্তে কখন যেন কাবু করে দেয় হিসেবী পাকা সতর্কতা। তার অভিমানরাঙ্গা মুখের দিকে চেয়ে বললে অমিতাভ রাগের ভান করে, বেশ আর ভোলাবো না।

তার কথা বলার ধরন দেখে হেসে ফেললে রুনু, বললে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে, রাগটা শুধু আমারই হয়, না?

নয় তো কি?

আচ্ছা সে বিচার তোলা রইল, আমি এখন চললুম। তাকে লক্ষ্য করে আঙুল নাড়িয়ে কথাকটা বলে রুনু চলে গেল।

সপ্তম সর্গ

॥ ১ ॥

উচ্চবিঘোষিত গৌরবমণ্ডিত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক গণ্ডগোল পাকিয়ে তুললো ; গোলটেবিলের গোলাকৃতি রেখাগুলো নাকি সমান্তরালে ছুটেছে ! সাধুরা বলছেন, ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার সদিচ্ছা থাকলেও ভারতের মঙ্গলের জন্যেই বর্তমানে তৃতীয়পক্ষের অভিভাবকত্ব প্রয়োজন। দুর্মুখেরা বলছেন, অদৃশ্য যাদুকরী হস্ত-চাতুর্যে গান্ধীজির স্বরাজ-নৌকা বানচাল হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ অঙ্কের ওপর শূন্য চেকে সই করেও তিনি হলধরের মন পেলেন না, তা ছাড়া দাঁড়ি, মাঝি, মাল্লার দলও বেঁকে বসেছেন। ভারতের ভাগীদার অনেক। অগত্যা তাঁর নগ্নমূর্তি সম্বন্ধে ইংলণ্ডবাসীদের কৌতুহল চরিতার্থ করে আতিথেয়তা ও বিদায়-অভিনন্দনের প্রশংসা করে স্বরাজ নৌকোর কথা ভুলে মেশিনী জাহাজেই চাপতে হলো।

এদিকে ভারতবর্ষে সরকারী মহল কলরব তুললেন, গান্ধী–আরউইন সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করা হচ্ছে, এ আমরা সহ্য করবো না, একদিনে শায়েস্তা করে দেবো কংগ্রেসীদের। কংগ্রেসীরা প্রতিবাদ জানালো, মিথ্যা প্রচার ! সরকারই সন্ধিশর্ত ভঙ্গকারী।

রাজনৈতিক ঈশাণ-কোণে ঝড়ের আভাস প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো ; শুরু হলো উভয় পক্ষের তোড়জোড়, আর দোষারোপ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পেয়ে ঝিমিয়ে যাওয়া অমিতাভর মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

একদিন তার মুখের দিকে চেয়ে মৃন্ময়ী দেবী বললেন, কি রে ব্যাপার কি, প্যাঁচা মুখে হাসি দেখছি যে ?

কি আবার ? তোমার যত—মাকে ধমক দিয়ে পালিয়েছিল সে তাঁর দৃষ্টির আড়ালে।

স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে বেরিয়ে অমিতাভ নিশিকান্তবাবুর অংশটার সামনে দাঁড়ালো ; ছেলেদের বসবার ঘরে তখন প্রচণ্ড আড্ডা জমে উঠেছে। এ সময় যাওয়া উচিত কিনা ভাবতে ভাবতে ঢুকে পড়লো অমিতাভ ঘরটার মধ্যে। সুজিৎ ঘোষের সেই ভাঙা ঘরটার চেহারা পালটে গেছে। সৌখীনভাবে সাজানো ঘরে ততোধিক সৌখীন পোশাক পরা ছেলেরা বসে। তাকে দেখে নিশিকান্তবাবুর বড়ছেলে সুখেন্দু এগিয়ে এসে বললে, এসো এসো অমিতাভ—আজ পথ ভুলে নাকি ?

মৃদু হেসে চাইল অমিতাভ সবার দিকে। তাকে মাঝখানের একটা সোফায় বসিয়ে সুখেন্দু বললে, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি —ইনি বিমল বোস, সাহিত্যিক কবি কলেজের জুয়েল ; এর নাম মৃগাঙ্ক পালিত, দক্ষিণ পাড়ার দারুণ সরেস বনেদী, বর্তমানে জার্ণালিজম্ করছেন ; এই অমল সোম, কলেজের ভাল ডিবেটার, আইন অমান্য আন্দোলনে জেল খেটে এসে এখন মার্কসিজম চর্চা করছেন আর ওদের তো তুমি চেনো, আমার ভাই নবেন্দু অমলেন্দু। ফিরে বললে—ইনি অমিতাভ রায়, আমাদের এই বাড়ির বাসিন্দা, কংগ্রেসভক্ত দেশসেবক।

নমস্কারের পালা শেষ করে অমিতাভ চাইল হাসিমুখে।

অমল সোম তার দিকে চেয়ে বললে, মিষ্টার রায়, আবার তো ঘনিয়ে এসেছে, দু-একদিনের মধ্যে আন্দোলন শুরু হবে, কি করবেন ঠিক করলেন ?

প্রসঙ্গটা উঠেছে দেখে খুশি হয়ে বললে অমিতাভ, যোগ দেবো আন্দোলনে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও যোগ দিতে বলবো।

আমিও যোগ দেবো ঠিক করেছি কিন্তু এঁরা বাধা দিচ্ছেন।

কেন ? হেসে বললে অমিতাভ।

অমল সোমকে থামিয়ে দিয়ে সুখেন্দু উত্তর দিলে, কারণ এ

আন্দোলন বুর্জোয়াচালিত, এতে স্বাধীনতা আসবে না, যদি আসে ত সে লাল শাসকের তাঁবেদার কালো শাসক।

অমিতাভ সোজা হয়ে উঠে বসলো, ঠোঁটের কোণে দৃঢ়তা ফুটে উঠলো।

তাড়াতাড়ি বললে অমল সোম, আমি কিন্তু এদের সব কথা মানি না অমিতবাবু।

সুখেন্দুবাবু লাল শাসকবৃন্দকে কাল শাসকবৃন্দের চেয়ে বেশী পছন্দ করেন দেখছি। কথার মধ্যে ঝাঁজের একটু আমেজ কিছুতেই এড়াতে পারলো না অমিতাভ।

সুখেন্দু যেন এই অপেক্ষাই করছিল, বিশেষ ভঙ্গীতে চিবিয়ে চিবিয়ে কায়দামাফিক বললে সে, আমরা এমন একটা আন্দোলনের অপেক্ষায় আছি যা ইণ্ডিয়ার ম্যাপের ওপর থেকে ওই দু-রকম শাসকেরই চিহ্ন লোপ করবে। যাকে বলে প্রলিটারিয়েট রেভলিউশন।

ভোজবাজীতে বিশ্বাস আছে দেখছি আপনার। মৃদু হেসে উত্তর দিলে অমিতাভ।

ঠাট্টা করছেন? কিন্তু জানবেন একমাত্র প্রলিটারিয়েট রেভ-লিউশনই স্বাধীনতা দিতে পারে দেশের জনগণকে।

এইসব দিবাস্বপ্ন নিষ্ক্রিয়তার বর্ম বটে।

তুমি বুঝবে না অমিতাভ। অনুযোগের সুরে বললে সুখেন্দু।

আঃ থামাবে তোমাদের পলিটিকেল জাগলারি! কোণের সোফায় চোখ বুজে বসে থাকা বিমল বোস হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো।

অমল বোস সুখেন্দুকে ইশারা করে বিমলকে বললে, কবি তুমি নাকি আজকাল চরকার ওপর কবিতা লিখছো?

রট, কে বললে?

কেন, তোমার দাদা, সেই চরকা সঙ্ঘের।

ও ইয়েস মনে পড়েছে। বলেছিল বটে একটা লিখতে।

লিখলে নাকি ?

পাগল ! আমায় প্রচারক পেলে ? হতাশভাবে চাইল সে বন্ধুদের দিকে।

ঘরে এসে ঢুকলো দুটী তরুণী ; পেছনে চাকরের হাতে ট্রেতে চায়ের কাপ ও সরঞ্জাম। সকলেই সংযত হয়ে বসলো ; অমিতাভ চাইল সোজা ; দুজনেরই প্রসাধন স্পষ্ট, চুলের পাকান বিন্যাস সম্পূর্ণ নূতন লাগলো তার ; দেখতে মোটের ওপর মন্দ নয়, চটক আছে।

সুখেন্দু অমিতাভকে বললে, আমার দুই বোন রেবা বিনতা। ফিরে বললে, ইনি অমিতাভ রায়।

আমরা চিনি ওঁকে। ছাতে প্রায়ই ঘুরে বেড়ান। বললে রেবা মিষ্টি হেসে।

চা পরিবেশন শেষ হবার পর অমল সোম বললে অমিতাভকে, আলোচনাটা শেষ করুন অমিতবাবু।

আলোচনার কি আছে, কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেন তো আন্দোলনে যোগ দিন।

আমি যোগ দেবো অমিতবাবু। নবেন্দু বললে দাদার দিকে একবার চেয়ে।

সেকি তোমার দাদা আন্দোলনের বিপক্ষে।

দাদার মত আমি বুঝি না।

বুঝতে হলে বুদ্ধির দরকার—ক্রোধের সঙ্গে বললে সুখেন্দু।

আমারও ইচ্ছে হচ্ছে যোগ দিতে। বললে অমল সোম।

আইডিয়ালিষ্ট মাত্রেরই এটা স্বাভাবিক। বললে সুখেন্দু কটাক্ষ্য করে।

অমিতাভ উৎসাহিত হয়ে বললে, স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে চাই আইডিয়ালিজম, চাই নেতৃত্বে বিশ্বাস, চাই সৈনিকের মন !

সুখেন্দু কি যেন বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে রেবা বললে,

থামো দাদা তুমি আর বক্তৃতা শুরু করো না, দেখছো ওদিকে বিমলবাবু বেড়ালের মত ঢুলছেন।

সবাই হেসে উঠলো ; অমিতাভ বললে, আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনাদের বিরক্ত করলাম।

সেকি এর মধ্যে উঠলেন ? বললে অমল সোম।

ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল অমিতাভ।

॥ ২ ॥
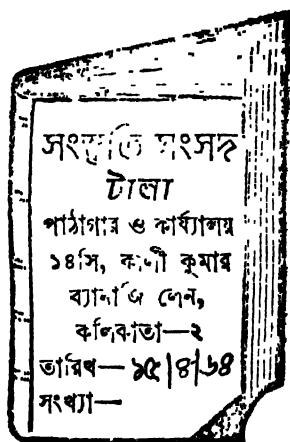
ছবির দোকান থেকে বেরিয়ে প্রায় নৃত্যের তালে এগিয়ে চললো ললিত। এ মাসের রোজগার তার আশাতীত। নোটের বাণ্ডিলে পকেটটা বোঝাই ; দেশী প্রিন্সদের মতন দিলদরিয়া মেজাজ।

বাদশাহী সড়ক কাটিয়ে সে ঢুকে পড়লো আধুনিক পিচের রাস্তায়। রেস্তোরাঁর খোঁজে চারিদিক চাইতে চাইতে চললো। হঠাৎ পেছন থেকে টাঙ্গাওয়ালার গলা শুনতে পেলে, ক্যা বাবু বেহুস্ হ্যায় ?

পিঠের কাছে ঘোড়ার নিঃশ্বাসে চমকে উঠে সে পাশের দিকে সরে গেল। যেতে যেতে দেখলে খানিকটা দূরে একটা মিছিল, জাতীয় পতাকা নিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছে ; কোথা থেকে একদল পুলিশ এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে এলো সামনেটা। ভয় পেয়ে ললিত পাশের একটা গলিতে সরে গেল। গোলমাল মিটে যেতেই আবার চললো বড় রাস্তা দিয়ে। তার মনে পড়লো একটা মুখ, মিনটু। আবার গোলমাল বেধেছে, হয়তো সেও মেতে গেছে এতদিনে। ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠলো বুকের ভেতরটা ; দিদি, বাবা, রামকালীবাবু, অমিয়—মিত্তিরবাড়ির সবাইকে মনে পড়ে গেল। যেতে যেতে চোখে পড়লো, দি প্রাণ্ড রেস্তোরাঁ। ধীরপদে কারপেট পাতা প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে।

একটা কেবিনের মধ্যে বসতেই ওয়েটার নামিয়ে দিলে টেবিলে ফ্রেমে আঁটা মেনুটা।

নাম না জানা দুটো খাবার মেনু থেকে খুঁজে বার করে অডার দিলে। ওয়েটার দ্বিধাভরে জিজ্ঞেস করলে, ড্রিঙ্ক বাবুজী ?

তার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল

ললিত। ওয়েটার বেরিয়ে গেল পর্দার বাইরে। পর্দার ফাঁকে ললিতের চোখে পড়লো সামনের কেবিনে বসে দুটি ইংরাজ যুবক যুবতী টেবিলের তলায় পরস্পরের পা নিয়ে খেলা করছে আর উচ্ছল হাসি হাসছে। অকারণে তাঁর মনে আক্রোশ জমা হয়ে উঠলো, চট করে পর্দার ফাঁকটা বন্ধ করে দিলে।

বোতল আর ডিকেণ্টার সাজানো মোগলাই কারুকার্য খচিত ট্রে নামিয়ে দিলে ওয়েটার ললিতের সামনে। হতভম্ব ললিত তার মুখের দিকে চাইতেই সে বললে, আচ্ছা চিজ বাবুজী, দেখিয়ে না।

পেছনে পেছনে আর একজন ওয়েটার খাবারের ডিস্, সসেজ, সরু ভিনিগারের শিশি ইত্যাদি নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। কোন কথা বলার ফুরসৎ হবার আগেই তারা দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হলো।

অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ছোট হুইস্কির বোতলটার দিকে চেয়ে ভাবলে ললিত, মন্দ কি? দেখি না। শুনেছি কিছুক্ষণের জন্যে আনন্দ পাওয়া যায়। হাতটা তার এগিয়ে গেল বোতলের গলায়।

শঙ্কাজড়িত হাতে খানিকটা ঢেলে চুমুক দিলে। সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে গলা থেকে পেট পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। দারুণ অস্বস্তিতে কতকগুলো শশাকুচি তুলে চিবোতে লাগলো। স্কচ অমৃতের ক্রিয়া শুরু হতেই মনটা ফরসা হয়ে গেল। পকেটের নোটগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবলে ললিত, যাক্, কিছুদিনের জন্যে কপোতবৃত্তি ঘুচলো! এ কদিন ছবি আঁকার তাগিদ থাকবে না ভেবে তার মন খুশিতে ভরে উঠলো। আঃ বেশ লাগছে, খাওয়া যাক্।

ডিকেণ্টারের তলানিটা শেষ করে ললিত খাবারগুলো শেষ করলে। মাথার মধ্যে একটা ঘোলাটে অনুভূতি; চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজলো সে।

ওয়েটার এসে ডাকলে, বাবুজী।

জড়ানো গলায় উত্তর দিলে ললিত, বিল্ লেয়াও।

বিলের টাকা মিটিয়ে উঠে দাঁড়াতেই পা দুটো কেমন যেন বেসামাল হয়ে এলো। ওয়েটার একটু ফিক্ করে হেসে বললে, চুপিচুপি, বাবুজী বিবি ?

পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একবার কেঁপে উঠলো, সামনে গিয়ে ধমকের স্বরে বললে, নেহি। নেহি মাংতা। টাঙ্গা বুলাও।

একটা সেলাম ঠুকে ওয়েটার বললে, টাঙ্গা খাড়া হ্যায় জনাব।

স্খলিতপদে টাঙ্গায় উঠে আদেশের স্বরে বললে ললিত, তাজ।

টাঙ্গা চললো ঘোড়ার পায়ের ছন্দে দুলে দুলে পিচের রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ যে এত সুন্দর লাগে তা কোনদিন ললিত লক্ষ্য করে নি, তার তালে তালে মনটা ছন্দময় হয়ে উঠেছে।

সহর ছেড়ে তাজের রাস্তায় টাঙ্গা যখন চললো, তখন সারা আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরা। স্বপ্নালু নয়নে চাইল ললিত ; দুরে কানন-কুন্তলা ধরিত্রীর কোলে শ্বেতাম্বরা তাজের দিকে। তার মনে হলো সে যেন নবজন্ম পেয়েছে, অতীতের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে শুভ্র হয়ে উঠেছে।

তাজের কাছাকাছি এসে সে বললে, ঘুমাও টাঙ্গা। টাঙ্গা থেকে নামতে তার ইচ্ছে করছে না। টাঙ্গা আবার এগিয়ে চললো।

অনেকক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে ঘোরাঘুরির পর আস্তে আস্তে ললিতের চোখটা পরিষ্কার হয়ে এলো, সে ভাবতে চেষ্টা করলে কি কারণে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্রমে কেমন যেন একটা সংকোচ তাকে পেয়ে বসলো, সে মাতাল হয়েছিল একথা ভাবতেও তার লজ্জা লাগছে। তাড়াতাড়ি টাঙ্গা ঘোরাতে বললে বাজারের দিকে।

হোটেলের দরজায় নেমে জিজ্ঞেস করলে টাঙ্গাওয়ালাকে, কত দেবো।

সে চাইল দশটাকা।

একটা নোট দিয়ে টাঙ্গাওয়ালার মুখের দিকে না চেয়েই ললিত

যেন পালিয়ে গেল দরজার মধ্যে। টাঙ্গাওয়ালা তার দানার থলেটা ঘোড়ার মুখের সামনে ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল হাসিমুখে।

নিজের ঘরের মধ্যে এসে ললিতের কানে গেল বারান্দায় ম্যানেজারের সঙ্গে একজন অপরিচিত লোক কথা বলছে। তার নিজের নাম তাদের মুখে শুনে কান খাড়া করে তাদের অবোধ্য উর্দু বোঝার চেষ্টা করলে। খানিকটা বুঝেই তার শরীর হিম হয়ে এলো। ম্যানেজার বোঝাতে চেষ্টা করছে, সে চিত্রকর, আর অপরিচিত কণ্ঠস্বর প্রতিবাদ জানিয়ে বলছে, সে চিত্রকর নয় ফেরারী; বাঙ্গালী স্বদেশী আসামী, চিত্রকর সেজে নাম ভাঁড়িয়ে এখানে আছে; এর ভুল হতে পারে না কারণ তার অনেক অভিজ্ঞতা আছে এর আগে, কত বড় বড় স্বদেশীকে সে গ্রেপ্তার করেছে।

ক্ষিপ্রগতিতে ললিত তার স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘোড়াকে দানা খাওয়াবার জন্যে টাঙ্গাটা তখনও দাঁড়িয়েছিল। তাতে চেপে সে বললে, চলো স্টেশন।

স্টেশনে একটা চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠে, ললিত চাইল আগ্রার দিকে। যেতে যেতে তাজের দিকে চাইল বিদায়ী দৃষ্টিতে; এখান থেকে নিজেকে যেন টেনে ছিঁড়তে হচ্ছে।

॥ ৩ ॥

১৯৩২ সালের আন্দোলন আইনতঃ শুরু হবার আগেই আইনরক্ষকরা তৎপর হয়ে উঠলেন। বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশে যে কৃষক আন্দোলন শুরু হলো সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক তাগিদে, তার ওপর আগেভাগে রাজনৈতিক মসীলেপন করে আইনবিদরা আইন বাঁচালেন। কংগ্রেসীরা প্রথম দু-নৌকায় পা দিয়ে টলটল করতে রইল; রাজা জমিদারের দল দূরে দাঁড়িয়ে আড়চোখে লক্ষ্য করতে লাগলেন গতিকটা। সরকারী শ্যেনদৃষ্টি এবার বিত্তবানদের ওপর না পড়ে বিত্তের ওপর পড়েছে দেখে দেশভক্ত ধনীসম্প্রদায় ফাঁপরে পড়লেন। আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যে কংগ্রেসের যুদ্ধঘোষণা অপরিহার্য হয়ে পড়লো। অপরপক্ষ প্রস্তুত হয়েই ছিল; নিপুণ হস্তে দড়ি টেনে রুইকাতলা জালে উঠিয়ে নিলেন। পোনা পুঁটি বিপদ দেখে গভীর জলে তলিয়ে গেল। গোপনে গোপনে এক হাত দেখে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠলো দেশভক্তরা। কংগ্রেসে ডিক্টেটর মনোনয়ন করে কাজ চললো; কৌশলে আত্মগোপন করে দেশময় নির্দেশ ছড়িয়ে দেওয়া হলো। আবার শুরু হলো নিঃশস্ত্র বিদ্রোহ।

দুপুরবেলা খাওয়াটা সেরে নিয়ে অমিতাভ যখন বেরোতে যাবে মৃন্ময়ী দেবী পথ আগলে দাঁড়ালেন।

ব্যাপার কি? ভুরু কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলে সে।

তুই কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াস মিনটু? বাড়িতে একদণ্ডও থাকিস না!

কোথায় আবার বেড়াবো? এইখানেই তো থাকি।

আমাকে লুকোসনি, আমি সব জানি। উনি বলছিলেন তুই আবার স্বদেশীতে মাতছিস্।

জানো যদি তবে জিগেস করা কেন ?

ছলছল করে উঠলো মৃন্ময়ী দেবীর চোখ, অমিতাভ সান্ত্বনা দিয়ে বললে, তুমি কিছু ভেবো না, আমার কিছু হবে না।

আমার বড় ভয় করছে মিন্টু, এবারে হয়তো জানতেই পারবো না।

না না ভেবো না—বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল অমিতাভ সিঁড়ি দিয়ে।

কর্তাদের অংশের সামনে অমিয়কান্তিকে ডাকতেই শিবকালীবাবু বেরিয়ে এলেন ; অমিতাভ বললে, একটা কথা ছিল জ্যাঠামশাই।

এখানেই বলবে না ভেতরে যাবে ?

ভেতরেই চলুন।

মিত্তিরবাড়ির বৈঠকখানায় রামকালীবাবুর অনুপস্থিতিতে সে আশ্বস্ত হলো। শিবকালীবাবুর খুব কাছে বসে বললে, আন্দোলন আবার আরম্ভ হয়েছে, আপনি কি করবেন ঠিক করেছেন ?

কথাটা শুনে যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি।

আপনি মেদিনীপুরে ফিরবেন না ?

একটু ইতস্তত করে প্রায় মনে মনে বললেন শিবকালীবাবু, দেখ অমিতাভ এবারে এখনও কিছু ঠিক করতে পারি নি।

কেন কংগ্রেস তো নির্দেশ দিয়েছে !

সে তো জানি কিন্তু......

ঘরে এসে ঢুকলো অমিয়কান্তি। আলোচনা বন্ধ করে অমিতাভ বললে, আমি এখন আসি জ্যাঠামশায়, পরে দেখা করবো।

এসো।

অমিয়কান্তিকে নিয়ে অমিতাভ সুরেন সিংহর দরজায় ঢুকে পড়লো হাঁকতে হাঁকতে, সুরেনদা আছো নাকি ?

সুরেন একটা পুস্তিকার মত কি যেন পড়ছিল, সেটা মুড়ে রেখে বললে, এসো এসো মিনটু।

তুমি যে আজ কাজে যাওনি ?

ছুটি নিয়েছি শরীরটা ভাল নেই।

মালতীদির খবর কি ?

ভালই আছে, দোকান করছে বস্তিতে।

সেখানে কোন বিপদ হবে না তো ?

না আমাদের লোক আছে, লক্ষ্য রাখে।

যাক্ একটা কথা তোমার কাছে জানতে এলুম। নড়ে বসে গম্ভীরভাবে বললে অমিতাভ।

বলো।

মালতীদিকে তুমি বিয়ে করতে পারো কি না।

কথাটা শুনে ক্ষণিকের জন্যে স্থরেনের মুখের একটু পরিবর্তন হলো। সে মাথা নেড়ে বললে, ও প্রশ্ন অবান্তর। তা ছাড়া তোমার মালতীদি আমাকে দেখলেই জ্বলে ওঠেন। এ হেন স্ত্রীভাগ্য মোটেই সুবিধে নয়।

চেষ্টা করতে আপত্তি কি ? হেসে বললে অমিতাভ।

কঠিনভাবে উত্তর দিলে স্থরেন, অসম্ভব।

আর একটা কথা, আমাদের আন্দোলনে তোমরা যোগ দেবে স্থরেনদা ?

বড় শক্ত প্রশ্ন!

ভারতের স্বাধীনতা কি শ্রমিকদের কাম্য নয় ?

নিশ্চয়!

তবে এখনও দ্বিধা কেন ?

দ্বিধা কই অমিতাভ ? আমরা আমাদেব সংগঠনের মধ্যে দিয়ে সেই দিকেই তো এগোচ্ছি!

কিন্তু এখনই যে তোমাদের সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে!

আমাদের কেউ কেউ যোগ দেবে তোমাদের সঙ্গে।

তুমি? তোমার শ্রমিক সঙ্ঘ?

আমার পথ শ্রমিক সঙ্ঘের সঙ্গে বাঁধা ভাই। তোমরা খবর রাখো না, পুলিশের নজর আমাদের ওপরও কিছু কম নেই; আমাদের শ্রেণী আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবার জন্যে, সরকার গত কবছরে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্ঘকে বে-আইনী ঘোষণা করেছে, নেতাদের রাজবন্দী করেছে,—ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়িয়ে জেল দিয়েছে। আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন বাঁচিয়ে রাখাই এখন মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু তুমি জেনে রাখো, আমরা প্রস্তুত হলেই তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

কথাগুলো বলে ক্লান্তভাবে সুরেন চাইল তাদের দিকে। অমিতাভ বললে দমে গিয়ে, তোমাদের সম্বন্ধে আমি ভাল জানি না, তবে আমার অনুরোধ, তোমরা এগিয়ে এসো এই আন্দোলনে, তোমাদেরও মঙ্গল হবে।

প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করছি আমরা শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে।

অমিয়কান্তি বিরক্তভাবে বললে, চল্ মিনটু এখানে কতক্ষণ কাটাবি, আমাদের যে যেতে হবে অনেক দূর।

এই যে যাই, উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আসি সুরেনদা।

এসো ভাই।

ওরা বেরিয়ে গেল; বিমনায়মান দৃষ্টিতে সুরেন চেয়ে রইল পথের দিকে।

কল্লান্ত

॥ ৪ ॥
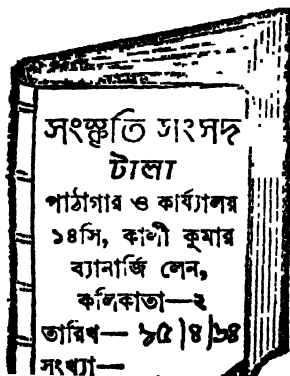
প্রস্তুত হয়ে বেরোবার সময় অমিতাভ মাকে টিপ করে একটা প্রণাম করে নিলে। বিস্মিত মৃন্ময়ী দেবী ছেলের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে প্রণাম করলি যে ?

তুমি আমার ওপর যে রকম চটে রয়েছো তাই একটু খোসামুদী করলুম।

যা পাজি কোথাকার—একটা মৃদু আঘাত করে মৃন্ময়ী দেবী চলে গেলেন সেখান থেকে।

মিস্তিরদের অংশটা পেরোবার সময় একটা কাগজের মোড়ক এসে পড়লো তার গায়ে। ওপর দিকে চাইতেই দেখলে রুনু দাঁড়িয়ে ; হেসে মোড়কটা পকেটে পুরে নিয়ে চললো।

শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে এসে বাসে চেপে বসলো অমিতাভ। তারপর পকেট থেকে কাগজের মোড়কটা বার করে খুলে পড়তে শুরু করে দিলে : অমিতাভ, আমি জানি তুমি আমায় এড়িয়ে চলছো, কিন্তু বলতে পারো তোমার একারই কি অধিকার আছে দেশসেবায় ? আমার নেই ? আমাকে কোন সামান্য কাজেও কি লাগাতে পারো না ? আমি কোন বাধা মানবো না ; আমার কর্তব্য আমি পালন করতে প্রস্তুত। সংকোচ করো না অমিতাভ, আজ রাত্রি ন'টার পর ছাতের পশ্চিম কোণে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো ; তোমার আসা চাই। আমায় বলে দিতে হবে আমি কি করতে পারি। ইতি রুনু।

চিঠিটা দুতিনবার পড়ে আশায় উৎসাহে সাহসে অমিতাভর মন ভরে উঠলো। কখন যে সময় কেটে গেল জানে না, হঠাৎ নামবার জায়গাটা ছাড়িয়ে এসেছে দেখে ঘন্টি মেরে বাস থেকে নেমে পড়লো।

পার্কের ঠেসাঠেসি লোকের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল অমিতাভ অনেক কষ্টে ডায়াসের দিকে। ঘন ঘন বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে গমগম করে উঠছে চারপাশের চারতলা বাড়িগুলো। ডায়াসের কাছে এসে পরিচিত নেতার দিকে ইঙ্গিত করে এক কোণে বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলে। ধ্বনির মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন সে দিনের সভাপতি; আস্তে আস্তে শুরু করলেন বক্তৃতা; গোলমাল স্তব্ধ হয়ে এলো; একাগ্রচিত্তে সবাই শুনতে লাগলো তাঁর আবেদন; সরকার কি রকম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেই কথা।

. চারিদিকে হুইসিল বেজে উঠলো। মিটিং ছেড়ে শত শত নিরীহ শহরবাসী ছুটতে শুরু করেছে আর তাদের ঘেরাও করে লাঠিচার্জ হচ্ছে। সামনের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় নির্লিপ্ত পথিকের ওপর এসে পড়ছে সার্জেণ্ট পুলিশের উন্মত্ত বেতগুলো। ভীরু জনতাকে উৎসাহিত করার জন্যে স্বেচ্ছাসেবকরা চেঁচিয়ে উঠলো, বন্দেমাতরম্, স্বাধীন ভারত কি জয়। কিছু কিছু পলায়নপর জনতা ঘুরে দাঁডালো লাঠির সামনে নিজেদের এগিয়ে দিয়ে।

ঘোড়ায় চড়া পুলিশদল মিটিংএর পেছন দিকে জমা হলো জনতার মধ্যে ঘোড়া ছোটাবার জন্যে, চকিতে নারীস্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী এগিয়ে গিয়ে এক একজন এক একটা ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে গেল। ভ্যাবাচ্যাকা সোয়ার দল নতুন আদেশের অপেক্ষায় ফিরে চাইল। চিৎকার উঠলো, বন্দেমাতরম্।

চারজন পুলিশে ধাক্কা দিতেদিতে সভাপতিকে নিয়ে গেল ডায়াস থেকে। নিচের থেকে লাফিয়ে অমিতাভ বসলো সভাপতির আসনে; চিৎকার করে বলতে শুরু করলে: ভাই সব! আজ এখানে আমরা এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফিরবো যে যতদিন না পুর্ণ স্বাধীনতা লাভ করছি ততদিন আমরা আপোসহীন সংগ্রাম করে যাবো, জগতের কোন শক্তি নেই যে আমা—দে—র—

তার মুখের ওপর হাত চেপে ধরে পুলিশের চলল ধস্তাধস্তি, গোটা-কতক পুলিশ তাকে শূন্যে তুলে নিয়ে চলে গেল রাস্তায় দাঁড়করানো প্রিজন ভ্যানটার কাছে; একটা আছাড় দিয়ে ফেলে দিলে ভেতরে; ভর্তি ভ্যানটা ছুটে চললো। আওয়াজ উঠলো, 'বন্দেমাতরম্।

লালবাজারের লালবাড়িটার সামনে সবাইকে সার বেঁধে নামিয়ে নিলে; তারা চললো দুপাশে রাইফেলধারী পাহারাদারদের মাঝ দিয়ে। অমিতাভর চোখে পড়লো দেওয়ালের গোল ঘড়িটায় ন'টা বেজে দু মিনিট; ছাদের পশ্চিম কোণে আলসে ভর দিয়ে রুনু হয়তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়, জানিয়ে এলেই হতো।

॥ ৫ ॥

যদিও সামান্য দিনের জন্যে তবু নানা বাধা নানা আত্মবিরোধ ভুলে কিছুদিনের জন্যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো বাংলার কৃষক, বাংলার ছাত্র-বাংলার যুবক। ১৯৩২ সালের এই ক্ষীণ সংগ্রামকেও তুচ্ছ করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ; তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে, আইন নিয়ে, অভিজ্ঞতা নিয়ে, সহস্র বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে। নাগরিক পথিক নিরীহ দেশবাসী তার নিজের অজ্ঞাতে হয়ে উঠলো আইনভঙ্গকারী; নির্বিচারে লাঠির আঘাত এসে পড়লো সযত্নে রক্ষিত মূল্যবান মস্তকে।

কলেজ স্কোয়ারের সামনে এসে অমিয়কান্তি যখন নামলো বাস থেকে তার মনে হলো সে যেন একটা যুদ্ধ ফ্রণ্টের মধ্যে এসে পড়েছে। হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সার বেঁধে গুর্খা, পাঠান সৈন্যবাহিনী রাইফেলে সঙ্গীন চাপিয়ে বুঝি আদেশের অপেক্ষা করছে। চারিদিকে সার্জেণ্ট পুলিশ তাদের খেঁটেগুলো হাওয়ায় দুলিয়ে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে।

সে সোজা চলে গেল ইউনিভার্সিটির পাশের গলি দিয়ে। চারিদিকে কলেজের মধ্যে চিৎকার শুনতে পেলে, বন্দেমাতরম্। কাতারে কাতারে ছাত্র এগিয়ে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে, হাতে বইখাতা মুখে দৃঢ় সঙ্কল্প।

গলির মোড়ে অমিয়কান্তির দেখা হয়ে গেল শুভেন্দু নবেন্দু সুখেন্দু আর বিমল বোসের সঙ্গে; আগ্রহের সুরে বললে সে, আপনারা যাচ্ছেন তো সভায়?

না ভাই ও ঝামেলার মধ্যে নেই। হাত নেড়ে বললে বিমল বোস।

ছাত্রদের এ হুজুগ আমরা সমর্থন করি না। বললে সুখেন্দু।

মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠলো অমিয়কান্তির, জলন্ত চোখে তার দিকে চেয়ে বললে, মেয়েদের বুকের ওপর দিয়ে কলেজে গেলেই পারতেন ?

ওটা সভ্যতায় বাধে, তাই ফিরতে হলো। বললে বিমল বোস।

ধন্যবাদ। হন্‌হন্‌ করে চলে গেল অমিয়কান্তি সেখান থেকে।

দলে দলে ছাত্র এসে জমা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। উত্তেজিত ছাত্রসমাজ যেন আজ পথের হদিস পেয়েছে; বহুদিনের স্বপ্নোজ্জ্বল স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় রূপ, তারা যেন দেখতে পাচ্ছে শত লাঞ্ছনার মধ্যে।

শুরু হলো সভার কাজ। সহস্র ছাত্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো প্রতিজ্ঞার বাণী। বন্দেমাতরম্, স্বাধীন ভারত কি জয় ধ্বনিতে গমগম করে উঠলো বিদ্যামন্দির।

চারিদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো সার্জেণ্ট পুলিশের দল সেপাই-সৈন্য সুসজ্জিতভাবে। নিজেদের প্রিয় শিক্ষায়তনের দিকে চেয়ে বইশুদ্ধ হাত তুলে আওয়াজ তুললো ছাত্রদল, বন্দেমাতরম্।

লাঠিচার্জ শুরু হলো অহিংস সৈনিকদের ওপর। যারা দুর্বল তারা আশ্রয়ের জন্যে ছুটে চললো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে; অহিংস শিক্ষায় যারা আত্মবিশ্বাসী তারা মাথা পেতে দাঁড়ালো লাঠির সামনে।

কালো কালো দৈত্যের মত প্রিজনভ্যান্‌গুলো আহত ছাত্রে বিদ্রোহী ছাত্রে বোঝাই হয়ে ছুটে চললো অনির্দিষ্টভাবে, কোথায় কে জানে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় সিঁড়িগুলো ক্ষিপ্ত সার্জেণ্টদের সবুট পদভারে আর্তনাদ করে উঠলো। পবিত্র শিক্ষায়তনের ওপর এই অত্যাচারে বেঙ্গল টাইগারের মর্মর মূর্তির চোখে বুঝি অশ্রু ফুটে উঠলো।

ছাত্রদের দলবদ্ধ করার জন্যে অমিয়কান্তি ছুটে চললো বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ভেতর দিকে। সেখানেও লাঠির আঘাতে আহত ছাত্রদের গোঙানি, তাকে চঞ্চল করে ঠেলে দিলে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাবার জন্যে অফিস ঘরের দিকে, কিন্তু সেখানের নিশ্চেষ্ট নির্বাক নিষ্ক্রিয় আবহাওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে সে আবার ফিরে গেল বাইরের দিকে।

ফেরার সময় প্রচণ্ড একটা আঘাত পেল মাথার ওপর ; সংজ্ঞাহীন অমিয়কান্তি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে।...মাথায় কি খুব লেগেছে ভাই ? অমিয়কান্তি চোখ খুলে চাইতেই নবেন্দু জিজ্ঞেস করলে। পরিচিত কণ্ঠস্বরে সে ফিরে চারিদিকে চাইলে। দেখলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সুখেন্দু নবেন্দু বিমল বোস রেবা বিনতা আরো অনেকে। অমিয়কান্তি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল বিমল বোসের দিকে।

যেতে পারি নি ভাই, এইখানেই ছিলুম। হেসে বললে সে।

বিনতা বললে, দাদা অমিয়বাবুকে এখান থেকে নিয়ে চলো তাড়াতাড়ি।

সবাই মিলে অমিয়কান্তিকে ধরাধরি করে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

॥ ৬ ॥
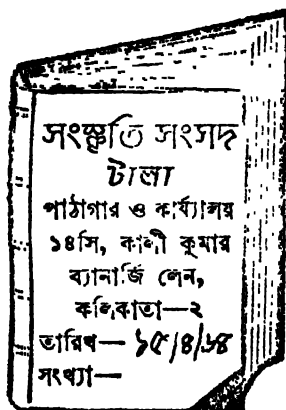
প্রকাশ্য সংঘর্ষ এড়িয়ে শেষের দিকে কংগ্রেস নতুন নতুন কৌশলে ব্যর্থ করতে লাগলো সরকারের আক্রমণ। একদিকে চললো বুদ্ধির লড়াই, অন্যদিকে চললো আইন অমান্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাতচল্লিশ-তম অধিবেশন আহ্বান করলে কংগ্রেস; প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার কঠোরভাবে এই অধিবেশন পণ্ড করার জন্যে কোমর বেঁধে লাগলো। সভাপতি মোহন মালবীয় অধিবেশনে আসার পথে গ্রেপ্তার হলেন আসানসোলে; কলকাতার কংগ্রেসীরা দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে গেলেন অধিবেশন অনুষ্ঠানের কাজে গোপনে। রাস্তায় রাস্তায় লাঠিচালনা পুলিশপাহারা তুচ্ছ করে বুকে বসে দাড়ি ছেঁড়ার তোড়জোড় চললো। পুলিশকে কদলী দেখিয়ে শত শত কংগ্রেস প্রতিনিধি এসে জমা হলো নানা প্রদেশ থেকে কলকাতায়।

অমিয়কান্তি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় গোপনে রুনুকে বলে গেল, যদি না ফিরি রাত্রি আটটার মধ্যে, বুঝবে গ্রেপ্তার হয়েছি। তখন বাড়িতে বলতে পারো।

নিশিকান্ত চৌধুরীর অংশটার কাছে অমিয়কান্তি দেখতে পেলে নবেন্দু বিনতা তার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে। চোখের একটা ইসারা করে সে এগিয়ে গেল গলির মোড়ে।

বড় রাস্তায় এসে অমিয়কান্তি হেসে বললে, তৈরী হয়ে এসেছো? আজ ফেরার আশা কম।

তা জানি, তোমার চিন্তা নেই। বললে নবেন্দু।

বিনতা হেসে বললে, আমাদের উনি বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন না।

না না তা নয়।

যাক্! চলুন তাড়াতাড়ি, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়।

তিনজনে এগোল ট্রামরাস্তার দিকে। নবেন্দু বললে, কিসে যাবেন ? ট্রামে না বাসে।

ট্রামে চাপা উচিত নয়, বাসেই চলুন, বললে বিনতা।

একটা যাত্রীভর্তি কালীঘাটের বাসে তিনজনে উঠে পড়লো।

বাসের মধ্যে দু একজন লোকের সঙ্গে মুখচাওয়াচায়ি হয়ে গেল অমিয়কান্তির। নবেন্দু জিজ্ঞেস করলে, ওরা কে ?

তার কানে কানে অমিয়কান্তি বললে, ওরাও যাচ্ছে, আমাদেরই লোক।

ধর্মতলার মোড়ে তিনজনে নেমে পড়লো ; অমিয়কান্তি বললে, চলো আগে একটু চা খেয়ে নি, এখনও সময় হয়নি।

সামনেই একটা বোম্বাই চায়ের দোকানে তিনজনে গিয়ে বসলো, মুখগুলো ট্রামডিপোর দিকে ঘুরিয়ে।

সবাইয়ের বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে ; ওইখানে, কলকাতার বুকের ওপর, ট্রামযাত্রীদের আশ্রয়স্থলে অল্পক্ষণ পরেই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যাবে, অথচ, এখনও ওই পাশে বসা পানের দোকারদারটাও সেকথা জানে না। ওই যে পুলিশটা দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আর আড়চোখে গোঁফে তা দিয়ে নিজেকে জাহির করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ওই ফিকফিকে হাসিভরা মুখটা এখুনি বন্য হিংসালু হয়ে উঠবে।

কিছু খেয়ে নিন, খাবারের ডিসটা এগিয়ে দিয়ে বললে বিনতা।

অমিয়কান্তি একটা কেক্ তুলে খেতে খেতে চাইল তার দিকে।

চেয়ে আছেন যে ? প্রশ্ন করলে বিনতা।

ভাবছি আপনাকে এইখানেই বসিয়ে রেখে আমরা যাবো।

তা বইকি। আমার তো হাত পা নেই। রেগে বললে বিনতা।

নবেন্দু তুমি কি বলো ?

আমার কথা থাকলে তো। যেন ঠেস দিয়ে বললে নবেন্দু বিনতার দিকে চেয়ে।

তোমরা যদি আমার সঙ্গে লাগো তা হলে তোমাদের চা শেষ হওয়ার আগেই আমি ওখানে গিয়ে দাঁড়াবো।

চেনা চেনা মুখের আবির্ভাব দেখে অমিয়কান্তি উঠে দাঁড়ালো ; উদ্বেগে আচ্ছন্ন মুখগুলো প্রতীক্ষায় চঞ্চল। সে বললে, চলো এইবার সময় হয়েছে।

গাড়ী মোটর বাঁচিয়ে তিনজনে চৌরঙ্গী পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো ট্রামযাত্রীদের আশ্রয়স্থলে। সেটা ভোজবাজীর মত মুহূর্তের মধ্যে ভর্তি হয়ে গেল স্বরাজপথের যাত্রীদলে। সরকারের সযত্নে রক্ষিত ফেউদের চোখে ধূলি দিয়ে শুরু হলো ঐতিহাসিক অধিবেশন।

ভারতীয় সূর্যকিরণের স্নেহস্পর্শে তাম্রবর্ণা সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার শান্ত মুখখানি জনতার মস্তক ছাপিয়ে ওপরে উঠে এলো। লিখিত সাতদফা প্রস্তাব পাশ করা হলো অধিবেশনে। সচকিত পুলিশদের আইনরক্ষার কাজও শুরু হলো পুরো দমে।

গ্রেপ্তার শুরু হলো অটল অচল প্রতিনিধিদের। সামান্য সময়ের মধ্যেই অধিবেশনেব কাজ শেষ করে সভানেত্রী সরকারের অপ্রিয় অতিথি হলেন।

বন্দেমাতরম্, স্বাধীন ভারত কি জয়, গান্ধীজি কি জয় ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো ইংরাজদের পরিপাটি পল্লী প্রান্তর।

অমিয়কান্তি নবেন্দু বিনতা প্রিজনভ্যানের মধ্যে বসে জয়োল্লাস করে উঠলো, বন্দেমাতরম্। চৌরঙ্গীর সৌখীন পথিকদের কানে ভেসে এলো চলন্ত প্রিজনভ্যানের ভেতর থেকে সমবেত গানের কলি :

এই শিকল পরা ছল আমাদের
শিকল পরা ছল—